'পরিচয়'-এর নিয়মাবলী

- 'পরিচয়'-এর বর্ষারম্ভ শ্রাবণ মাসে; কিন্তু যে-কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। পত্রিকার প্রতি সংখ্যার দাম এক টাকা; বার্ষিক গ্রাহকমূল্য দশ টাকা, যাণ্মাষিক সাড়ে পাঁচ টাকা। বৎসরে অন্যূন তিনটি বিশেষ সংখ্যা বর্ধিতমূল্যে প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না॥
- 'পরিচয়' পাঁচ কপির কম এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা পঁচিশ। পত্রিকা ভি. পি. যোগে প্রেরিত হয়; ডাকব্যয় আমরাই বহন করি॥
- রচনাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়; অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হলে সঙ্গে ডাকটিকিট থাকা চাই॥
- রচনা, টাকাকড়ি ও ব্যবসায়িক চিঠিপত্র যথাক্রমে সম্পাদক, পরিচয় বা কার্যাধ্যক্ষ, পরিচয়—এই নামে ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭—ঠিকানায় প্রেরিতব্য॥

সূচীপত্র

বর্ষ ৩৭ / সংখ্যা ১

অগস্ট '৬৭ / শ্রাবণ '৭৪

প্রচ্ছদলিপি ও চিত্র : রঘুনাথ গোস্বামী

ভিতরের অলংকরণ · শ্যাম গুহ ও পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রতি সংখ্যা ১৲ ॥ বার্ষিক ১০৲ ॥ ষাণ্মাসিক ৫৷৷০

সম্পাদক

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়
বর্ষ ৩৭। সংখ্যা ১

নিজেই অবাক হয়

বিষ্ণু দে

নিজেই অবাক হয়, স্বভাবের এ কী স্বাধীনতা !
হৃদয়ে রৌদ্রকে ধরে, বীজকম্প্র আকাশে বাদল !

যতই আঘাত পায়, কিছুতেই মানে না হীনতা,
মনের পাতালে তার আদিতেই মাটির দীনতা
রূপান্তর পেয়েছিল অঙ্গারিত হীরকে উজ্জ্বল ।

আশা হতাশার উৎসে, যদি বোমা জ্বালে রসাতল
তখনই সে গান শোনে মুরজ মুরলী তূর্যে,
ফেরারী হতেই হলে জঙ্গলেও বাজায় মাদল !

গোপনে অবাক হয় নিজেই সে, তৃণের ক্ষীণতা
কোথা পায় শিরস্ত্রাণ ?   মাটিতে, হাওয়ায়, সূর্যে ?
সেখানে কি গড়েছে সে বাষ্পে বাষ্পে তার স্বাধীনতা ?

১০/১/৬৭

৩৭টি বর্ষা পেরিয়ে

এখন আবহাওয়া বলতে আকাশে ঘনঘটা, গুরু গুরু মেঘের ডাক, বিদ্যুতের চমক, থেকে থেকে বৃষ্টি।

যত গর্জেছে তত বর্ষায় নি বটে, তবু এই একটুতেই রোদেপোড়া শুকনো ডালে হলুদ ঘাসে সবুজ রং লেগেছে। এখন হাল ছাড়বার কথাই ওঠে না, ববং দশ আঙুলে শক্ত করে হাল ধরবার এই তো সময়। লাঙলের ফলা বিঁধিয়ে জমির পাট ভেঙে বীজ বুনে রোয়া লাগিয়ে আগাছা নিড়িয়ে ধৈর্যে আর সাহসে বুক বাঁধা। জনে জনে হুঁশিয়ার থাকা—বাঁধ ভেঙে বান না আসে, ভেতর থেকে পোকামাকড়ে না খায়।

বর্ষার এই হল দস্তুর।

একদা এদেশে বছর শুরু হত বর্ষার মরশুমে। সে কথা আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয় জাতিস্মর শব্দ 'বর্ষ'। শব্দের জগতে বর্ষা আর বর্ষ সহোদর।

শ্রাবণে পরিচয়-এর বর্ষারম্ভে তাই এই ঐতিহ্যের সায় আছে। নতুন বছরে পা দিয়ে পরিচয় ৩৭টি বর্ষা পার হতে চলেছে।

লেখক, শিল্পী, পাঠক, গ্রাহক, বিক্রেতা, যাঁরা ছাপাই-বাঁধাই করেন, ব্লক তৈবি করেন, কাগজ যোগান, বিজ্ঞাপন দেন—যাঁরা অন্য নানাভাবে পরিচয়-কে সাহায্য কবেন—তাঁদের সবাইকে আমরা পবিচয়-এর নববর্ষের অভিবাদন জানাই।

দেশবিদেশের প্রাচীন আর আধুনিক ভাবগঙ্গার ধারাকে বাংলা ভাষায় বইয়ে দেবার ব্রত নিয়ে পরিচয়-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। পরিচয় আজও সেই ব্রত পালন করে চলেছে।

আদর্শে অবিচল থেকেও কোনো পত্রিকার পক্ষে ৩৭ বছর ধরে বেঁচে থাকা কম গৌরবের নয়। কিন্তু পরিচয়-এর গৌরব শুধু তার দীর্ঘ জীবনে নয়, সময়ের সঙ্গে সমানে তাল দিয়ে চলার অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে।

কথাটা উঠছে পবিচয়-এব আপনাতে আপনি খুশি থাকার মোহ থেকে নয়, আত্মদর্শনের আলোয় নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার তাগিদে।

পরিচয়-এর সেকাল আর একাল—হাতবদলের আগে আর পরে—মোটামুটি এই দুই পর্ব।

প্রথম যুগ নিয়ে তবু কিছুটা লেখা হয়েছে। পরিচয়-এব পৃষ্ঠায় হিরণকুমার সান্যালের ধারাবাহিকভাবে লেখা 'পরিচয়-এব কুড়ি বছর' আর তারও আগে স্টেটসম্যানে সমর সেনের 'দি এণ্ড অব অ্যান ইপক'-এ এই যুগের খানিকটা ছবি পাওয়া যাবে।

তার পবের পর্ব দীর্ঘতর। কম গৌরবেবও নয়। এই যুগকে যাঁরা সাক্ষাৎ-ভাবে জানেন, নতুন পাঠকদের জানাবার ভার তাঁদেরই নিতে হবে।

সারা দেশ তছনছ হয়েছে যুদ্ধে আর দুর্ভিক্ষে, দাঙ্গায় আর দেশভাগে। সরকারী দমনপীড়নে পরিচয়-এর সম্পাদক, লেখক, শিল্পী, কর্মীরা বিনাবিচারে কারারুদ্ধ হয়েছেন, মাথার ওপর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ঝুলেছে—তবু পরিচয়-কে বন্ধ করা যায় নি।

দ্বিতীয় পর্বের পবিচয়-এব কাজ ছিল আরও কঠিন। মার্ক্সবাদ তখন আর পরিচয়-এর বহু মতের মধ্যে একটি মত নয়, মার্ক্সবাদই হল চালিকা শক্তি। সত্যি বলতে কি, প্রথম পর্বের পরিচয়-এর হালছাড়া অবস্থায় সেকালের মার্ক্সবাদীবা হাতে না নিলে তার অকালমৃত্যু হয়ত অবধারিত ছিল।

দ্বিতীয় যুগে পাঠকসমাজেরও বদল হয়েছিল। শহর গ্রামেব শ্রমজীবী মানুষের একাংশ এবং যাঁরা সমাজতন্ত্রের যোদ্ধা—তাঁদের সঙ্গে পবিচয়-এর সম্পর্ক নিকটতর হল। দেশের মাটিতে শুধু পা রেখে নয়, হাত লাগিযে তত্ত্বকে ফলিয়ে তুলবার প্রয়োজন দেখা দিল।

সে কাজ করবার মত তৈরি পাকা হাত খুব বেশি ছিল না। তার উপযুক্ত নতুন লেখক পরিচয়-কে তৈরি করে নিতে হয়েছিল। প্রথম পর্বে পরিচয় ছিল কাগজেব আন্দোলন, দ্বিতীয় পর্বে পরিচয় হল আন্দোলনের কাগজ। এ পর্বেও পরিচযকে নিজের পথ নিজেকেই তৈরি করতে হয়েছে।
যাঁদের অবিচল নিষ্ঠায়, কঠোর আত্মত্যাগে পবিচয় দীর্ঘ জীবন এবং অক্ষয় যৌবন লাভ করেছে—নতুন বছরে উপস্থিত অনুপস্থিত তাঁদের সবাইকে আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ কবছি।

আষাঢ় সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার এক ঘোষণায় নতুন বছরে সম্পাদনার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করেছেন। সম্পাদকের ভারমুক্ত হয়ে তিনি নিশ্চিন্তে লিখতে পারবেন, এই কথা ভেবে নিজের অসুবিধা সত্বেও তাঁর দেওয়া ভার কাঁধে নিতে আমি রাজি হয়েছি। সেইসঙ্গে আমার এ বিশ্বাসও আছে যে, আমার সম্পাদনার ভুলত্রুটি পাঠকেরা নিজগুণে ক্ষমা করবেন।
পরিচয়-এর আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখে পরিচয়কে যদি আমি ব্যাপকতর পাঠকসমাজের মনের মতন করে তুলতে পারি, তাহলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

যুদ্ধ হোক্, যুদ্ধ হোক্

মণীশ ঘটক

এ কোন্ ভ্রূণঘ্ন স্বার্থান্বেষীর
শূন্য আসন পরিগ্রহণ করলে
হে সংগ্রামী, হে নির্ভীক,
তুমি কি জানতে
ঐ পরিত্যক্ত আসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
রক্তপায়ী অগণন বিষকীটের আবাস ?

গতিপথ মঙ্গলাবর্ত কি না
না জেনে কোন্ ঘূর্ণ্যমান রথচক্র গ্রহণ করলে
হে সারথি,
তুমি কি জানতে
ভঙ্গুর কীটদষ্ট ঐ দারুসংগঠন ?

অভী ও সারল্যসম্বল, হে সংগ্রামী
তুমি জানতে না
রণনীতি ও কূটনীতি পৃথকধর্মী,
রণজয়ী ক্ষুরধার তরবারি
শান্তিসংস্থাপনে কখনো দুর্ভার, লৌহখণ্ড মাত্র।
শান্তিপর্বে সংগ্রাম সম্মুখ শত্রুর সাথে নয়
যে যুদ্ধ
প্রবঞ্চক চাটুকারের সাথে
আপাতআজ্ঞাবহ খল অনুচরের সাথে
পর্যুদস্ত বিধ্বস্ত প্রচ্ছন্ন দুর্জনতন্ত্রের সাথে
উচ্ছৃঙ্খল সমাজবিরোধীর সাথে।

গ্রহণ করো তবে তোমার শেষ শায়ক
অখণ্ড অকপট গণানুগত্যের প্রতীক পাশুপত,
ধনুতে পুনর্বার জ্যা রোপণ করো, হে সংগ্রামী,
যুদ্ধ হোক্, যুদ্ধ হোক্॥

নিজের সঙ্গে আলাপ

দেবেশ রায়

হালের বাংলা গল্প-উপন্যাসের সবচেয়ে বড সমস্যা এই যে, বাজারের লেখকেরা পাঠকের মনস্তুষ্টির জন্য হিন্দী সিনেমাব নায়কের মতো রোপওয়েতে উঠছেন, জাহাজের চিমনির ওপর লডছেন, বেলুনে চডে ঘুষোঘুষি করছেন। আর ব্যক্তিগত লেখকগণ পাঠককে ভীত করাব জন্য এমন সব প্রসঙ্গ নিয়ে লিখছেন, যে-বিষযে তিনিও সজ্ঞানে অবহিত নন। বাজারের লেখক পাঠককে ডাকছেন—এখানে এস, এখানে বিশ্লেষণের ছুরি নেই, তত্ত্বের হাতুডি নেই, ভাষায় ব্যাকরণের ঢিল নেই—ক্লাশ এইটের মেয়ের প্রেমপত্রের ভাষায, তার দাদা-দিদির গলা শুনতে পাবে। ব্যক্তিগত লেখক পাঠকদের পিঠের দিকে তাকিয়ে রেগে আরো কঠিন তত্ত্ব, আরো কঠিন ভাষার আশ্রয় নিচ্ছেন। ফলে ফারাক বেডেই যাচ্ছে।

বছর কযেক আগে আমাদের কিছু গল্প নিযে খুব গোলমাল সৃষ্টি হযেছিল। এখন সে কোলাহল আর নেই। কিন্তু বাংলাদেশের এমন পত্রিকার পাতা ওন্টানো যাবে না, যেখানে গল্প-উপন্যাসে সবাই একেবারে সাবেকি রীতির পথ ধরে চলেছেন,—দু একজন লেখক থাকবেনই যাঁরা নতুন কাযদাকানুনে গল্প-উপন্যাস লিখছেন। তাহলে তো আনন্দিত হবার কথা। বাজাবে-যথেষ্ট-বিক্রি-আছে এমন পত্রিকায যদি বাজারে-যথেষ্ট-আদর-নেই এমন ভঙ্গিতে, বাজারে-একেবারেই-পরিচিত নয় এমন বিষয় নিযে কেউ গল্প-উপন্যাস লেখেন, তাহলে তো আমাদের বেশ খুশি হবার কথা।

কিন্তু যা ঘটছে তা খুশি হওয়ার মতো ঘটনা নয়। আসলে সেই গল্প-উপন্যাসগুলোর বিষয়ের মধ্যে এমন নিশ্চয়তা কোথাও নেই যে, প্রাচীন প্রথাগত রীতিতে প্রকাশের বদলে ভঙ্গির নতুনত্ব, ভাষার জটিলতা দরকার। তার ফলে, যে-গল্প সাদামাঠা করে লিখলে সত্যি সত্যিই একটা ভালো গল্প হত, তা এমন মিথ্যে জটিলতা তৈরি করছে যাতে পাঠক বিরক্ত হয়ে তার পরিচিত পুরনো লেখকদের দরবারেই যাচ্ছে। এ আবার আর এক ধরনের হিন্দী সিনেমার ব্যাপার—যেখানে ক্যামেরার নতুনতম পদ্ধতিকে লাগানো হচ্ছে যাত্রার গল্প বলার কাজে।

নিশ্চয়ই আমার এ-কথাগুলো শুনে কিছু-কিছু স্মৃতিধর কবৎসর আগের বিতর্কের কথা ভেবে মনে মনে বলছেন—তখন তো আমরা এ-সবই বলেছিলাম, তোমরা তো খুব বুক ঠুকে বেড়ালে, এখন আবার মাথা মুড়িয়ে এসেছ?

তাঁদের আশ্বস্ত করবার জন্য এবার নিজের সমস্যায় আসি। ইলিয়া এরেনবুর্গ ঠিকই বলেন: 'এভ্রি ইপক হ্যাজ ইট্স্ ওন ফর্মস্…' (প্যারিস রিভিউ, ২৬ সংখ্যা)। প্রত্যেক যুগেরই আছে আলাদা আলাদা ধরন।

সাতচল্লিশ সালের পর ভারতবর্ষে, সুতরাং বাংলাদেশে, সুতরাং কলকাতায়, সুতরাং গ্রামে বা মফস্বল শহরে—যে নতুন শক্তিগুলো মাথা চাড়া দিয়েছে, যে পুরনো শক্তিগুলো নতুনভাবে বিন্যস্ত হয়েছে তাদের বাস্তবতা আমাদের গল্প-উপন্যাসে কোথায়? 'গণদেবতা'-'পঞ্চগ্রামে'র ভূমিসমস্যা আজ ভূমি-আইন আর সমবায় প্রথার পথে নতুন চেহারা নিয়েছে। 'হাঁসুলী বাঁকের কথা'র করালী নতুন রেলকারখানায় চলে গিয়েছিল—আজ যেখানে হাইড্রো-ইলেকট্রিকের খুঁটি পোঁতা হচ্ছে। 'পদ্মানদীর মাঝি'র হোসেন শেখ একা-একা যে-মায়ার চর বানিয়েছিল, তা আজ বানানো হচ্ছে লোকসভার অনুমতি নিয়ে দণ্ডকারণ্যের গভীরে, 'একদা'র অমিত কি আজ সন্ত্রাসবাদ আর গান্ধীবাদের সংঘাত আর বিবর্তন থেকে সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকছে নাকি, অল রোড্স্ লীড টু কমিউনিজম—এই প্রতীতির সঙ্গে আরো একটু যুক্ত হয়েছে—বাঁয়ে না ডাইনে, ছিরু ঘোষ শুধু অন্যের সম্পত্তি গ্রাস করার তালেই ঘুরছে না—গ্রামপঞ্চায়েত, অঞ্চলপঞ্চায়েত আর জিলাপরিষদের নতুন পথে গ্রাম এসে জুটছে, জমিদারের কাছারিতেও নয়, মহাজনের গদিতেও

নয়, ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসের সামনে, আর অলিগলিতে আনাচেকানাচে তিনসিংহের সিল-দেওয়া সাইনবোর্ডে সরকারি অফিস জীবনযাত্রাব কোন্ অজ্ঞাত দিকের ওপর বিজ্ঞাপনে আলোকসম্পাত করছে, গ্রামেব টাউট-জোতদারের সঙ্গে শহরেব নেতাদের এক অন্য সম্পর্ক আছে, শহরেব নেতাদের সঙ্গে হাকিম-অফিসারদের সম্পূর্ণ আর এক সম্পর্ক,—ফাঁস অনেক সূক্ষ্ম, লক্ষ্যবেধ অনেক নিশ্চিত, ব্যক্তি অনেক পেছনে, যন্ত্র একেবারে সামনে।

আর এর মধ্যে গ্রামেব কৃষক, শহরের শ্রমিক, নগরের মধ্যবিত্ত, মহানগরের অভিজাত, ও রাজধানীর অমাত্য সকলে বদলে গেছে। এই পরিবর্তিত সময় আর দেশকে গল্প-উপন্যাসে ধারণ করাই আজকের কথাসাহিত্যিকের কাজ। আর তা করতে হলে "ফিবে চল মাটির টানে—" এ-ছাড়া কোন পথ নেই। বাস্তবতার জটিল সক্রিয় সূত্রকে ধরতে হবে—ইতিহাসের ও সমাজের বাস্তবতা, আর ব্যক্তির একেবারে অদৃশ্য, কোনো সূত্র মেনে না চলা, বেতাল, ঝোড়ো হাওযার মতো বাস্তবতাকে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক সূত্রের মতো বাস্তবতার সঙ্গে মেলাতে হবে। আর তার ফলে, দ্বিতীয় 'গণদেবতা', বা দ্বিতীয় 'পদ্মানদীর মাঝি' বা দ্বিতীয 'একদা'—তৈরি হবে না,—কেননা, 'প্রত্যেক যুগেরই আছে আলাদা আলাদা ধরন'।

আর সেদিক থেকে সবকালের সবদেশের লেখকের যা সমস্যা, আমাদের সমস্যা তা থেকে আলাদা নয়—স্বদেশের ও স্বকালেব বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করা। তারই প্রযোজনে নূতন ভাষার সন্ধান, নূতন ভঙ্গির সন্ধান।—সেখানেই বাংলাসাহিত্যের লেখক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব আছে। বাজারের সাহিত্য আর ব্যক্তিগত সাহিত্যের ক্রমবর্ধমান ব্যবধানকে বুঁজিয়ে ফেলতে হবে, পাঠকের পিঠের দিকে তাকিযে নয, বুকের দিকে তাকিয়ে আমাদের কথা বলতে হবে।

সেখানে আমি ব্যক্তিগত নানা সমস্যার সম্মুখীন হই। আমি জানি পাঠক সরল বাক্য পছন্দ করেন। অথচ আমার বাক্যগুলো অনিবার্যভাবে জটিল হয়ে যায়। বাংলাভাষার ক্রিয়াপদ যে কী নিদারুণ বন্ধন, লেখক মাত্রেরই সে অভিজ্ঞতা থাকা উচিত। অথচ আমি জানি, একটি নূতন ক্রিয়াপদ পাঠককে চিরতরে আমার কাছ থেকে সরিযে নিতে পারে। এই দুশ্চিন্তায় ভুগতে-ভুগতে পুনরায় ভাবি, এখনো পর্যন্ত 'করা' আব 'হওয়া' এই দুই

ক্রিয়াপদের উপর পরগাছা হয়ে যে হাজার রকম ক্রিয়াসম্পাদন হচ্ছে, তারই ফলে নামধাতু বাংলা গদ্যভাষায় প্রবর্তিত হল না। অথচ নামধাতুর ব্যাপক ব্যবহার ব্যতীত কি ক্রিয়াপদের বন্ধনদশা থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব? আমি ঠিক জানি না, আমার মধ্যে মেয়েলি কথার টান বেশি, নাকি সংস্কৃতের। একটি সংস্কৃত শব্দ তার মৌলিক অর্থে এক একটা বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে যেন সমস্ত অর্থের মধ্যে ভাতি সৃষ্টি করে। আবার এক-একটি মেয়েলি প্রবচন ঠিক মতো পছন্দ করতে পারলে প্রায় দশ লাইনের কাজ সারা যায়। আমি হালে যে উপন্যাসটি লিখেছি তাতে আমার সবচেয়ে কঠিন সমস্যা নায়ক যা করছে তা দিব্যি সহজ-সরল সাদাসিধে মানুষের মতো, আমি সেটাকে ব্যাখ্যা করতে গেলেই অসহজ, অসরল,-জটিল করে তুলছি। তার ফলে, উপন্যাসটিতে দুটো তলা তৈরি হচ্ছে। আমার মোটেই এ রকম ইচ্ছে ছিল না। অথচ এ রকমটিই হচ্ছে।

নির্মিতির দিকে আরো দুটো কথা প্রায়ই মনে হয়। বর্তমান ভারতবর্ষে ফ্যাণ্টাসি ও স্যাটায়ার লেখার মতো এত বিস্তৃত উপাদান পড়ে আছে! অথচ আমরা সেদিকে হাতও দিচ্ছি না। তার কারণ আমাদের দেশে ফ্যাণ্টাসি বা স্যাটায়ারের কোনো ঐতিহ্য নেই। ডমরুধরের লেখক ত্রৈলোক্যনাথ আজ বিস্মৃত লেখক। পরশুরামকে "উল্টা-পুরাণের" জন্য কি আধুনিক পাঠকের মনে পড়ে?—আরও একটা কারণ বোধহয় এই যে, সেন্টিমেণ্টাল উপন্যাস লিখতে যে আবেগের তাড়না দরকার, আমাদের মধ্যে সেটা কিছু থাকলেও, স্যাটায়ার বা ফ্যাণ্টাসির জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধিদীপ্ততা ও প্রখরতা আমাদের রক্তে বা মাথায় নেই। বোধহয় স্যাটায়ার লেখার এই ব্যক্তিগত অক্ষমতাই আমার গল্পগুলোতে নানারকমভাবে সাধ মিটিয়ে সোজা গল্পটাকে আরো দুর্বোধ্য করে তোলে।

এত কথা বলার পর নিজের রচনাগুলোর কথা মনে পড়ে লজ্জা করছে। কবে এমন কিছু লিখব যখন আমি সবিনয়ে আমার রচনার দিকে হাত বাড়িয়ে বলব—এই যে আমার, এ আমারই—একে আপনারা মনে রাখবেন।

'যযাতি'র পরের কিস্তি আগামী সংখ্যায়

পারভেজ শাহীদীর কবিতা

উর্দু থেকে অনুবাদ : জ্যোতিভূষণ চাকী

পুরো নাম : এস. এম. একরাম হুসেন পারভেজ শাহীদী। জন্ম ১৯১০ সালে পাটনা শহরের লোদিকাত্‌রায়। উর্দু ও ফার্সী ভাষায় এম-এ। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের লেকচারার। বাংলাদেশের প্রগতি লেখক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বিনাবিচারে দীর্ঘদিন আটক ছিলেন। কবিতার বই 'রক্‌স্‌-ই-হাইয়াৎ'। আরেকটি সংকলন যন্ত্রস্থ।

অগ্নিরেখা

লোভ মন্দির-মসজিদের সীমানা বানিয়েছে
এদিকেও ঐ আগুন ওদিকেও ঐ আগুন।
ঘর
মানুষ
ভাবনা
অট্টহাসি
চোখের জল

চাপা ঠোঁট
হৃৎস্পন্দন
বিলাপ
সোহাগ
বৈধব্য
যৌবন
বার্ধক্য
সমস্ত বিদ্যেবুদ্ধি
অজ্ঞতা
নৈঃশব্দ্য
সঙ্গীত
সব নরকে সমর্পিত।
এ কি কৌতুক।
কোথায় সেই কলস্বনা নদী?
মরীচিকা জ্বলে গেছে
মাথায় তার ছাই উড়ছে
মধ্যযুগের নরক জ্বলছে
তার উপব বৈদ্যুতিক পাখা লাগানো।
নতুন যুগ
নতুন সংস্কৃতি
নতুন রাজনীতি
এই পাখা লাগামহীন অগ্নিশিখার ফুসফুস
জানি না আর কতদূবে এই আগুন ছড়াবে?
কোথায বন্ধু।
গানের ছাই মুখে মাখো
মুখের তো প্রসাধন চাই—
স্বপ্নগুলোকে
বিবর্ণ আশাগুলোকে
এদের আতঙ্কিত মেঘগুলোকে

ডাকো।
একটু সাহসী হও।
এই মেঘের বুকে
কিছু কিছু জলের ফোঁটা তো আছে
ফুল নেই, তাতে কিছু এসে যায় না
প্রত্যেকটি জলের ফোঁটায়
ঘুমন্ত সমুদ্রকে যদি জাগাতে পারো
সমস্ত আগুনের শিখা লজ্জা পাবে।

সাপের গর্ত

বন্ধুত্ব যাবে কোথায়?
তার আস্তিন থেকে
হিংস্র সাপ বেরিয়েছে—
দুটো হাত বেরিয়েছে
খোলা মুখ একটা আর একটায় গেঁথে গেছে।
উন্মত্ত আনন্দে বীণ বাজছে হেলে দুলে
আর
সাপুড়ে হাসছে।

ব্যাঙ্ক

এই অগ্নিমন্দির আর গির্জা,
এই দেবালয় আর মসজিদ—
ধর্ম আর অধর্মের নামে শপথ করে বলছি,
এ সবই হল ব্যাঙ্ক।
কোনো না কোনো ভাবে
রাজনীতিবই সব অংশীদারি।
চেক হিসেবে আমরা
টাকায় বদল হচ্ছি,
তোমরাও তাই হচ্ছ।

পিয়াসী স্বপ্ন

এ-সাগর ও-সাগর বাষ্পের দাপাদাপি
এ-বন ও-বন শ্রাবণ ভাদ্রের আনাগোনা,
সবুজের আভাস উছলে পড়ে
বালুর গভীরে জলের আঁকুপাঁকু।
পিয়াসী স্বপ্ন শুধোয়—
'কিন্তু বর্ষণ হবে কবে ?'

কথার শহর

কথার শহর
অর্থবোধের দুর্ভিক্ষ
চোখ আর কানের দুয়োর বন্ধ।
বোধের ভাঙা জানলা দিয়ে
শুধু শ্বাসরোধের প্রবেশাধিকার।
মনের দরজায় তালা
অস্পষ্ট অসন্তোষের তালা
চেতনার হাট শূন্য
দেবার জিনিস নেই, ঠোঁটের দোকান খালি।
সুরহীন চিন্তা
সঙ্গীতে সমস্ত চেতনার ক্রোধ।
কোথাও আলাপচারী নেই
নেই স্তুতিনিন্দার খেয়াল
কোনো স্বপ্নের ইন্দ্রজাল নেই
নেই কোনো শখের জাদু
আত্মতুষ্টির গলিঘুঁজিতে উড়ন্ত ধুলো
স্বগতোক্তিব ফুঁপিয়ে-কাঁদা দম্ভ
হাল্কা সুরের দেয়ালের আড়ালে
পাণ্ডুর মুখে আওয়াজের ছাই মাখা।
চোখ ধোঁয়ায় ভরা
জলের ধারা

আত্মার আগুন নেভা
মরা ফুল্‌কিকে আত্মার দীপ্তি বলাব দাবি
আমি-একা বোধের দেওয়া দুঃখ
রূপে ত্যক্ত,
আন্তরিকতায বিরক্ত
সারা দুনিয়ার উপর ক্ষোভ
আর অবনতির ফাঁদে বন্দী।
হাত পেতে চায় মর্যাদার ভিক্ষা
উচ্চকোটি কৃষ্টির দান
সোনার বিষে ভবা সৌধ
লোভজাগানো সংস্কৃতির দীপ
যক্ষ্মাগ্রস্ত ভিখিরীকে শুধু আশীর্বাদ দিচ্ছে
আর
এই বাঁকা অন্বেষণের লভ্য
ফাঁকা শব্দ ছাড়া কিছুই না
শুধু ফাঁকা শব্দ—
কতকগুলো গ্রন্থিল আওয়াজের মূল্যহীন দান
শুক্‌নোঠোঁট ক্লান্তদন্ত নিরাশাব নিয়তি।
এই যে 'অসহাযতা' এ ভিক্ষে-করা
দুঃখের দিগ্‌ভ্রান্তিও ভিক্ষে-করা
দিনরাত ঝিমুনি
মৃত্যুযন্ত্রণায় প্রাণ বন্দী।
দৃষ্টি আর মনের ধ্বংসস্তূপ
ধারাবাহিক মৃত্যুর দক্ষ কারিগরি
হুঁশিয়ারি-দেওয়া দৃশ্য
সাহস জাগানো উপলব্ধি
আর
এই শহরেরই সীমানার কাছে
সমভাষীদের বসতি

চোখ আর কথার স্বর্গ
শ্রোতার কান আব
বক্তার ঠোঁটের স্বর্গ
(স্বগতোক্তির পাড়ার নিঃশব্দ নম্রতা
যাকে ঈর্ষ্যায় বলেছে 'পিছিয়ে-পড়া এলাকা')
এই বাসিন্দাদেব এখানে
নিজেদের ছোঁয়াচে আনন্দের উপবে আস্থা
এই বসতি থেকে বয় আনন্দবাহী হাওয়া
কথোপকথনের ভোরের হাওয়া
মানুষের কথার গন্ধে ভরা
দূরে আর কাছে যাওয়া
নেচে নেচে ধাওয়া।
মানুষেব গৌরব আনন্দে চেয়ে দেখে ॥
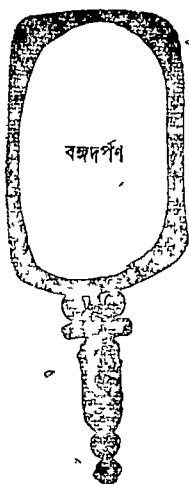
শিল্পে বিরোধের একদিক

ঘেরাও

সুমুখ উপাধ্যায়

গত ক'মাসে বাংলাদেশে প্রায় সকলেই 'ঘেরাও'-সচেতন হয়ে উঠেছেন। উঠতে বসতে, সকালে ঘুম ভেঙে উঠে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে, আপিসে কাছারিতে কলম ঠেলতে ঠেলতে একজন সাধারণ বাঙালী দিনের মধ্যে কতবার যে 'ঘেরাও' আন্দোলনের কথাটা শুনেছেন, বলেছেন, পড়েছেন তা বোধহয় হিসেবেরও বাইরে। তার মধ্যে হয়ত এঁদের কারো কারো অভিজ্ঞতাটা হয়েছে প্রত্যক্ষ—হয পদস্থ কর্মচারী হিসেবে কেউ কর্মস্থলে আটকে থেকেছেন কিছুক্ষণ, আবার অনেকে হয়ত নিজেদের দাবি পেশ আর পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ প্রকাশ করার জন্যে এই ধরনের প্রতিবাদ প্রদর্শনে সাক্ষাৎভাবে যোগ দিয়েছেন। অতএব স্বাভাবিক-ভাবেই, 'ঘেরাও' প্রসঙ্গে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সামাজিক গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, বিপরীত মতামত এবং প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। একদিকে যেমন 'ঘেরাও' প্রসঙ্গে তুমুল তর্ক আর প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, মাথাগরম হয়ে অনেকের রক্তচাপবৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি 'ঘেরাও' জিনিসটা গল্পে আড্ডায় বেশ খানিকটা রসেরও ভিয়েন চড়িয়েছে। কেউ মন্তব্য করেছেন যে, ইংরেজি দৈনিকের কৃপায় 'ঘেরাও' কথাটি অবিলম্বে ইংরেজি ভাষায় আব অক্সফোর্ড ডিক্‌শনারিতে অক্ষয় আসন পেয়ে যাবে ; কেউ নজির দেখিয়েছেন, শৌখিন সমাজের মহিলাদের কার কত

কাছাকাছির কোন্ লোক কতবার কতক্ষণ এবং কতটা কষ্ট স্বীকার করে 'ঘেরাও' হয়েছেন তাই নিযে নাকি তাঁদের মধ্যে রেষারেষি দেখা দিয়েছে, কারণ সেটাই নাকি সম্প্রতি সামাজিক পদমর্যাদার মাপকাঠি এবং তাই দিযে ব্যক্তিবিশেষের খাতির বাড়ছে বা কমছে ; আবার কেউ হয়ত খবর এনেছেন, কোন্ বাড়িতে সুকুমারমতি শিশুরা নাকি মার্বেল বা ঘুড়ি কেনার পযসা চেযে না পেযে খোদ মা-বাবাকে 'ঘেরাও' করেছে।

শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও বাঙালী যে হাসতে ভোলে না, এটা তার প্রমাণ। নইলে 'ঘেরাও' যে একটা গুরুতর ব্যাপার, কে তা অস্বীকার করবে ?

শিল্পের মালিক আর পরিচালকদের সঙ্গে শ্রমিকের সম্পর্ক, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক আর জনজীবনের ভবিষ্যৎ—এমনি অনেক সমস্যা এবং নানা বিষয় 'ঘেরাও'-এর সঙ্গে জড়ানো। তাই 'ঘেরাও' নিয়ে সম্যক্ আলোচনা আজ বিশেষ প্রযোজন।

বিশেষজ্ঞের আলোচনাচক্র

এ জাতীয় একটি ধারাবাহিক আলোচনা সম্প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এটি ছিল পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠন বিষযক আলোচনাচক্র। ইদানীং শিল্পে বিরোধের কারণ, তার তাৎপর্য এবং সমস্যাটির সমাধান সম্পর্কে একটি লিখিত আলোচনা পেশ করা হয়। পতিতপাবন পাঠক, টি. এন. সিদ্ধান্ত, প্রণবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, রঞ্জন দাশগুপ্ত, বি. এম. বসু ও নীতীশরঞ্জন দে এই রচনাটির প্রস্তুতিতে সাহায্য করেন এবং আলোচনাসভায় বক্তব্যটি রাখেন নীতীশরঞ্জন দে।

শিল্পে বিরোধ এবং মালিক-শ্রমিক সমস্যা সম্পর্কে এই আলোচনার মোদ্দা-কথাগুলো 'পরিচয়ে'র পাঠকদেব জেনে রাখা ভালো। তা না হলে ভাবাবেগের আতিশয্যে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্যব্যঞ্জক জল্পনাকল্পনার জটাজালে আসল ব্যাপারের খেই হারাবার ভয় থাকে।

সমস্যাটি পূর্বাপর এইভাবে খুঁটিয়ে দেখতে হবে :

> —আজকাল শিল্পের শ্রমিকদের প্রধান প্রধান অভাব-অভিযোগের প্রকৃতি কী॥ শ্রমিকের বর্তমান জীবনযাত্রার পদ্ধতি ও মান সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে শ্রমিকবিক্ষোভের মূলে কী আছে তা জানা যাবে না।

—ইদানীংকালে শিল্পের মালিক আব পরিচালকদের সঙ্গে শ্রমিকদের সম্পর্ক খারাপ হওয়ার কারণ কী ॥

—যেসব সাংগঠনিক ত্রুটির দরুন শিল্পে সম্ভাব্য ভালোর দিকে পরিবর্তন আটকে আছে, তা দূর করার উপায় কী এবং পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থার উন্নতি ঘটাবার উপায় কী ॥

দুই

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পোদ্যোগে বিরোধ যে গুরুতরভাবে দেখা দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এই বিরোধ কোথায় এবং কেন তা বিচার করে দেখা দরকার।

শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্য হিসেবে সারা ভারতে পশ্চিমবঙ্গের নামডাক। কিন্তু সে রাজ্যে শ্রমিকশ্রেণী কী পায় এবং কিভাবে থাকে তা অনেকেরই জানা নেই।

আয়ের বহর

১ নং আর ২ নং তালিকা দেখুন; আর ১ নং চিত্র। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের শ্রমিকদের আয়ের বহর দেখুন। অন্য যেসব রাজ্যে শিল্পোদ্যোগ আছে, শ্রমিকের আয়ের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা তাদের অনেকের চেয়ে ভালো তো নয়ই বরং খারাপ বলা যায়। অথচ এ রাজ্যে শিল্পোদ্যোগ কম কোথায়, দিন দিন তো বেড়েই চলেছে।

১ নং তালিকা

ভারতের ছটি রাজ্যে রেজিস্টার্ড ফ্যাক্টরির সংখ্যা ও লগ্নীকৃত মূলধন। (১৯৬২)

রাজ্য	রেজিঃ ফ্যাক্টরির সংখ্যা	লগ্নীকৃত মূলধন (কোটি টাকায)
বিহার	৩০৫	২৮৯
গুজরাট	৯৮৭	২৫৩
কেরল	৫৩৮	৫৬
মাদ্রাজ	৮৬৯	১৯৬
মহারাষ্ট্র	২,০৯৭	৬৪৯
পঃ বঙ্গ	১,৫৫৪	৭৫৬

২ নং তালিকা

রেজিস্টার্ড ফ্যাক্টবিতে নিযুক্ত কর্মীদের সংখ্যা, কর্মীদের মোট আয় ও গড়পড়তা আয়। (১৯৬২)

রাজ্য	নিযুক্ত কর্মীব সংখ্যা	মোট আয (কোটি টাকায়)	গডপডতা আয (কোটি টাকায)
বিহার	১৮৫,০০০	৪৪	২,৩৭৮
গুজরাট	৩০৯,০০০	৬০	১,৯৪২
কেরল	১৩৭,০০০	২৬	১,৮৯৮
মাদ্রাজ	২৩৭,০০০	৫০	২,১১০
মহারাষ্ট্র	৬৭৪,০০০	১৪৫	২,১৫১
পঃ বঙ্গ	৭২৮,০০০	১৪৩	১,৯৬৪

আবাব এও দেখুন, পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের শ্রমিকদের আয় শুধু যে হালে কমেছে তা নয় ; গত কয়েক বছব ধরে সমানেই কমছে।

৩ নং তালিকা

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের ও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সারা ভারতের কর্মীদের আয়ের আনুপাতিক হার।

বছর	পঃ বঙ্গের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের আনুপাতিক হার	পঃ বঙ্গের সঙ্গে সারা ভারতের আনুপাতিক হার
১৯৫৯	০.৯১৯৪	০.২৪৩২
১৯৬০	০.৯০৯৩	০.২৩৯১
১৯৬১	০.৮৮৮৩	০.২৩০২
১৯৬২	০.৮৭৫৭	০.২২৮৯
১৯৬৩	০.৯১৪২	০.২৩২৯
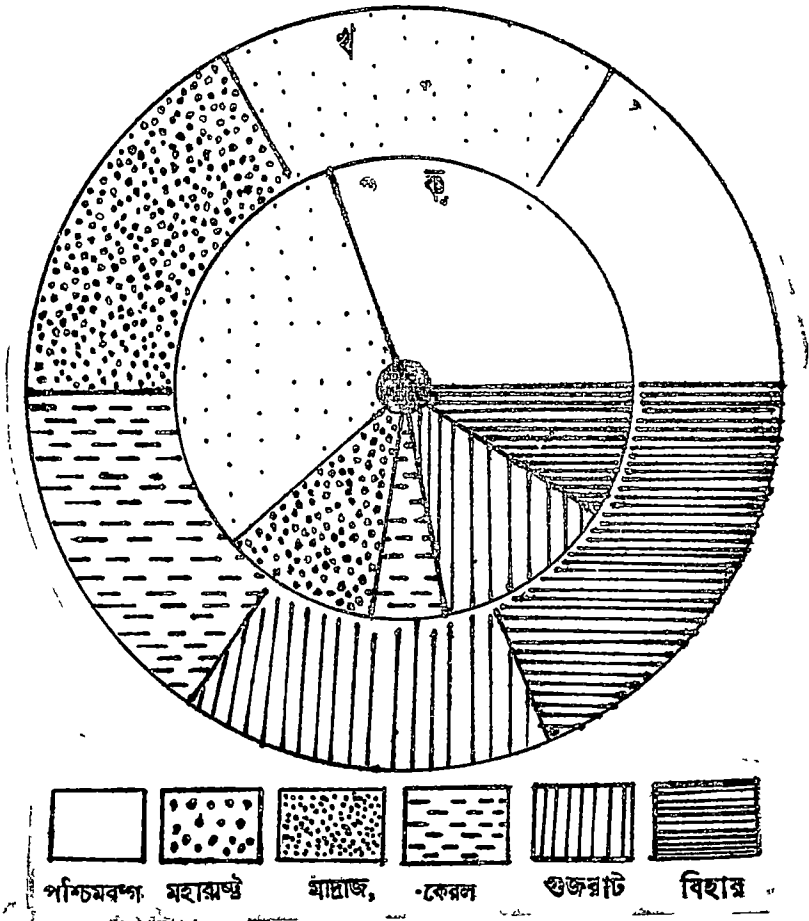
ক। কর্মীদের মোট আয়ের হিসাব।
খ। কর্মীদের গড়পড়তা আয়ের হিসাব।

এ তো শুধু রেজিস্টার্ড ফ্যাক্টরি আর অপেক্ষাকৃত বড় শিল্পের শ্রমিকদের দশা। বাদবাকি শ্রমিকদের কী হাল তা এ থেকেই আঁচ করা যায়। ১৯৬১ সালে গোটা শিল্পের ক্ষেত্রে মোট যা কর্মসংস্থান তার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি পড়েছিল ছোট এবং কারিগরি শিল্পের ভাগে। ক্ষুদ্রশিল্পের শ্রমিকেরা এতই কম পায় যে বহুদিন ধরে তার হিসেব রাখার ব্যাপারে সরকারের

দিক থেকেও তেমন কোনো গা নেই। শুধু তাই নয়। ঐ ১৯৬১ সালেই কলকাতা আর তার আশপাশে যাবতীয় কর্মসংস্থানের শতকরা ৫৫'২ ভাগ— তার মানে, অর্ধেকেরও ঢের বেশি—ছিল 'পরিশিষ্ট এলাকাভুক্ত', অর্থাৎ শিল্পকৃষি-বর্হিভূত অন্যান্য বৃত্তি। এর অধিকাংশই ছোটখাটো হোটেল-রেস্তোরাঁয় বয়-বাবুর্চির চাকরি, ঠিকে মজুরবৃত্তি, ঝাড়ুদার-মেথরগিরি বা আর পাঁচ রকমের হাডভাঙা খাটুনি আর কম মাইনের কাজ। অন্য এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৫৪-৫৫ থেকে ১৯৫৭-৫৮ সালের মধ্যে কলকাতা শহরাঞ্চলের নারী কর্মীদের প্রায় ছ আনা অংশ ঝি-আয়া-রাঁধুনি হিসেবে পরের বাডিতে কাজ করে।

কলকাতা শহরে গডপডতা মাথাপিছু আয় কেন এত কম তা এ থেকে বোঝা যায়। বোম্বাই শহরে যারা মাসে বড় জোর ২০৲ টাকা রোজগার করে, তারা শহরের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৫.৮ ভাগ ; কিন্তু কলকাতা শহরে সেটা শতকরা ৩০ ভাগ।

তার ওপর বেকার

অবশ্য কলকাতা শহরের দুরবস্থা শুধু রোজগার দিযে বোঝা যাবে না। কেননা এ শহরে বেকার সমস্যা ভযাবহ। ১৯৬১ সালের আদমসুমারি থেকে জানা যায়, কলকাতার কর্মক্ষম (১৫ থেকে ৫৯ যাদের বয়স) লোকের মধ্যে শতকবা ১২.১ ভাগ লোককে পুবোপুরিভাবে কাজ দেওয়া যায নি, তার মধ্যে ১ লক্ষ ৭০ হাজার সক্ষম লোক সম্পূর্ণ বেকার এবং ৩ লক্ষ ৩০ হাজার লোক অংশত বেকার।

বেকার সমস্যা এত বেশি হওয়ার দুটো কারণ :

১॥ কলকাতা আর তার আশপাশে ১৯৫১-৬১ এই এক দশকে প্রায ৭ লক্ষ ৭০ হাজার লোক বহিরাগত। তার মধ্যে ৫ লক্ষ ৪২ হাজার অর্থাৎ বহিরাগতের শতকরা ৭০ ভাগ ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে জীবিকার সন্ধানে এ শহবে এসেছে ; আর ২ লক্ষ ২৮ হাজার অর্থাৎ বহিরাগতের শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ এসেছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে।

২॥ অন্যান্য কযেকটি রাজ্যের তুলনায পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নবৃদ্ধির অত্যন্ত নিম্ন-হার। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে পশ্চিমবঙ্গে

মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১.৬ ভাগ, আর এই সময়ে আয়বৃদ্ধির হার মধ্যপ্রদেশে শতকরা ৩.৯ আর মহারাষ্ট্রে শতকরা ৩.৭ ভাগ। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫১-৬০ সালের মধ্যে রেজিস্টার্ড ফ্যাক্টরিতে গড়পড়তা দিন হিসেবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৫ ভাগেরও কম, এইসময়ে কর্মসংস্থান-বৃদ্ধির হার মহারাষ্ট্রে শতকরা ৪৫ ভাগ এবং গুজরাটে শতকরা ১৩ ভাগ।

একথা মানতেই হবে যে, পশ্চিমবঙ্গে শিল্পোদ্যোগ পূর্ণোদ্যমে চলছে না। যেমন দেখুন, শিল্পে লগ্নী পুঁজির পরিমাণের দিক থেকে ১৯৬২ সালে বৃহত্তর কলকাতায় আনুমানিক ২৫ লক্ষ চাকরি থাকা উচিত ছিল, কিন্তু কার্যত বাজারে চাকরি ছিল ৯ লক্ষেরও কিছু কম। পশ্চিমবঙ্গকে কয়েকটি অত্যাবশ্যক কাঁচামাল কেন্দ্রীয় সরকারের দিতে না পারা এবং দিতে না চাওয়াই এর প্রধান কারণ। পশ্চিমবঙ্গ ১৯৬৩-৬৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রতিশ্রুত পরিমাণের শতকরা কত ভাগ পেয়েছিল, দেখুন: তামা শতকরা ১১ ভাগ, দস্তা শতকরা ৭ ভাগ, টিন শতকরা ১৭.৫ ভাগ এবং সীসে শতকরা ২.৩ ভাগ। অথচ ঠিক এই সময়ের মধ্যেই মহারাষ্ট্র আর গুজরাটের ঐসব জিনিস পর্যাপ্ত পরিমাণে, এমন কি কখনও কখনও নিজেদের বরাদ্দেরও বেশি পেতে কোনো বাধা হয় নি।

সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে শিল্পোন্নয়নের হার কী করেই বা বাড়বে? যন্ত্রচালিত উৎপাদনের ক্ষেত্রে ১৯৫১-৬২ সালের মধ্যে যেটুকুওবা কর্মসংস্থান বেড়েছে (চক্রবৃদ্ধিহারে শতকরা ৩.২৫ ভাগ), রেজিস্টার্ড ফ্যাক্টরির কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে তার বিশেষ ছাপ দেখা যায় না (চক্রবৃদ্ধিহারে শতকরা মাত্র ০.৯ ভাগ)।

নরকবাস

একে তো কর্মসংস্থানের এই সমস্যা আর ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, তার ওপর আছে শ্রমিকদের দিনের পর দিন শহরাঞ্চলের বস্তিতে আর পায়রার খোপের মত ঘরে ঘাড় গুঁজে থাকার অসহ্য গ্লানি। এইটুকু ঘিঞ্জি জায়গায় ভিড়ের মধ্যে গায়ে গা ঠেকিয়ে থাকা—না আলোহাওয়া, না জল, না স্বাস্থ্যরক্ষার কোনো ব্যবস্থা। এতে যদি কেউ মেজাজ ঠিক রাখতে না পারে, যদি ধৈর্য হারিয়ে ফেলে—আপনি তাকে দোষ দেবেন?

ডক্টর এস. এন. সেনের পরিচালিত কলকাতার বিষয়ে একটি সমীক্ষায় ১৯৫৭-৫৮ সালে বলা হয়েছিল :

> 'প্রত্যেকটি লোকের বসবাসের জন্যে অন্তত ৪০ বর্গফুট জায়গার দরকার—এটা ধরে নিলে, মাঝারি ও বড় সংসারের শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশি এবং ছোট সংসারের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ ঘিঞ্জির মধ্যে থাকে।'

খোদ কলকাতার ২৯ লক্ষ লোকের মধ্যে দশ লক্ষেরও বেশি থাকে বস্তিতে। বস্তীগুলো যে কী জিনিস, তা বুঝতে পারবেন খিদিরপুরের বস্তি অঞ্চল সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সমীক্ষার বক্তব্যে :

> 'একে বাড়ি বলাটা হবে নিতান্তই গায়ের জোরে। যারা এখানে থাকে, বৃষ্টিতে তাদের মাথা বাঁচাবারও তেমন ব্যবস্থা নেই।···বস্তির প্রায় ষোলআনা ঘরেই দম-আটকানো। দিনমানের কোনো সময়েই ঘরে আলো আসে না, বছরের কোনো সময়েই ঘরে হাওয়া ঢোকে না। আলাদা কোনো স্নানঘর, এমন কি মেয়েদের জন্যেও নেই। একবালপুর লেনে পৌর-প্রতিষ্ঠানের একটি পায়খানার সামনে কয়েক কুড়ি লোক দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম।···পায়খানাও সব এমন যে, মাসে দুবারের বেশি পরিষ্কার করাই হয় না।···নাগরিক সুযোগসুবিধা, যেমন শিক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে, যা দেখেছি তা লিখতে গিয়ে মাথা কাটা যাচ্ছে। এসব এলাকায় ওসবের কোনো অস্তিত্বই নেই। স্কুলে-যাওয়া ছেলে কদাচিৎ আমাদের চোখে পড়েছে। এইসব এলাকার শিশুদের দুর্দশা দেখে কতবার যে চোখ ফেটে জল এসেছে আর সেই সঙ্গে কেবলি মনে হয়েছে, ঘুরে ঘুরে এইসব দুঃখের হিসেব কষি অথচ তার বেশি কিছু করতে পারি না—এটা কম বেদনার নয়।'

তিন

সাম্প্রতিককালে শিল্পে বিরোধসংক্রান্ত আলোচনায় মনে রাখতে হবে, শ্রমিকের ও খেটে-খাওয়া জনসাধারণের এই হল অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার হাল সেই সঙ্গে এও দেখতে হবে—শিল্পের মাথায় যারা বসে আছে, বিভিন্ন সওদাগরি আপিসের যারা ওপরওয়ালা আর চাঁই—তারা

কি রকম মোটা অঙ্কের মাইনের সঙ্গে কী পরিমাণ উপরি সুযোগসুবিধে ভোগ করে থাকে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মাথায় বসে আছে বিলাসব্যসনে গা-ভাসানো এই শৌখীন সম্প্রদায় আর পায়ের তলায় আসল উৎপাদক এই শ্রমিক শ্রেণী। অর্থনৈতিক অবস্থায় আর জীবনযাত্রার মানের দিক থেকে এ দুইয়ের আশমান-জমিন ফাবাক। এর পরও কেউ জিজ্ঞেস করবেন, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে মালিকের সঙ্গে, পরিচালকের সঙ্গে শ্রমিকেব বিরোধ বাধে কেন?

তবু রব ওঠে, বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা আর রইল না। যুক্তফ্রণ্টের রাজনৈতিক দলগুলো নাকি শ্রমিকদের কেবল ওস্কাচ্ছে, মালিকদের পেছনে কেবল কাঠি দিচ্ছে!

রটনা বনাম ঘটনা

অথচ মজার কথা এই যে, অন্য শিল্পবহুল রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গেব শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সংঘর্ষ বেশি, শ্রমিকেবা সব সময়েই কোনো না কোনো আন্দোলনে মেতে আছেন—এ যুক্তি ধোপে টেঁকে না। হাতেকলমে তার তুলনামূলক প্রমাণ দেখুন:

৪ নং তালিকা

ভারতের ছটি রাজ্যে শিল্পে বিরোধ, তাতে যোগদানকারী শ্রমিকের সংখ্যা ও অপচয়িত শ্রম-দিনের হিসাব। (১৯৬৫)

রাজ্য	বিরোধের সংখ্যা	যোগদানকারী শ্রমিকের সংখ্যা	অপচয়িত শ্রম-দিনের সংখ্যা
পঃ বঙ্গ	২৩৮	১,৫২,৩১৫	১৭,৪৫,৯৪৪
মহারাষ্ট্র	৫৮৬	৩,৭৯,৯৫৯	১২,০৩,৩৮৮
মাদ্রাজ	১৩৭	৪৭,৭৪৯	৩,৭৭,৭৯০
কেবল	২০০	১,৫৬,১১০	৮,৬৮,৬৯০
উঃ প্রদেশ	১১৫	৪৫.৯৬৯	৪,৪৭,৩৯১
গুজরাট	৩৮	৭,৪৭৫	৫০,৮৫৩

৫ নং তালিকা

তার মধ্যে রাজনৈতিক ধর্মঘট প্রভৃতি, যোগদানকারী শ্রমিকের সংখ্যা ও অপচয়িত শ্রমদিনের হিসাব। (১৯৬৫)

রাজ্য	বিরোধের সংখ্যা	যোগদানকারী শ্রমিকের সংখ্যা	অপচয়িত শ্রম-দিনের সংখ্যা
পঃ বঙ্গ	৭	৬,৫৭৯	৫,০৮৫
মহারাষ্ট্র	৪৬	১,৫৮,২০০	১,৫২,৮৪২
মাদ্রাজ	৩৫	২৬,৮৩৪	২৮,৬৬৫
কেরল	১১	৩,৬২৪	৪,৯৮৩
উঃ প্রদেশ	৪	২,৯৩৮	৩২,৮৬০
গুজরাট	১৬	২৩,৮৯১	২৩,৮৯১

পঃ বঙ্গ ও মহারাষ্ট্রে শিল্পে বিরোধের হিসাব
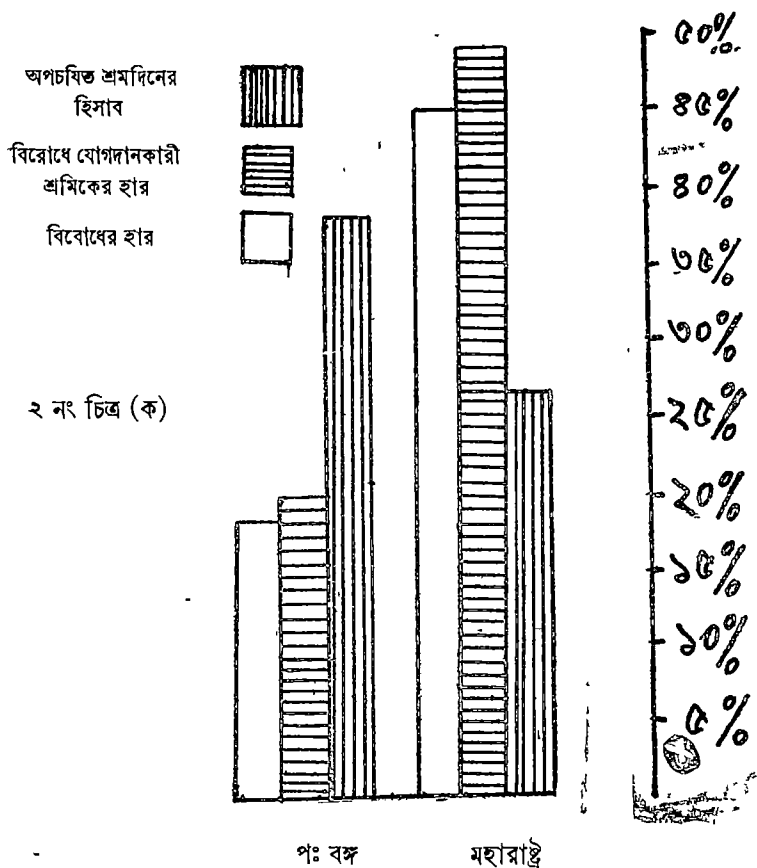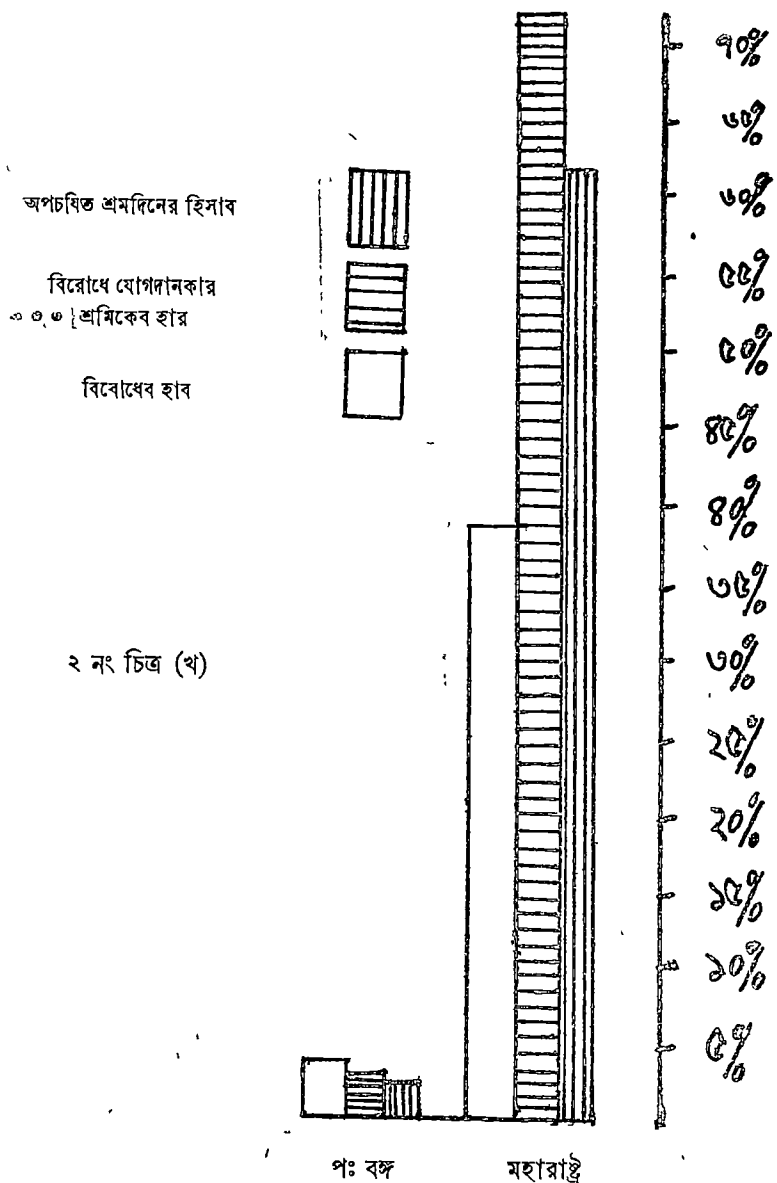
২ নং চিত্র (ক)

২ নং চিত্র (খ)

৫ নং তালিকা আর ২ নং চিত্র দেখলেই বুঝবেন, মহারাষ্ট্রের তুলনায় বাংলাদেশে রাজনৈতিক কারণে হরতাল প্রায় সাড়ে ছ'গুণ কম

যদিও, মহারাষ্ট্রে বস্ত্রশিল্পে আর ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে মজুরির হার বাংলাদেশের চেয়ে বেশি এবং যদিও, বাংলাদেশে শিল্প-মালিকেরা শ্রমিকদেব ট্রেড ইউনিযনকে মানতে বাধ্য নয় কিন্তু মহারাষ্ট্রে তারা ট্রেড ইউনিয়নকে স্বীকার করতে বাধ্য।

শ্রমিকদের মুখপাত্র ট্রেড ইউনিয়নকে মালিকদেব মেনে নেওয়ার ব্যাপারে ঘেরাওতে অন্তত কযেকটি ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে মামুলী হলেও তত্ত্বগতভাবে এর গভীর তাৎপর্য আছে। কেননা, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন (পেটোয়া ইউনিযন ছাড়া) মেনে নেওয়ার ব্যাপারে মালিকপক্ষের কোনোবকম গা নেই। শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধিমূলক সংস্থা হিসেবে ট্রেড ইউনিযনকে এ রাজ্যের শিল্পপতি আর প্রশাসকেরা মেনে না নেওযার ফলে শ্রমিকদের সঙ্গে কখনও মুখোমুখি সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। তৃতীযপক্ষের আইনমাফিক মধ্যস্থতার ওপর নির্ভর করতে কবতে মালিকপক্ষ একথা ভুলে গেছেন (এবং তাঁদের দেখে শ্রমিকদেরও সেই প্রতিক্রিয়া হয) যে, শেষ অবধি শিল্পে বিরোধেব আসল সমস্যা হল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের সমস্যা—যার মীমাংসা সব সময়ে আইন দিয়ে হয় না।

অবাধ্য মালিক

তাই ব'লে, শিল্পের মালিক আব পরিচালকেরা যে সব সময় নিজেরা আইন মেনে চলেন, তাও তো নয! যেখানে নিজেদের স্বার্থে ঘা লাগে, সেখানে তাঁরা আইনসম্মত যেকোনো নিযম বা প্রথাকে কলা দে
কই কসুর করেন না!

যেমন ধরুন, ১৯৫৮ সালে ভারতীয় শ্রমিক সম্মেলনের ষোড়শ ধিবেশনে সমস্ত কেন্দ্রীয় মালিক ও শ্রমিক সংস্থা মিলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, ঐ বছরের ১লা জুন থেকে একটি প্রস্তাবিত আচরণবিধি মেনে চলা হবে; যে যে জাযগায কর্মীদের ইউনিযন আছে, সেই সেই জায়গায প্রশাসন কর্তৃপক্ষ ইউনিযনকে স্বীকৃতি দেবে—এটা ছিল ঐ আচরণবিধির অন্যতম শর্ত।

তারপব নটা বছর কেটে গেছে। বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠানে আজও সেই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মানবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না—যেমন, পাটশিল্প প্রতিষ্ঠানে। মালিকদের সব রাগ গিয়ে পড়ে সেই ইউনিয়নের ওপর, যারা

শ্রমিকদের সত্যিকার প্রতিনিধি। তাঁরা উঠে পড়ে লাগেন পাল্টা ইউনিয়নের সাহায্যে সেই ইউনিযনকে (যেটা প্রায়ই হয় বৃহত্তর ইউনিয়ন) ঘায়েল করতে, একদল শ্রমিককে ওস্কাতে অন্য একদল শ্রমিকের বিরুদ্ধে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পেও এই একই ব্যাপার চোখে পড়ে। এক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে এ রাজ্যের লেবার কমিশনার একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলভুক্ত ইউনিযনকে স্বীকৃতি দিযেছিলেন—অথচ সাম্প্রতিক প্রত্যেকটি নির্বাচনে সেই শিল্পাঞ্চল থেকে (যেখানে প্রধানত ঐ শিল্পপ্রতিষ্ঠানেরই শ্রমিকদের বাস) অন্য আরেকটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা বিপুল ভোটাধিক্যে সমানে নির্বাচিত হচ্ছেন।

যেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানে মালিকপক্ষ শ্রমিক-ইউনিয়ন মেনে নিয়েছেন? সেখানেও সন্দেহ আর অবিশ্বাস পদে পদে বাদ সাধে। শ্রমিক-ইউনিয়ন যেই কোনো অভাব-অভিযোগের কথা বলে, কোনো কিছুর সুরাহা চায়—অমনি ছোটবড় কর্তারা বসে যায় সেসব দাবিদাওয়ার খুঁত কাড়তে, দিনের পর দিন বসে সমস্যার উকুন বাছতে—যেন আগে থেকেই তাদের ঠিক করা আছে যে, শ্রমিকদের দাবিমাত্রই অসঙ্গত এবং অনাবশ্যক। অথচ প্রশাসনের দিক থেকে কোথাও এতটুকু ঠেকলে অমনি তড়িঘড়ি সে বিষযে সিদ্ধান্ত নিতে তো বাধে না?

চাই বোঝাপড়া

গত বিশ বছরেব খতিযান নিন। মালিকে শ্রমিকে মতান্তরের ক্ষেত্রে ওয়ার্ক্‌স্‌ কমিটি কতটা কী করতে পেরেছে? পারস্পরিক বোঝাপড়ার দিকে না গিযে ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন আর আইনমাফিক সালিশী সংস্থার কাছে ছুটে যাওয়াটাই রেওযাজ হয়ে দাঁড়ানোয় ওয়ার্ক্‌স্‌ কমিটি বিশেষ কিছু করতে পারে নি। এ অবস্থায, মালিক তাঁর মুশকিলের সময কী করেই বা আশা করেন যে, শ্রমিকেরা তাঁর প্রতি সদয় হবেন এবং সংকট দেখা দিলে উৎপাদনের স্বার্থে তার মোকাবেলা করবেন?

তাছাড়া শ্রমিক শ্রেণীকে শিল্পোৎপাদনের জটিল প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তালিম দেওযা, নতুন উৎপাদনপদ্ধতির উন্নত পন্থার ব্যাপারে জানানো বোঝানো—এ নিয়ে মালিকপক্ষের কোনো মাথাব্যথা নেই। অথচ সমাজতান্ত্রিক দেশে তো বটেই, এমন কি দুনিয়ার বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশেও—নিজের নিজের ক্ষেত্রে শীর্ষে ওঠার সুযোগ থাকে বলে শ্রমিকদের মধ্যে ভালোভাবে কাজ

শেখার একটা আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু এদেশে, এমন কি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পেও, এমন একটা ঐতিহ্য এখনও গড়ে ওঠে নি যাতে শ্রমিকেরা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একাত্মতার ভাব অনুভব করতে পারেন।

চার

শ্রমিকদের হাঁড়ির হাল, মালিক আর প্রশাসকদের অদূরদর্শিতা আর কেবল নিজেদের কোলে ঝোল টানবার চেষ্টা—এই সব নানা কারণে মালিকদের কার্যকলাপ আজ শ্রমিকদের চোখে 'শয়তানী চক্রান্ত' হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই 'ঘেরাও' হয়েছে শ্রমিকদের হাতে একটা নীতিগত প্রতিবাদের হাতিয়ার।

শেষ অস্ত্র

'ঘেরাও' যেন সংঘাতবহুল কোনো নাটকের শেষ অঙ্ক।

সেই কারণেই, একে দৈনন্দিন শ্রমিক আন্দোলনের অঙ্গ বলে পুরোপুরি মানা যায় না। অনন্যোপায় হলে বড় জোর এটা শেষ অস্ত্র। এও ঠিক যে, 'ঘেরাও'-এর মাত্রাধিক্য ঘটলে দেশের অর্থনীতিতে ও সামাজিক ক্ষেত্রে অবস্থা সঙ্গিন হবে।

প্রথমত, পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রিয় নতুন সরকার হয়েছে; এই সরকার অত্যন্তজরুরী কয়েকটি সমস্যা নিয়ে বিব্রত—এ সময়ে যথাসম্ভব ধৈর্য ধরা বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয়ত, উচ্চকর্মচারী আর প্রশাসকদের মনে 'ঘেরাও' ত্রাসের সঞ্চার করেছে; আতঙ্কগ্রস্ত লোকদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কর্তব্যপালন সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, 'ঘেরাও'-এর বাহানা তুলে কোনো কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান উন্নয়ন-মূলক পরিকল্পনা বাতিল ক'রে দিতে পারে, যার ফলে বেকারত্ব বাড়বার সম্ভাবনা দেখা দেবে এবং শেষ পর্যন্ত শ্রমিকের গায়েই তার চোট এসে পড়বে।

চতুর্থত, একথাও মানতে হবে যে, কিছু অপরিণামদর্শী লোক আছে যারা অনর্থক 'ঘেরাও' বাধিয়ে দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনর্থ ঘটাতেও পিছপাও নয়।

ভবিষ্যতের কর্মপন্থা

গোড়ায় যে আলোচনাচক্রটির কথা বলা হয়েছে, তাতে এইভাবে বিশ্লেষণের পর ভবিষ্যতের একটি কর্মপন্থারও ইঙ্গিত দেওযা হয়। সরকার, মালিক আব শ্রমিক—তিন পক্ষের মনোভাবের ওপর এই কর্মপন্থার সাফল্য নির্ভর করবে :

(১) গোপন ব্যালটে শ্রমিকদের স্বনির্বাচিত ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিয়ে মালিকপক্ষ যাতে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, সরকারকে তা দেখতে হবে। দরকার হলে এ ব্যাপারে আইনেব কিছুটা রদবদল করাও উচিত।

(২) শ্রমিকের প্রতিনিধি হিসেবে এইসব ইউনিয়ন যাতে উৎপাদনের কাজে মাথা ঘামাতে পারে, তার ব্যবস্থা দরকার। মালিকে শ্রমিকে বসে যে সমস্যার সমাধান হয়, তাব জন্যে অযথা যেন সরকারী হস্তক্ষেপ বা ত্রিপক্ষ সম্মেলন না করা হয়।

(৩) শিল্পে বিরোধ দেখা দিলে মালিকে শ্রমিকে সরাসরি যাতে বোঝাপড়া হয় সরকারের সেই চেষ্টা করা উচিত। সরকারী কর্মচারীদের কার্যক্রমও সেইভাবে ঠিক করতে হবে।

(৪) বর্তমানের অযৌক্তিক ব্যবস্থা পাল্টাতে হলে সরকারী সালিশী পদ্ধতি ও আইনদপ্তর ঢেলে সাজতে হবে। সব ব্যাপারে নিজেরা হস্তক্ষেপ না করে দু পক্ষের বোঝাপড়ায় সরকাবী কর্মচারীরা সাহায্য কববেন। তাঁরা নিরপেক্ষ হবেন এবং মানবিক সমস্যাগুলির প্রতি নজর রাখবেন, যাতে তাঁরা ঠিক ঠিক পরামর্শ দিতে পাবেন এবং বিচারের দরকার হলে তাঁদের রায যাতে সঠিক হয়।

(৫) শ্রমিকদের মারধর কবে ভয় দেখানোর জন্যে কিছু কিছু চা-বাগানে, কয়লা-খনিতে বা কারখানায মালিকেরা রীতিমত ভাড়াটে গুণ্ডা পোষে। সে সব জায়গায় সরকাবকে কড়া হতে হবে। সেইসঙ্গে এও দেখতে হবে যে, শ্রমিকপক্ষ যেন রাগের বশে কোনো রকম হিংসাত্মক কাজ করে না বসে। যে ক্ষেত্রে শান্তিভঙ্গের কোনো আশঙ্কা না থাকা সত্ত্বেও মালিকপক্ষ স্বাভাবিক কাজ চালিয়ে যেতে নারাজ, অবিলম্বে সেখানেও সরকারের যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

ফুলগুলি

তরুণ সান্যাল

ফুলগুলি ফুটে ওঠা দেখতে চাই কেমন, কোথায়…
কংক্রিট অ্যাসফল্ট বীম্, ঘটাংঘট ঘচাং মেসিন
সবুজ জাজিমে ঘাসে ইটের পা-তোলা হলদে ছোপ
ক্রেনে কপিকলে অটোমেটিক
ঘড়ির সেকেণ্ড পল অনুপল গুণে নামছে ভয়াল দুরমুস
যান্ত্রিক কোদালে উল্টে অসহায় চাপড়া ঘাস-দুর্বার মেলায়
অথবা ঘেরাও করোগেট লোহালক্করে-বা
এখন কেমন
ফুলগুলি ফোটায় ফোটাতে চায়
তরায়ের ঢালে
বা নাবাল আলে
মাঠে লাঙলের ফালে
কেয়ারী উদ্যান, কিংবা
জনপদ থেকে এক-পা দু-পা হটা বন ?

অথচ সবাই চায় প্রকৃতি ও মানবিক সৃষ্টি দ্বৈতে
সহ অবস্থান
রসায়নে ধাতুতে ঘর্ষণে
ক্রমোপ্রেম প্রজননে
এবং বর্ষণে
বৃষ্টিতে ভূ-দৃশ্য যেন বাথানে জোয়ান গাই
মেঘে হাম্বা ঝড় জলে গাছের বাঁকানো ঘাড়ে ছপাৎ চামর
যেন দণ্ডকলসের মৃদু মদ
কাদা ঘোলা জল শাপলা
কদম্ব কলসী শিউরে তোলা
কিংবা কালচে আউসের
হাওয়ায় ছটফট ফণা কালো জলে, চলচ্ছলাৎ ছলে
কালো মেঘ চিবে যায় বিদ্যুৎরেখায় কটি বক
এই দ্বৈতে সহ অবস্থান ?

একর, হেক্টর ব্যাপী
বহু কিলোমিটার মাইল ?

সকলেরই ফুল চাই খোঁপায় শয্যায় ভাসে
বাসরে বিদায়ে শবে স্তবে
বিবাহেরও ফুল ফোটে।
বিপ্লবেরও ? কেমন আগুন ?
এমন কি ধানও ফুল মধু দুধ ক্ষীর হয়ে ওঠে
সকলেরই ফুল তাই প্রস্তাবনা, স্মারক লিপি ও দাবি
ফুল তাই বেন্টেরও বুলেটে ফ্লুরোসেন্ট।
কোথাও ফুলের চাষে ম্যাগাজিন শূন্যতূণ, আর
কোথাও ফুলের চাষে ট্রাক্টারেও মৌমাছির ক্রতি
বিশাল পাখনার তলে কম্বাইন ইস্পাত ডিজেলে গুনগুন
মধু আনে গোলায় মৌচাকে

পায়ের তলার ঘাসে কী ফুল, কী ফুল তুই…
আহা, সোজা করে দিই ডাঁটা
কী বাগান ভাঙা বাংলা দেশ
তেরো ভাই চম্পা ও পারুলে

স্রোত ঘুরে বহে যায়, এমন দামাল ঘোলা
থান অট্টালিকা কুঠী সরে আসে স্রোতের শিয়রে
জঙ্গল স্থাণুতে এই সহাবস্থানের অবসানে ?
চর হবে পলি হবে
সুরকি হাড়, কোথায় সে পাড়ে
শুধু ওড়ে চতুর্দিকে বীজ সম্ভাবনা জলে
গম্ভীর হাম্বায়

উনিশশো সাতষট্টি বাংলা দেশ॥

বিধুশেখর মন্ত্রী হলেন

সময় রায়চৌধুরী

বিধুশেখর মন্ত্রী হলেন।

খবর শুনে শুধু বন্ধুবান্ধব নয়, প্রথমটা বিধুশেখর নিজেও রীতিমত তাজ্জব হয়ে গেলেন।

হওয়ারই কথা। কেন না বিজ্ঞানী মহলে গজ কিংবা অশ্ব হিসাবে যত নামডাকই থাকুক না কেন, মন্ত্রী হওয়ার কোনো যোগ্যতা ওঁর আছে কিনা এই প্রশ্নটি চিরকালের মত নৃতত্ত্বের অঙ্গীভূত হয়ে রইল।

তবু বিধুশেখর মন্ত্রী হলেন—যেন এই ভবিতব্য।

বিধুশেখর বিজ্ঞানী, বিধুশেখর গবেষক। মেয়েদের মা হওয়া বন্ধ করা যায় কিভাবে, জীবনভোর এই হল বিধুশেখরের বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়বস্তু। এছাড়া আর' কোনো কিছু উনি ভাবেন নি, ভাবতে চান না। এই নিয়ে কত প্রবন্ধ কত থিসিস যে উনি লিখেছেন, তার তুলনা করা যায় একমাত্র রবি ঠাকুরের গান ও কবিতার সঙ্গে। শোনা যায়, এক সেমিনারে জন-বিস্ফোরণের উপর এমন মর্মস্পর্শী বক্তৃতা উনি দেন যে, শ্রোতাদের মধ্যে কেউ কেউ বাড়ি ফিরে গিয়ে নাপিত ডেকে মাথা কামিয়ে ফেলেন।

দেশের বর্তমান অবস্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণ সবাই চায়, বিধুশেখরও চাইতেন। তাতে কারো কিছু বলার ছিল না। কিন্তু কপালে যার মন্ত্রী-তিলক আঁকা, সাধারণ চাওয়া-পাওয়ার গণ্ডি তাকে ধরে রাখবে কি করে।

সব বড বড বিজ্ঞানীর মত বিধুশেখবেরও একটা জীবনদর্শন আছে। সিঁডিভাঙ্গা অঙ্কগুলো দেখতে যত কঠিনই হোক, তাদের উত্তর যেমন এক বা শূন্য বিধুশেখরও তেমনি সিদ্ধান্তে এসেছেন যে খাদ্য সমস্যা, শিল্পের মন্দা, বেকারী, মূল্যবৃদ্ধি, অশিক্ষা, স্বাস্থ্যহীনতা, সামাজিক পশ্চাৎপদতা, এমন কি খরচ, প্লাবন বা ট্রেনদুর্ঘটনার মত ছোট বড় সমস্যার মূলে আছে একটি সরল উত্তর—অবাধ মাতৃত্ব। সুতরাং—

সুতরাং মাতৃত্বকে যেকোনো প্রকারে খর্ব করতে হবে—ওষুধ খাইয়ে, যান্ত্রিকভাবে অথবা পিটুনি ট্যাক্স্ তথা মাইনের সাহায্যে—এই হল বিধুশেখরের বৈজ্ঞানিক দর্শনের প্রতিপাদ্য।

একবার এক বন্ধু ওঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বিধু, তোমার থিয়োরী মেনে নিয়ে আমাদের এই জেনারেশানটা যদি সত্যিই নির্বংশ হয়ে যায়, মানবসমাজের ভবিষ্যৎটা তাহলে কী দাঁডাবে? একটু থতমত খেয়ে বিধুশেখর জবাব দিলেন, দাঁডাও আগে নিজেরা তো বাঁচি, তারপর ভবিষ্যতের কথা ভাবা যাবে। বন্ধুটি ছাঁপোষা মানুষ, বিজ্ঞানী। কিন্তু ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনী নিয়ে সংসাব করেন; বিধুশেখরের উত্তর শুনে মনে মনে 'পাষণ্ড' কথাটি আউড়ে তিনি নিঃশব্দে স্থান ত্যাগ করেন।

বিধুশেখরের যারা মুরুব্বী, যাঁদের টাকায় ওঁব গবেষণা-টবেষণা চলে, যাঁরা টাকার জোরে সেনেট-সিণ্ডিকেট-বিজ্ঞানপরিষদ-কালচারাল মিশন থেকে শুরু করে মন্ত্রিসভা পর্যন্ত অনায়াসে ভাঙেন গডেন, বিধুকে যে তাঁরা কোলের ছেলের মত ভালবাসেন এতে আশ্চর্য হবার কী আছে! ওঁদেরই পরামর্শে বিধু পার্লামেণ্টে একটা বিল আনার চেষ্টা করলেন, ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়স আরো বাডিয়ে দাও। এমনভাবে বাডিয়ে দাও যাতে বিয়ের ইচ্ছেটাই ঝিমিয়ে পডে। বিয়েই যদি না হয তো ছেলেপুলের ঝামেলাও থাকল না! খবর শুনে বিধুশেখরের স্ত্রী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "কী রসিকতা হচ্ছে? দেখছ না, মেয়ের বয়েস বাডছে? বিযে দিতে হবে না?"

বাডিতে ধমক খেযে বিধু এবার চুপিচুপি একটা নতুন থিসিস লিখে ফেললেন—"জাতীয় অগ্রগতিতে ম্যাস স্টেবিলিজেশনের অপরিহার্যতা" নিয়ে। তার মোদ্দা কথা হল, ছেলেমেয়েদের ধরো আর বাঁজা করে দাও। ব্যস্,

তাহলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, দেশটা তুদ্দুড় করে অগ্রগতির পথে ছুটে চলবে।

থিসিসটা ওঁর মুরুব্বীদের খুব মনে ধরল। অতএব মন্ত্রিসভাও লুফে নিলেন প্রস্তাবটা। সবাইকে খুব টাকার লোভ দেখান হল। প্রচারের বন্যা বয়ে গেল—বাঁজা হওয়ার অপারেশন করালেই নগদ ১৫৲ টাকা বখসিস! শুধু প্রচার নয়, পঞ্চান্ন বছর বয়সে বিধুশেখর নিজেই নার্সিং হোমে গিয়ে অপারেশন করিয়ে নিলেন এবং বখসিসের ১৫৲ টাকা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করে দিলেন। ওপরওলার ছেলেমেয়েরাও কেউ কেউ লুফে নিল এই সুযোগ। বাপ-মা হওয়ার দায়দায়িত্ব থাকল না; সবাই ঝাড়া-হাত-পা; অথচ ভোগের পথে আর কোনো বাধাও রইল না। জাতীয় পুনর্গঠনের এক নম্বর কর্মসূচী হল মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব হরণ। অনেক টাকা খরচা হল তার জন্যে—কোটি কোটি, শত কোটি টাকা। এবং জাতীয় অগ্রগতির সেই ত্রিকোণ লাল নিশানটি সেঁটে দেওয়া হল স্কুল-কলেজে অফিসে-কারখানায় খেতে-খামারে রাস্তাঘাটে হাসপাতালে খেলার মাঠে সিনেমা-থিয়েটারে, সর্বত্র। বিধুশেখর অনেক বাহবা পেলেন, অনেক খ্যাতি।

সবই হল, তবু বিধুশেখরের বৈজ্ঞানিক গবেষণার অতৃপ্ত আত্মা কিছুতেই শান্তি পায় না। স্বস্তি পায় না বিধুর মুরুব্বীরা। তার কারণও ছিল।

প্রাকৃতিক ও জৈবিক নিয়ম-কানুন পাল্টে দেওয়ার জন্যে বিধুশেখর যত তত্ত্বকথাই আওড়ান না কেন, দেশের বেশির ভাগ মানুষ কিন্তু ওঁর কথায় খুব কান দিচ্ছে বলে মনে হল না। ওরা সেই আগের মতই বিয়েশাদি করে, বাপ-মা হয়, যতক্ষণ পারে বাঁচবার চেষ্টা করে, না পারলে হৈচৈ করে।

ফলে বিধুর পেট্রনরা খুব নার্ভাস হয়ে পড়লেন। বিজ্ঞান যদি লোহার সিন্দুককে সোনা দিয়ে ভরে দিতেই না পারল, তবে গবেষণার জন্যে টাকা খরচা করে লাভ কী? মোটা মাসোহারায় বিজ্ঞানী পুষেই বা ফয়দা কী?

দেখেশুনে বিধুশেখর মরীয়া হয়ে উঠলেন। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। এবার এস্‌পার কি ওস্‌পার। দাঁত কিড়মিড় করে উঠল ওঁর, মুঠি শক্ত হল, চুল খাড়া হয়ে উঠল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে থাকল। তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সযত্নপোষিত এতদিনকার বৈজ্ঞানিক

আবরণ, দূর করে দিলেন গবেষকের যত কিছু আভরণ। লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে টান মেরে ছিঁড়ে ফেললেন মানবিক অন্তর্বাস। তারপব হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন আদিম নরখাদকের আদিমতম প্রবৃত্তিতে। এবার আর থিসিস নয়, যুক্তিতর্ক নয়, বিধুশেখর শ্লোগান দিলেন—গর্ভনাশ চাই, জাতীয় অগ্রগতির জন্যে ভ্রূণহত্যা চাই।

বিধুর মুরুব্বীবা মনে মনে এইটাই চাইছিল, মুখ ফুটে বলতে সাহস হচ্ছিল না। জনসংখ্যা কমাতে না পারলে সঞ্চযের পিপাসা মেটে না; মারী ও মড়কে যথেষ্ট সুবিধা হচ্ছে না, যুদ্ধ ও গণহত্যার অনিশ্চিত পথে পা বাড়াতেও ভয় হয়। সেই তুলনায় গর্ভনাশ ও ভ্রূণহত্যার প্রস্তাবটা অনেক রোমান্টিক, অনেক নিরাপদ। বিধুর থিসিসে তাদের আশা পূরণ হয় নি, বিধুর হুঙ্কাবে তারা ভরসা পেল।

তাই পদ্মভূষণ নয, অশোকচক্র নয়, বিজ্ঞানীর কাষ্ঠাসন থেকে তুলে এনে বিধুকে ওরা বসিয়ে দিল মখমলে মোড়া মন্ত্রীর গদিতে।

বিধুশেখর মন্ত্রী হলেন।

হাতে-কলমে

লেখা পাঠান

লেখা পেলেই 'পবিচযে' নতুন একটি বিভাগ খোলা হবে। নাম: হাতে-কলমে। কারখানায়, বাগিচায়, খনিতে, পরিবহনে, আপিস-কাছারিতে, দোকানে, খেতে খামারে যাঁরা মেহনত করেন—তাঁদের কাছ থেকে লেখা চাই। চিঠির আকারেই হোক কিংবা গল্প কবিতার আকারেই হোক, নিজেদের জীবনের কথা মুখ ফুটে বলুন। ভাসা-ভাসা ভাব, বানানো বানানো কথার বদলে চাই নিজের দেখাশোনা, নিজের প্রাণের কথা। নিজে লিখুন, অন্যদের লিখতে বলুন। সঙ্গে সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দেবেন। সম্পাদক, পরিচয়

খড়্গ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঝল্‌সে উঠুক তীব্র আলোর হীরা
তোর ভয়ঙ্করের ক্রোধ,
যেন অমানিশায় আগুন হাতে মন্ত্রপাঠ।

ক্লীবের শোণিত অন্ধকারে জ্বলতে থাকে ;
মহাদেবের বুকের ওপর
শক্তি, রাখিস পা। পরিশুদ্ধ মানবতা
প্রতিপদের ভোর হেসেছে কোথায় যেন, যমুনা দেয়
যম-কে ফোঁটা ;

রক্ত না-কি চন্দন, তোর খড়্গ বলে॥

কি হয়

বিপ্লব মাজী

তারা তিন বুড়ো
তিনটে চেয়ার ফেলে,
গল্পে গল্পে সারা বিকেলটা
মাত করল

গিন্নীর গলা শোনা গেল :
দেখলে দেখলে
ধিঙ্গী মেয়ের কাণ্ডটা দেখলে,—
ছেলেটার হাত ধরে
অন্ধকার গলিতে ঢুকল
কি হয় এরপর
কে জানে

তিন বুড়ো ততক্ষণে উসখুস,
মাথার চুল ছিঁড়ছে,
পা ঠুকছে ॥

....পোকা

আশুতোষ সরকার

বৎসহারা গাভী বলার চেয়ে বাচ্চাহারা কুত্তী বলাই ভালো। তেমনি হিংস্র অস্থিরতায় সারাটা বস্তি শুঁকে বেড়ালো নিমাইর মা, কিন্তু নিমাইর কোন পাত্তা পাওয়া গেল না।

শেতলাতলার পাশ দিয়ে ঢুকে গেঁদির মা'র চাতাল ডিঙিয়ে রাজকুমারের গাইবাছুরগুলো দেড়হাতি গলিটাকে যেখানটায় ক্ষীর বানিয়ে রেখেছে, তার মধ্যে পা ডুবিয়ে হরিশংকরের দোকানে গিয়ে দু-দুবার ঢুঁ মেরে ফিরে এল। তৃতীয়বারে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেই হরিশংকর লম্বা ডাণ্ডাওলা ছাকনিটা চা তৈরির উঁচু মাচানের কোণে সজোরে ঠুকে দিয়ে বলল, ও হারামজাদাদের কথা আমাকে আর জিজ্ঞেস করতে এসো না। নবাবের বাচ্চাকে আর যদি দোকানে ঢুকতে দিয়েছি তো আমার এক বাপের জন্ম নয়।

জবাব শুনে নিমাইর মা ক্ষিধে এবং রোদে ধনুর মত বেঁকে পড়া মেরুদণ্ড সোজা করবার চেষ্টায় দু'হাতে কোমর চেপে ধরল। হিংস্র দু'টি পাশব চোখ হরিশংকরের মুখের ওপর বিঁধিয়ে দিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, তোর জন্ম ক'বাপের দৌলতে সে হিসেব গোটা টালিগঞ্জের মানুষ জানে। গলা বাড়িয়ে আর তোকে শোনাতে হবে না রে বারোভাতারী সতী মায়ের ব্যাটা।

—মুখ সাম্‌লে। মুখ সাম্‌লে কথা কয়ো।

—ক্যানো? ন্যায্য কথা কইব তো মুখ সামলাব কার ভয়ে? চা-বিড়ির

দোকান দিয়ে বসেছে বলে কি পাঁচু মিস্তিরির ব্যাটা লাট হয়ে গেছে ? তবু যদি দোকানের টাকা কোথা থেকে এসেছে না জানতুম তো কথা ছিল।

—শুনছ ? শুনছ মাগীর কথাবাত্রা। হরিশংকর আর একা পেরে উঠবে না আন্দাজ করেই দেকানের খদ্দের এবং বিড়ি বাঁধার কারিগর তারককে সাক্ষী মেনে বসল। কিন্তু নিমাইর মা একাই একশো। বলল, শুনেছো। শুনবে না ক্যানো ? আমার পেটের ছেলে নিমাই—আর আমারই মুখের ওপব তুই যে তাকে হারামজাদা বললি—লবাবেব বাচ্চা বললি—সে সব কি তোমরা দশজন শুনতে পাও নি গো ?

সাক্ষীরা চুপ। কোন পক্ষেই মুখ খুলতে যে তারা যাবে না, হরিশংকরও জানে—নিমাইর মাও জানে। তবে হরিশংকর নরম হোল একটু। বলল, বলবো না ? তুমিই বিবেচনা করে দেখ। আজ একটা হপ্তা ধরে ওই রকম কাণ্ড করছে নিমাই। দিনে রাতে দু' ঘণ্টা সময়ও দোকানে এসে বসে না। যদি বা এসে বসলো তো দুটো পাতা কেটে না কেটেই হাওয়া। ঘুরে ফিরে এসে দু' বাণ্ডিল বিড়ি যদি বাঁধলো তো অমনিই হযে গেল তার। খদ্দেব এসে ফিরে যায, বিড়ি দিতে পারি না। শেষে গিয়ে খুঁজে পেতে তাব্‌কাকে ধরে আনলুম। তুমিই বল, ওই করে কারবার চলে কখনো ?

—আব আমারই বুঝি পেটটা খুব চলছে ? এইবাবে নিমাইর মা'র গলাও একটু অন্যরকম হোল। বলল, দু' হপ্তা ধরে শূযাব একটি পয়সা ছোঁয়ালো না ঘরে। অথচ দু' বেলা পিণ্ডিটি আছে বাঁধা। কোথা থেকে জোগাবো ? মাস গেলে দশ টাকা ঘর-ভাড়া আমি কোথা থেকে জোটাবো ?

—তাব জবাব আমি দেব কী ? যেমন সোনারচাঁদ ছেলে তুমি বানিয়েছ !

হরিশংকরের কথাটা শেষ হতে না হতেই নিমাইর মা আবার নিজের মূর্তি ধরল। বলল, বেচাল কথা মুখ দিয়ে বার করিসনে হরে। আমি বানিযেছি ? ভালোর জন্যে তোর দোকানে দিলুম, আর তুই কিনা সাইকেল চুরি করতে নিয়ে গিয়ে ঠ্যাংটা খোঁড়া করিয়ে আনলি। দুধের ছাওয়ালকে মাগীর ঘর চেনালি। কল্কে টানতে শেখালি।

—যা-তা কথা কয়ো না মাসি। শেষে কিন্তু অন্য রকম ঘটে যাবে। রীতিমত রুখে উঠল হরিশংকর। কিন্তু তার তড়্‌পানিতে ভড়্‌কে যাবাব মেয়ে

নিমাইর মা নয়। জবাব দিল, আর কী ঘটাবি? পীরিতের বন্ধু সেজে খেয়েছিসই তো কচি ছোঁড়ার মাথাটা।

—শুনছ? শুনছ তোমরা কথাগুলো? সাক্ষীদের লক্ষ্য করে হরিশংকর বলল, যে রাত্তিরে সাইকেল চুরি করতে গিয়ে ইটের পাঁজা চাপা পড়ে পা খোয়ালো নিমাই, আমি তখন ভাঁটিখানার বাজারে যাত্রা দেখছি বসে।

—হ্যাঁ, নিমাইর মা জবাব দিল, তাড়া খেয়ে পালিয়ে গিয়ে যাত্রার আসরে ঢুকতে ও রকম সব মবদই পারে।

হরিশংকর এ অভিযোগ গ্রাহ্য করল না। সাক্ষীদের লক্ষ্য করেই বলে গেল, মাগীর কথা আমাকে শোনাও কেন? বাইশ বছুরে ছোঁড়া কি তোমার কচি বাছুরটি আছে যে মাগীর মজা জানবে না? আর কল্কে টানা তোমার ছেলেকে আমি শেখাবো কী? তিব্‌নাথ গোঁসাই হয়েই তো তোমার পেট থেকে নেমেছে।

—মুখ সাম্‌লে, মুখ সাম্‌লে হরে। খিস্তি খেউড় করবি তো শেষে কিন্তু সাত ঘাটে তোর গুষ্টির ষষ্ঠী পূজো করবো।

নিমাইর মা এতোক্ষণ ও কর্মটি বাকি রেখেছে জানতে পেরে সম্ভবত কৃতজ্ঞতা বশেই হরিশংকর নরম হোল। বলল, থাক্ মাসি। ওসব নোংরা কথার মারপ্যাঁচ বাড়িয়ে দরকার কী? নিমাই সেই সকালে এসে দুটো পাতা কেটে রেখেই যে বেরিয়েছে, আর এমুখো হয় নি। তুমি এখন বাড়ি ঘরে যাও।

হরিশংকর আত্মসমর্পণ করায় নিমাইর মাও শান্ত হোল। হাত বাড়িয়ে বলল, একটা টাকা দে তো হরে। নিমাইর পাওনা থেকে কেটে নিবি।

—পাওনা। সঙ্গে সঙ্গে দুই চোখ কপালে তুলল হরিশংকর। নিমাইর আবার পাওনা বলছ কী। একখানা বিড়িতেও সুতো না জড়িয়েই আটগণ্ডা পয়সা তখন চেয়ে নিয়ে গেল। হিসেব করলে উল্টে আরো টাকা চারেক আমারই পাওনা হয়ে গেছে।

—হয়েছে তো হয়েছে। কেউ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। ও তুই শোধ করে নিবি।

—না মাসি। হরিশংকর মাথা নাড়ল। দেনা আর বাড়াতে আমি পারবো না। তাছাড়া তোমার হাতে পয়সা দিতে নিমাই বারণ করেছে।

—কী বললি। কথাটা কানে যেতেই নিমাইর মার চেহারা পাল্টে গেল। জিজ্ঞেস করল, আমার হাতে পয়সা দিতে নিমাই বারণ করেছে?

—করেছে কি না করেছে তাবৃকাকে শুধোও। তাবৃকাও সুমুখেই ছিল। সিদিনে তুমি ছ'গণ্ডা পয়সা চেয়ে নিয়ে গেলে, শুনেই নিমাই বলেছে তুমি নাকি পয়সা নিয়ে গিয়ে কেবল পান আর দোক্তা খেয়ে ওড়াও। এ সব চলবে না।

—নিমাই তাই বলল? নিমাইর মা বিশ্বাস করতে পারছে না। কী করে পারবে? সে কি তার নিজের পেটের জন্যে এক পয়সা চাইতে আসে হরিশংকরের কাছে? নিজের পেটের ভাবনাটা কী তার? ঠিকের বদলে যে কোনো বাড়িতে একটা বাঁধা কাজ ধরে নিলেই তো তার শোয়া-খাওয়ার ভাবনা ঘুচে যায়। রাসবাড়ির মাখনবাবু তো সাধাসাধি করছেন। পনেরো টাকা মাইনে—খাবে দাবে সিঁড়ির নিচে শুয়ে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে।

কিন্তু তুই নির্বংশে কে পেটে ধরেছিল বলেই না এমন নিজ্ঝামেলার কাজটাও সে নিতে পারছে না। ছাড়তে পারছে না রতনের খুপড়িখানার দশটা করে টাকা ভাড়া মিটানোর দায়। একে তো তুই চোর। চুরি করলি কি না করলি সে তো কেউ দেখবে না। চোখের ওপর দেখতেই পাচ্ছে খোঁড়া পাটা। তার ওপর কে, পি, রায় লেনের মোড়ে বেশ্যাবাড়ির মুখে বসে মারিস আড্ডা। টানিস গ্যাঁজা। জেনে শুনে তোর মত গুণধর রত্নকে কে কার বাড়ির মধ্যে একখানা ঘর দেবে থাকতে? এমন যে পেয়ারের মানুষ হরিশংকর, সে পর্যন্ত তোকে দোকানের ওধারে অন্দরের দিকে ঘেঁষতে দেয় না। তার শালীর সঙ্গে গুজুর গুজুর করতে গিয়েছিলিস বলে।

তুই যাতে সেবারের মতো শেতলাতলার চাতালে শুয়ে ফের নিউমোনিয়া না বাধাস, সেই জন্যেই তো রতনের হাতে পায়ে ধরে দশ টাকা ভাড়ায় ওই চামচিকের খুপড়িটা নিতে হোল তোর মাকে। তুই যাতে উপোস করে না মরিস, সেই জন্যেই তো তিন বাড়ির ঠিকে কাজ পড়ি-মরি করে সেরে দিয়ে তোর মাকে ছুটে আসতে হয়। খাবি কী? বিড়ি বেঁধে যা কামাই করিস, তা দিয়ে তো খেয়ে যে মরবি তেমন আপিংটুকুও জোটে না।

নিতান্তই যেদিন জোগাড় করতে পারে না—সাধ্যমতো চেয়ে-চিন্তেও পারে না যেদিন তোরই এক পেটের শাক-ভাতটুকুরও ব্যবস্থা করতে, তখনই না নিরুপায় হয়ে আসে। এসে হরিশংকরের কাছে হাত পেতে দাঁড়ায়। আর

সেই স্থলে তুই কিনা বলেছিস, তোর মা পান দোক্তা খেয়ে উড়িয়ে দেয় পয়সা !

—হা পুত্তুর। হা পুত্তুর ॥ দুই হাতে কপাল চাপড়ে শকুনের মত তীক্ষ্ণ গলায় অভিশাপ দেয় নিমাইর মা, ক্ষয় হবি—তুই ক্ষয় হয়ে যাবি। এই পেটে যদি ধরে থাকি আমি—বুকের রক্ত মুখে তুলে দিয়ে থাকি যদি—আর পরিণামে এমন অপদুর্নাম তুই যদি করে থাকিস আমাকে তো ক্ষয় হয়ে যাবি—ক্ষয় হয়ে যাবি—ক্ষয় হয়ে যাবি।

দুহাতে বুক চাপড়ায় আর অভিশাপ দেয় নিমাইর মা।

সে এক তামাশা। নিমাইর মা'র তামাশা দেখতে গোটা বস্তি হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল। তারা হাসছে—তালি দিচ্ছে—শিস্ দিয়ে দু'পাক নেচেও নিল কেউ কেউ। এমন তামাশা নিমাইর মা ছাড়া আর যেন কেউ দেখাতেই পারে না।

কিন্তু নিমাইর মা আর হরিশংকরের ঝাঁপের তলায় থাকল না দাঁড়িয়ে। বুক-কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে লাফিয়ে পড়ল গলিতে। পিছনে হাপুত্তুর—হাপুত্তুর বলে রসিকতা করতে করতে একপাল ছেলে-ছোকরাও ছুটল। পাগলের পিছনে ছুটে-ছুটে যে রকম মজা পায়।

—ও সানুর মা। তোমাদের বাড়ি নিমাই এসেছিল ? আমার নিমাই ?

—না তো মাসি। দেখিনি।

—প্যাঁচার বাপ দেখেছ আমার নিমাইকে ?

—সকালে তো দেখে এলাম দোকানে।

—এখন তো আর বাড়ি খুঁজেও পাচ্ছি না। বল তো আমি কী করি ?

বেলা বাজল দুটো—স্নান নেই—খাওয়া নেই—নিমাইর মা ঘুরছে। কাক ডাকার আগেই উঠতে হয় তাকে। নিমাই তখন খোঁড়া পায়ের ওপর ভালো পা-টা লম্বা করে দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। সেই ভোরে উঠে রায় বাড়ি—সেখান থেকে চারু এভিনিউ—তারপর শান্তিপল্লী। তিন বাড়ির উনুনে আঁচ দেয়া থেকে বাসন মাজা, বাটনা বাটা—মুদীর দোকান, হাটবাজার—

হাটবাজারটা করতে পারলে অবশ্যি একটু সুবিধেও হয়। নগদ দু' চার গণ্ডা পয়সা নিজের মুঠোয় থাকে। কিন্তু আজ আর সে সুযোগও নিমাইর মার কপালে জোটে নি। রায়বাড়ির মেয়ে-জামাই আসছে বলে ঘরের কাজই এতো

বেড়ে গেল যে সারতে সারতে চারু এভিনিউ-এর বাজারের সময়টাও ধরা গেল না। গিন্নীর মুখ ঝামটা খেয়ে শান্তিপল্লী গিয়ে দেখে বাবুর মেজো ছেলে গোঁয়ারটা লাফালাফি করতে গিয়ে হাত মচকে এসেছে। তাকে নিয়ে ছুটতে হোল ডাক্তারখানায়। বেলা বাজল বারোটা।

এদিকে আবার পেটের শত্তুরের জ্বালা। বাড়ি এসে সময়মতো ভাত কটা রেঁধে না রাখলে তো উপায় রাখবে না নিমাই। ঘর-বাড়ি মাথায় তুলে নাচাবে।

আর না রাখলে খাবেই বা কী ছেলেটা! কাল রাতেও খাওয়া হয় নি। চাল-ডাল জোটাতে না পেরে দোকান থেকে বাকিতে একটা রুটি এনেছিল। আর দু পয়সার বাতাসা। রাগমাগ করে ওই খেয়েই এক ঘটি জল ঢেলে পেটের জ্বালা ঠাণ্ডা করেছিল নিমাই।

—তুই খাবি না? জিজ্ঞেস করেছিল মাকে। 'খাবো আমার গুষ্টির পিণ্ডি' কথাটা বলতে গিয়েও বলে নি নিমাইর মা। বলেছিল, আমি বাবুর বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি। তুই খা।

আর সেই নিমাই কোথায় তুই সময় মত চাল-ডালের ব্যবস্থা করে ঘরে ফিরবি—তা তো নয়ই, উল্টে আরো বলে গেছিস মাকে আর পয়সা কড়ি দিও না। পান-দোক্তা খেয়ে মা তার উড়িয়ে দেয় পয়সা। হা পুত্তুর।

অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে ক্ষিদে এবং রোদের জ্বালাকেও ছাপিয়ে পেটের ছেলের দেয়া বদনামের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে বেলা দু'টোয় নিমাইর মা ঘরে ফিরে এলো।

—কি গো মাসি, পেলে তোমার নিমাইকে? পাশের ঘরে তিনুর বৌ জিজ্ঞেস করতেই বারান্দায় তোলা পা উঠোনে নামিয়ে তেমনি তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল নিমাইর মা, কোথায় পাবো? ওলাওঠোয় টেনে নিয়ে চলে গেছে না? মা শেতলা নিব্বংশেকে খেয়েছে না চিবিয়ে? গঙ্গার গর্ভে সেঁধিয়েছে না হারামজাদ? ইহজম্মে আর এমুখো হবে না।

জবাব শুনে তিনুর বৌ মুখে আঁচল দিয়ে হাসল। তারপরই চকিতে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে ইসারায় দেখিয়ে দিল রতনের ঘরটা। ফিসফিসিয়ে বলল, সেই যে সকালে এক ঠোঙা জিলিপি নিয়ে ঢুকল, আর তো বেরুতে দেখি নি।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে রতনের ঘর থেকে বেরিয়ে এল নিমাই চাঁদ।

দেখে নিমাইর মা আর স্থির থাকতে পারল না। ঠোঁট দুটোকে উপরে নিচে ঠেলে দিয়ে দাঁত খেঁকিয়ে ওঠল, বেরুলি ক্যানো? বেরুলি ক্যানোরে লোচ্চার ব্যাটা লোচ্চা? দোর দিয়ে থাকতিস আরো পড়ে। শুয়ে শুয়ে খাওয়াতিস আরো জিলিপি।

—চুপ থাক। ধমকে উঠল নিমাই। সঙ্গে সঙ্গে নিমাইর মা দ্বিগুণ জ্বলে তিনগুণ গলা চড়িয়ে শুরু করল, চুপ থাকব তোর বুকের রক্ত খাবে যেদিন ছেনালরা। উনুনমুখী সব্বনাশীরা যেদিন জিলিপির সঙ্গে তোর কোল্‌জে ভেজে খাবে।

বলতে না বলতেই এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উঠোনে পড়ল বাড়িওলা রতনের বৌ সোহাগিনী স্বয়ং। হাঁক দিয়ে বলল, খবদ্দার। খবদ্দার বলে রাখছি। নিজের ছেলের সঙ্গে আর মানুষকে জড়ালে কিন্তুক বিপদ ঘটে যাবে।

—তুই আমার কী বিপদ ঘটাবি লো মাগি? পরের ছেলেকে ঘরে নিয়ে দোর দিয়ে রাখিস—

—মাকে তোমার সাবধান কর নিমাই ঠাকুরপো।

—থামলি মা?

—দ্যাখ গো, দেখ তোমরা। পীরিতের মেয়েমানুষের কথায় লোচ্চা আবার লাফায় কেমন দ্যাখ।

—তবে রে। অসহ্য রাগে নিমাই বারান্দা থেকে পিঁড়িটা টেনে নিয়ে মাথার ওপর তুলল। আজ তোকে আমি খুনই করে ফেলব।

সঙ্গে সঙ্গে নিমাইর মা লুটিয়ে পড়ল উঠোনে। আশপাশ কাঁপিয়ে শুরু করল চিৎকার, মেরে ফেলেছে গো মেরে ফেলেছে। পেটের ছাওয়াল হয়ে মাগীর যুক্তিতে মেরে ফেলেছে আমাকে।

সে চিৎকারের মুখে রীতিমত ভড়্‌কে গেল নিমাই। এমন কি মাথার ওপর পিঁড়িটা যে তুলে ছিল, সেটা পর্যন্ত নামিয়ে রাখতে ভুলে গেল সে। ততক্ষণে গোটা বস্তির ষোল আনা মানুষই আবার হুড়মুড়িয়ে এসে ঢুকে পড়েছে রতনের উঠোনে। এমন কি বস্তির গার্জেন—এককালের নামকরা গুণ্ডা ব্রজ ঠাকুর পর্যন্ত।

নিমাইর মা মাটিতে পড়ে গড়াচ্ছে—আর নিমাই মাথার ওপর পিঁড়ি তুলে দাঁড়িয়ে—দৃশ্য দেখেই চমকে গেল ব্রজ ঠাকুর। ঝাঁপিয়ে পড়ে নিমাইকে এসে ধরল। খুন করলি নাকি রে, এঁ্যা?

রতনলালের দু বছর আগে বিয়ে করা বৌ সোহাগিনী অমনি কোমর দোলাতে দোলাতে এগিয়ে এল। পান খেয়ে লাল করা মুখের টস্‌টসে ঠোঁট-দুখানি নানান কায়দায় এঁকিয়ে বেঁকিয়ে জবাব দিল, ত্যাখ—ত্যাখ। ত্যাকীর ঢং ত্যাখ তোমরা। নিমাই ঠাকুরপো আমার ঘরের মেঝেয় ঠাণ্ডায় শুয়ে ঘুমিয়ে ছিল, তাইতে ছি রাধিকের মানের ঘটাখানা একবার ত্যাখ।

পিঁড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিল নিমাই। কটমটিয়ে একবার সোহাগিনীর মুখে এবং একবার মাটিতে গড়াতে থাকা মা'র দিকে তাকিয়ে খোঁড়া পায়ে হনহনিয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। নিমাইর মাও 'হা পুত্তুর হা পুত্তুর' বলে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে জড়ো হওয়া সব গুলো মানুষকে অবাক করে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

—পেটের ছেলে হয়ে এই করলি? আজ তবে সত্য সত্য তোকে মড়া মুখ দেখাব, তবে ছাড়ব। হে মা গঙ্গা, আমাকে নাও! হে মা গঙ্গা—

আলুথালু মাটিমাখা নিমাইর মা পাগলের মত টালির নালার দিকে ছুটল। ছুটতে ছুটতে গিয়ে নেমে পড়ল আদিগঙ্গার হাঁটুজলের মধ্যে। কাদাকাদা এক হাঁটু জলের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে মাথাটা ডোবায় আর তোলে—ডোবায় আর তোলে। আর ফাঁকে ফাঁকে বলে, হে মা গঙ্গা, আমাকে নাও। হে মা গঙ্গা—

ব্রজ ঠাকুর নেমে গিয়ে টেনে তুলল নিমাইর মাকে। এবং ধরে এনে পৌঁছে দিল ঘরে। উঠোনে দাঁড়িয়ে রতনের বৌ সোহাগিনী তখনো রতন কারখানা থেকে ফিরলে আজ যা কাণ্ড ঘটাবে, তারই কাল্পনিক ব্যাখ্যায় আশপাশ গরম করে চলেছে।

কিন্তু ব্রজ ঠাকুর ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে নিমাইর মা আর উচ্চবাচ্য করল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাপড়-চোপড় পাল্টে দিব্যি শান্তশিষ্ট মানুষটি ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

যখন ফিরল তখন যথেষ্ট রাত হওয়া সত্ত্বেও বাড়ির মধ্যে আট ঘরের দরজায় দরজায় সবগুলো মানুষকে বসে থাকতে দেখেই নিমাইর মা আন্দাজ

করল আরো কিছু ঘটেছে বা ঘটবে। কিন্তু সেদিকে সে ভ্রূক্ষেপও না করে নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

রতন এসে নিমাইর মার দরজার সামনে দাঁড়াল। বলল, ব্যাপার কী মাসি? আমার বৌ-এর নামে তুমি কী সব যা-তা কথাবার্ত্তা বলেছ?

কিন্তু ঘরের মধ্যে নিমাইর মা'র কোন সাড়াশব্দই নেই। রতন আরো জ্বলে গেল তাতে। হুঙ্কার ছেড়ে বলল, ভেবেছটা কী? আমার বৌ ব্যাটাছেলের বৌ নয়? বলে সোহাগিনী যে যথার্থই ব্যাটাছেলের বৌ যেন তাই প্রমাণ করতে উঠোনের বুকে ঘোড়ার মত লাথি ঠুকে দিল। তাতেও নিমাইর মা নীরব দেখে হাঁকল, চুপচাপ থাকলে চলবে না। এ তোমাদের মা-ব্যাটার ব্যাপার নয়। পরের ঘরের সতী নারীর ইজ্জত বলে কথা। তুমি যদি পুরুষছেলে হোতে তো এতোক্ষণে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিতুম উঠোনে।

—মেয়েছেলে বলেই সেরে যাবে নাকি? লাফিয়ে এসে সোহাগিনীও স্বামীর পাশে দাঁড়াল। বলল, নিয়ে এসো না চুলটা ধরে নামিয়ে। জিভটা টেনে পেটের মধ্যি থেকে বার করে আনছি।

—তুই থাম। যা করবার আমিই তো করছি। বৌকে থামিয়ে দিয়ে রতন হঠাৎ সুর পাল্টাল। বলল, যাক্ মাসি। যা করেছো তো করেছোই। মা'র বয়সী, তোমার অপমান আমি করবো না। তবে রাত পোহালে যদি আমার ঘর খালি করে না দিচ্ছ তো মা-ব্যাটা দুই বদমায়েসেরই গলা কেটে আমি আদি গঙ্গায় নামাবো তবে ছাড়বো। শেষের দিকে গলাটা অসম্ভব চড়িয়ে রতন তিন লাফে নিজের ঘরে ঢুকে গিয়ে খিল এঁটে দিল।

কিন্তু নিমাইর মার ঘরের মধ্যে নিমাইর মা তখন একেবারেই নীরব। পেটের কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে করে লুকিয়ে আনা খাবারগুলো এনামেলের থালাটায় যে রাখছে, তার পর্যন্ত শব্দ নেই কোনো। তারপর চুপিচুপি বাইরে গিয়ে কুড়িয়ে আনল সেই পিঁড়িটা—দুপুরে রাগের মাথায় নিমাই যেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল।

পিঁড়ির সামনে খাবার গুছিয়ে বসে রইল নিমাইর মা।

সত্যিই তার অপরাধ হয়ে গেছে। মাথাটা ঠাণ্ডা হোতেই বুঝতে পেরেছে নিমাইর মা। এভাবে দশজনকে শুনিয়ে সোহাগিনীকে গালমন্দ করাটা তার পক্ষে উচিত কাজ হয় নি। একে তো পেটের ছেলে নিমাই। দোষ-ত্রুটি

যাই করুক, নিন্দে হলে দশজন তো তাকেই ডেকে বলবে, কী গো নিমাইর মা, তোমাব ছেলের এসব কী শুনি? তার ওপর রতন বাড়িওলা মানুষ। তার মান্যি বলে কথা আছে একটা। আর এতো নতুন ব্যাপার নয়। নিমাইকে বরাবরই খাতির করে সোহাগিনী। আড়ালে-আবডালে সোহাগিনী নিমাইব সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে—গোটা বস্তির সকল মানুষই জানে। সেই জায়গায় একদিন যদি ঠাট্টা করে বলেই থাকে সোহাগিনী, ঠাকুরপো ক'টা গবম গরম জিলিপি আন তো খাই, নিমাই কি না এনে পারে? তারও তো কর্তব্য বলে কথা আছে একটা। তারপর খালি-ঘর পেয়ে যদি সোহাগিনীর ঠাণ্ডা মেঝেয় শুয়েই থাকে একটু, তার জন্যে চেঁচামেচি করাটা কি আর মায়ের কাজ হোল? তাছাড়া নিমাইর আর কতটুকু! পুরুষমানুষ। সোনার অঙ্গে কাদা ছিটোলেও সোনা কখনো ময়লা হয়ে যায় না। কিন্তু সোহাগিনীর পক্ষে কলঙ্কের কথা বৈকি। আর স্ত্রীলোকের কলঙ্ক—সে তো আদিগঙ্গার কাদা। লাগলে আর উঠতে চায় না কিছুতে।

পিঁড়ির সামনে সাজানো খাবার নিয়ে বসে থাকতে থাকতে রক্তশোষক মশাটাকে মারতে গিয়ে নিমাইর মার নজরে পড়ল দুপুরে যে গায়-পায় লেগেছিল কাদাগুলো, এতবার ধোবার পরেও এখনো তার চিহ্ন গেল না। বসে বসে খুঁটতে লাগল নিমাইর মা। কেরোসিনের কুপির শীষে ফুলের পর ফুল ফোটে। নিমাইর মা আঙুলের ডগায় টোকা দিয়ে দিয়ে ভাঙে। তবু নিমাই ফিরবার নাম করে না।

বসে বসে নিমাইব মা ঝিমোতে লাগল। অবশেষে রাত বাবোটায় নিমাই যখন দরজা ঠেলে ঘরে এসে ঢুকল, সেই শব্দে ভাঙল তার ঝিমোনি। ছেলের হাত ধরে টেনে এনে নিমাইর মা বসিয়ে দিল পেটের কাপড়ের ভাঁজে করে লুকিয়ে আনা খাবারের থালাব সামনে।

—তুই খাবি না?

—আমি খেয়েছি বাপ। মাখনবাবুর বাড়িতে মেয়ে-জামাই এসেছিল, খাওযা-দাওয়ার ঘটা হোল খুব। আমাকেও না খাইযে ছাড়লে না। আবার এতগুলো দিয়েও দিলে সঙ্গে।

কিন্তু ছেলেকে বাড়িতে উপোসী ফেলে রেখে গিয়ে নিমাইর মা সত্যিই

খেতে পেরেছিল কিনা, কিংবা এতগুলো ভালো ভালো খাবার সত্যি সত্যি, মাখনবাবুব পরিবারই আঁচলে বেঁধে দিযেছিল কিনা, সে সব কিছুই জিজ্ঞেস করতে গেল না নিমাই। বলল, কিন্তু এত সব আমি খেতে পারব নাকি ?

—যা পারিস তুই খা না। বাকি কথাটা মনে মনে বলল নিমাইর মা। মুখ ফুটে প্রকাশ করল না যে নিমাই যা ফেলে রেখে যাবে, নষ্ট হবে না কিছুই। তার পেটে দুদিনের ক্ষিধে।

খোঁড়া ঠ্যাঙের ওপর দিয়ে ভালো ঠ্যাঙটা লম্বা করে মেলে দিয়ে নিমাইচাঁদ খেতে লাগল। পাশে বসে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল নিমাইর মা। পেটের খাদ্য উগরে দিয়ে কুন্তী যেমন বাচ্চার খাওযা দেখে।

ডান হাতে ঠাণ্ডা লুচি ছিঁড়তে ছিঁড়তে বাঁ হাতে জামার পকেট থেকে একটা মোড়ক বার করল নিমাই। মা-র দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, লালার দোকানে ভালো দোক্তা এসেছে দেখে ক'টা পাতা কিনে রেখেছিলুম। পানটা আমি নিজের হাতে সাজিযেছি দেখিস কি হাইকেলাস জর্দা।

মোড়কটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে নিমাইর মা হাসল। পাকা কই মাছের ইযা বড়ো টুকরোটা ভাঙতে ভাঙতে নিমাইচাঁদের চোখে মুখেও উপচে উঠল খুশি।

—চাটনিটা বেড়ে রেঁধেছে তো। তুই বেঁধেছিস ?

—আবার কে ? ছেলের মুখের দিকে চেয়ে একটা মিছে কথাই বলে ফেলল নিমাইর মা।

নিমাই বলল, কাল আমি জোগাড় এনে দেব। বাঁধবি তো ?

খাওযার পাট চুকিযে স্যাঁতসেঁতে মাটির মেঝেয় বিছানা পাতল নিমাইর মা। চাটাইর ওপর চট—তার ওপরে ছেঁড়া একটা কাঁথা। নিমাইর বালিশ আছে একটা। নিমাইর মার মাথার নিচে ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি।

—কীবে ? অমন উসখুস করছিস ক্যানো ?

—শালার মশার কাণ্ড ছ্যাখ্ না। টেনে নিযে যেতে চাইছে।

গাযে জড়ানো আঁচলটা খুলে নিমাইচাঁদের পাযের ওপর মেলে দিল

নিমাইব মা। একটু পরে ফিসফিসিয়ে বলল, জানিস, রতনা আমাকে শাসিয়ে গেছে। সকালেই নাকি আমাদের ঘর থেকে নামিয়ে দেবে।

শুনে নিমাই অন্ধকারে এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল। তারপর তাচ্ছিল্য করে জবাব দিল, শালার চেকনাই বেড়েছে। রাতটা পোহাক না, দেখব।

মশা তাড়াতে হাত বাড়িয়ে নিমাইর মা বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিল বাইশ বছরের ছেলেকে। বাইশ বছরের ছেলে নিমাইচাঁদও এইটুকু শিশুর মত গুটিয়ে-গুটিয়ে মায়ের পেটের মধ্যে মুখ গুঁজেছিল।

আদিগঙ্গাব গর্ভে যেন মাথা খুঁড়ছিল এক কীট—নতুন একটা জন্ম পাবার আকাঙ্ক্ষায়।

ফুলঝুরি, তোমার নাম

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ছেলেবেলার ফুলঝুরি, তোমার নাম আমার এখনো মনে আছে।
বলো তো আমার মন ভালো কিনা ?
মোরগঝুঁটি ডাকবাক্সে শাদা পাতা ফেলবামাত্তর কি তুখোড় সব চিঠি—
নিচে লেখা : প্রণাম জানবেন, ভালোবাসা নেবেন।

আবে বাপু, আমি তো ওটুকুর জন্যেই ব্যাকুল।
সেই যবে থেকে চটা-ওঠা মার্বেল-গুলি জমাই,
যবে থেকে চুড়ি-লম্পর যোগাযোগে বানাই শিকলি,
অষ্টপ্রহর বুকে ছিপি এঁটে গুমোরে মাটিতে পা পড়ে না ;
তবে থেকেই, ভালোবাসা, তোমার জন্যে ওৎ পেতে আছি।

জন্মভূমি—কথাটার মধ্যে এক আশ্চর্য মাদুর বিছানো আছে,
তাতেও শুয়ে দেখতে পারো।
জ্বালাযন্ত্রণাব কথা মুখ ফুটে না বললেও টের পাই—
মানুষ যেমন ফুল, মানুষ তেমনি কাঁটা !
ঘরের ভেতরকার আসবাবে হোঁচট খেলেও তো তাকে রাখো।
সুতরাং—

ভালো মনকে বুঝ্ দিতে সময় লাগার কথা নয়
ফুলঝুরি, তোমার নাম আমার এখনো মনে আছে।

চিঠি

রবীন সুর

তুমি আর কতদিন গালাশীলমোহর স্ট্যাম্পের
কলঙ্কচর্চিত চিহ্নে হতচ্ছাড়া প্রণয়লিপির
নীরব অক্ষরমালা, ভবঘুরে ক্লান্ত পিয়নের
বিড়ম্বিত হস্তান্তরে জোন থেকে জোনাল নাম্বারে
সারাদিন ছুটোছুটি, প্রত্যহের দ্রুত মেলভ্যানে
ক্রমশ মলিন দেহ, কালি-ওঠা জীর্ণ লেফাফার
সমস্ত শরীরখানি ডেড্ লেটার অফিস-ফেরত
কাটাছাঁটা শোণিতাক্ত ব্যবচ্ছেদে মর্গের শীতল।

অপেক্ষায় পৌঁছে যাও ঠিকানার অন্তিম পশ্চিমে,
তখন ঠিকানা নেই, তবু সব চিঠির প্রাপক
নামহীন প্রেরকের অলিখিত নিঃশব্দ সংলাপ,
সহজ প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রতিদিন জ্যোতির্ময় খামে :
সমস্ত লেটার বক্সে, বাড়ি বাড়ি, শহরে ও গ্রামে
অন্বিষ্ট ব্যক্তির চিঠি ডেলিভারি করে যায় অদৃশ্য পিয়নে।

ছিপে মাছধরা

সত্য চক্রবর্তী

যে যাই বলুক, ছিপে মাছ ধরা এক চমৎকার খেলা, অতি কঠিন খেলাও বটে। জলের তলায় অদৃশ্য মাছকে কৌশলে বঁড়শিতে গেঁথে ডাঙায় তুলে আনা আর বনের বাঘকে ভুলিয়ে খাঁচায় পুরে ফেলা—এ দুটোর কোনোটাই সহজ কাজ নয়। জলেই মাছের বাসা—সেখান থেকে তাকে ধরে আনা কি সহজ কাজ ?

ছিপে মাছ ধরার শখ একেকজনের মধ্যে এমন উৎকট রূপ ধারণ করে যে তা নেশার সমান হয়ে দাঁড়ায়। বেহিসেবী খরচ, শারীরিক কষ্ট আর বার বার আশাভঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও উৎসাহের অভাব হয় না। রোদ-বৃষ্টি গ্রাহ্যের মধ্যে নেই, সময়মত কিছু খাওয়া হল কি না হল সেদিকে দৃকপাত করার সময় নেই, সামাজিক প্রতিষ্ঠার দিকেও ভ্রূক্ষেপ নেই—এমন কি পারিবারিক শান্তিটুকুও জলাঞ্জলি দিয়ে মাছ ধরা নিয়ে মত্ত হয়ে থাকেন। পরিবারের সকলের সঙ্গে চলে ঘোর অসহযোগ—এক ছটাক খোলও কেউ ভেজে গুঁড়িয়ে দেয় না, দেয় না কেউ সুতোর জট খুলে, ছিপগুলো অক্ষত রইল কি রইল না তা দেখতে হয় নিজেকেই, বাড়ি ফিরে টোপ মশলার কৌটোগুলো বা জাল ইত্যাদি নিজেই ধুয়ে মুছে নিতে হয়। এ হেন অবস্থায় যত দিন যায় পারিবারিক সম্বন্ধে ক্রমশ টান পড়তে থাকে—উনিও ক্রমে পুরোমাত্রায় স্বার্থপর হয়ে ওঠেন। ছুটিছাটাগুলো সব নিজে খরচ করেন।

স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোথাও আর যাওয়া হয়ে ওঠে না—আত্মীয়স্বজনেরা সব বিগড়ে যান। বাচ্ছাদের জামাকাপড় জুতো কেনার দরকার হলে সময় আর হয়ে ওঠে না, পরিবার ক্রমে রণচণ্ডী মূর্তি ধারণ করেন।

তবুও আমি বলি, ছিপে মাছ ধরা অতি মজাদার খেলা। এর রস যিনি একবার পেয়েছেন তাঁর পক্ষে, সাঁতারের মত, তা ভোলা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। জরাজীর্ণ আর বৃদ্ধের মধ্যে বাচ্ছাছেলের উৎসাহ এনে দিতে পারে যে খেলা, তার মূল্য কতটা তা কি বুঝিয়ে বলতে হয়?

খেলার ছলে

মাছ ধরার খেলায় যিনি মেতেছেন এই খেলার অনিবার্য অঙ্গ হিসেবে অহংকার তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছে, হতে হয়েছে কষ্টসহিষ্ণু। যিনি বাড়িতে এক গেলাস জল গড়িয়ে খান না, তাঁকে দেখেছি দশ সের বোঝা নিয়ে কাঠফাটা রোদে পাঁচ মাইল পথ হেঁটে চলেছেন। শোযার ঘরে চটি পরে চলাফেরা করা যার অভ্যাস, তাঁকে দেখেছি গামছা পরে খালি পায়ে এক হাঁটু কাদা ভেঙে চলেছেন। বাড়িতে ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও যিনি ইংরেজিতে ভিন্ন কথা বলেন না, এ হেন লোককে দেখেছে পুকুরপাড়ে বসে গেঁয়ো চাষীব সঙ্গে জমিযে গল্প জুড়েছেন, এমন কি মাঝে মাঝে মুড়িও খাচ্ছেন।

মাছ ধরার হুজুগে দেখা-শেখার সুযোগও বড কম নয়। গ্রামে গ্রামে ঘোরাঘুরি করার ফলে দেশের সত্যিকারের রূপটি তাঁর কাছে ধরা পড়ে। সরকারী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাব আওতায দেশের গ্রামাঞ্চলে যে নানারকমের গঠনমূলক কাজ হচ্ছে তার সঙ্গে একটা চাক্ষুষ পরিচয় হয়। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্যে সরকারী বেসরকারী ব্যবস্থাগুলো কিছু কিছু চোখে পড়ে। গ্রামের চাষবাস, গাছপালা, হাটবাজার, যানবাহন, ঘরবাড়ি, লোকজন সব কিছুর সম্বন্ধেই একটা ঘনিষ্ঠ জ্ঞান জন্মায়। যে কোনো লোকের পক্ষেই এ বড কম লাভ নয়।

ছিপে মাছ ধরার জন্যে মনের একাগ্রতা কতটা দরকার তা আপনারা জানেন। রামকৃষ্ণদেব ভগবৎসাধনাকে মাছ ধরার সঙ্গে তুলনা করে ভক্তদেব 'ফাৎনা'র দিকে নজর রাখতে বলেছিলেন। আমি-আপনিও তাই করছি, কিন্তু মাছের মন পাওয়া বোধহয় ঈশ্বরের করুণা লাভের চেয়েও

কঠিন কাজ। শরৎচন্দ্রের কৈলাস খুড়ো দাবা খেলার ঝোঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কাদের সাপ?' তিনি বেঁচে থাকলে দলবল নিয়ে তাঁকে একদিন 'ঘেরাও' করা যেত যাতে আমার আপনাব মত 'মেছো'দের সুখদুঃখ নিয়ে তিনি গল্প লেখেন। শরৎচন্দ্রের মাছ-ধরিয়ে নরেন কেবল পুঁটি ধরেন—ওতে কি আমাদের মন ওঠে?

সব খেলার মতই মাছ ধরার জন্যে কতকগুলো বিশেষ উপকরণ আর যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। শিকারীর নিপুণতা আর এই সব জিনিসের উৎকর্ষের উপরই নির্ভর করে মাছ ধবায় সাফল্য—হয়ত ভাগ্যের হাতও তাতে অনেকখানিই থাকে। তবু আমি বলব শিকারীর নিপুণতাই সব চেয়ে বড কথা। কোনো কোনো শিকারীর মধ্যে আমি আশ্চর্য নিপুণতা দেখেছি—অদ্ভুত তাঁদের জ্ঞান আর বোধশক্তি। ফাৎনা নডল কি নডল না টপাটপ তাঁরা মাছ ধরেন। একই টোপ-মশলা নিয়ে একই জায়গায় আমি যদি পাঁচটা মাছ ধরি, উনি ধরেন পঞ্চাশটা। একই জায়গায় দিনের পর দিন, কখনো রাত্রে বাতি জ্বেলে বসেও যেখানে একটা মাছও আমি ধরতে পারি নি, সেখানে প্রথম দিনেই তিনি সেষ'না মাছ ঘায়েল করেছেন। এটা ম্যাজিক নয়, এ আমি বহুবাব ঘটতে দেখেছি। প্রতিটি ঘটনাই কি ভাগ্যের ব্যাপার হতে পারে? তা কখনো নয়।

হাতযশ

খেলাধুলো নিয়ে দেশে দেশে এখন বহু উদ্যোগ বহু অর্থব্যয় হচ্ছে। ওবা ট্রেনিং-এর সাহায্যে এরই মধ্যে আমাদের হাত থেকে 'হকি' প্রায় কেড়েই নিল। অন্যান্য খেলায় আজ কোথায় যে আমাদের স্থান, বোধহয় এক ক্রীডা-সংস্থাগুলো ছাডা আব সকলেবই তা জানা আছে। আমাব তো মনে হয়, তৃতীয় শ্রেণীর শক্তি নিয়ে আন্তর্জাতিক খেলার আসরে না নেমে মাটি কাটলে দেশের দশের কাজ হত। যাই হোক, মাছ ধবাব কথাই বলি—এ নিয়েও বাইরের দেশে দেশে কত উদ্যোগ অনুশীলন। মাছ ধরাটা সে সব দেশে একটা ফর্মুলার মধ্যে ফেলা—নানান বই আব ছবির সাহায্যে যেই চেষ্টা করবে সেই খানিকটা ফল পাবে। এখানে তেমন কিছু নেই; কিছুটা অভিজ্ঞতা আর বাকিটা অনুমান এই সম্বল করে আমাদের চলতে হয়। কেউ কি দেখেছেন মাছ যখন টোপ ধরে তার ভঙ্গীটা কি রকম থাকে?

জলের তলাকাব ছবি থাকলে এটা জানা যেত আর হয়ত তা থেকে শিকারীদের কিছুটা সুবিধেও হত।

ছিপে মাছ ধরার নানান পদ্ধতি। বঁড়শিতে টোপ গেঁথে সুতোয় ফাৎনা লাগিয়ে মাছ ধরাই সবচেয়ে জনপ্রিয়। কেউ আবার বঁড়শিতে টোপ দেন বটে, কিন্তু কোনো ফাৎনা লাগান না। সুতোর চলাফেবার ওপর নির্ভর করেই জোরে ছিপ টেনে তাঁকে মাছ গাঁথতে হয। আর এক রকম হল চারকাঠি। একটা বাঁশের সঙ্গে মশলা বেঁধে জলের তলায় পুঁতে দিতে হয় যাতে বাঁশের আগা জলের ওপর জেগে থাকে। মাছ এসে সেই মশলাব ওপব হুডোহুডি শুরু করলে বাঁশের আগা নডতে থাকে। তখন মোটা সুতোয় বড বঁডশি লাগিয়ে ফাৎনা দিয়ে ঠিক চারকাঠির পাশে ছিপ ফেলে টেনে মাছ গাঁথতে হয়। এতে মাছ যত ধরা পড়ে, জখম হয তাব বেশি। এ ছাড়া কেউ কেউ সেয়ানা মাছকে জব্দ করার জন্যে 'ঝুপি' ফেলেন। ঝুপি অর্থে অনেকগুলো বঁড়শি একসঙ্গে থোকা কবে বাঁধা—মস্ত একদলা মশলা টোপের মত লাগিযে ফেলা হয়। যে সব পুকুরে পুঁটি মাছের উপদ্রবে টোপ ফেলা যায় না, ঝুপিতে সেখানে ভাল কাজ হয।

টোপ আর চার

ছিপ ফেলার নিয়ম মোটামুটি দুটি। এক হল 'লোটা' অর্থাৎ পুকুরের তলায সুতো লুটিয়ে, আর অন্যটি 'ভাসা' অর্থাৎ টোপ পুকুরের তলায় ঠেকবে কি ঠেকবে না এমন ভাবে ভাসিয়ে। লোটায় ফেলতে হলে ছোট ছিপে, কাছে ফাৎনা (ছোট মাপের হওয়া চাই) রেখে টোপ ছুঁড়ে ফেলতে হয়; টোপ এতে মাটিতে পড়ে থাকে। ভাসায় ফেলতে হলে লম্বা ছিপ নিতে হয় আর জল মেপে বড ফাৎনা দিয়ে টোপটিকে ঝুলিযে ফেলতে হয়। ভাসায় ফেলতে হলে বড মাপের বঁডশি না নিলে মাছ বাদ হওয়ার আশঙ্কা খুব বেশি থাকে।

যেমন ভাবেই মাছ ধরুন, আপনাব প্রয়োজন খানিকটা মশলা বা টোপের। মশলা বলতে প্রধানত মাখন-গাদ মাখানো বেনে মশলাই বোঝায়। এতে বিভিন্ন ভাগে একাঙ্গী, তাম্বুল, ঘোডবচ, আওবেল, লতাকস্তুরী, বুঁচকি প্রভৃতি মশলা থাকে। আজকাল অবশ্য বেনেমশলা ছাড়া অন্যান্য মশলার চলন হয়েছে খুব, বিশেষ করে পচানি কিংবা খোলের সঙ্গে দেশী মদ বা পচাই মদের

গাদ জাতীয় মাদকদ্রব্য মেশানো জিনিস। এতে চারে মাছ বহুক্ষণ আটকা থাকে—বেশি হলে অবশ্য মাছ মেতে যায় ; আর সেই কারণে, টোপ নেয় না। পনীর বা অন্যান্য পচা জিনিস দিয়েও ভাল চার হয় কিন্তু এতে বাজে মাছ অর্থাৎ শোল, শাল, বোয়াল জাতীয় মাছ এসে চারে ভিড় ক'রে সময় সময় মাছ ধরাটাই পণ্ড করে দেয়। তাছাড়া এসব নোংরা দুর্গন্ধ জিনিস হাতে করে ব্যবহার করাও এক দুরূহ কাজ।

টোপের কায়দাও হাজার রকমের। চিঁড়ে বা ভাতের সঙ্গে পাঁউরুটি মেখেই সাধারণত টোপ করা হয়। শুধু পাঁউরুটি দিয়েও ভাল টোপ হয়। কেউবা তাতে খানিকটা মধু বা ছাতু মেশান, কেউ একটু ঘি দেন, কেউ দেন দুধের সর, কেউবা মাখন। কেউবা আবার চিঁড়ের পোলাও বা নারকেল বা ছাতু দিয়ে কিছু তৈরি ক'রে টোপে দেন। মাথা টোপের সঙ্গে পিঁপড়ের ডিম লাগিয়ে ফেলতে হয়। কেউ কেউ বোলতার ডিম বা কেঁচো গেঁথে ফেলেন। সবগুলোতেই কম-বেশি কাজ হয়।

ছিপ

ছিপ সাধারণত রেঙ্গুনের একজাতীয় বাঁশ বা বাখারি দিয়ে তৈরি হয়। কোনো কোনো শৌখীন শিকারীর হাতে আমি অনেক দামী বিলিতী গ্লাস-ফাইবার বা স্টিলের ছিপ দেখেছি। কেউ পছন্দ করেন লম্বা ছিপ, কেউবা মাত্র দুহাত মাপের ছিপ। আমার ধারণা, মাঝারি মাপের অর্থাৎ তিন থেকে সাড়ে তিনহাত হাল্কা ছিপই ভাল। ভারি লম্বা ছিপে বড় মাছ লাগলে ছিপের গোড়া পেটে ঠেকিয়েও কূল পাওয়া যায় না। তাছাড়া মাছ টোপ ধরার সঙ্গে সঙ্গেই টানটি তোলা চাই। এই কারণে একহাতে টানমারা অভ্যাস করা ভাল। দুটো হাত একত্র করে ছিপ তুলতে তুলতে অনেক সময় মাছ টোপ ছেড়ে দেয়। একহাতে টানা অভ্যাস থাকলে মাছ ধরার গড় অবশ্যই বেড়ে যাবে।

ছিপের একেবারে শেষে হুইল বাঁধা ভাল। এতে ছিপের আগা হাল্কা থাকে বলে চট করে টান ওঠে আর হুইলের মত বড় একটা জিনিস ধরে মাছ খেলানোর সুবিধে পাওয়া যায়। হুইলের মাপ নানা রকমের হয়, আমার মনে হয়, তিন ইঞ্চি মাপের হুইলই ঠিক—অনেক সুতো

আঁটে, অথচ হাতের মধ্যে চেপে ধরা যায়। এর চেয়ে বড় হুইল হাতে ধরতে বড় অসুবিধা—ভারি মাছ যদি অনেকক্ষণ খেলিয়ে তুলতে হয়, বড় হুইল চালানো বেশ কষ্টকর।

ছিপ অনুযায়ী সুতো ব্যবহার করা উচিত। মোটা সুতো নরম ছিপে চলে না—টান বসে না ঠিকমত। কড়া ছিপে সরু সুতো লাগালে টানের সঙ্গে সঙ্গে চটকা হয়ে ছিঁড়ে যেতে পারে। আজকাল মুগা সুতোর চলন প্রায় উঠে গিয়েছে। সকলেই দেখি, নাইলন বা প্ল্যাস্টিকের সুতো ব্যবহার করেন; এর সুবিধে এই যে, মোটে জড়ায় না। ফলে, হুইল থেকে অনেক সুতো বার করে বহুদূরে ফেলা ভারি সহজ। কিন্তু এতে ফাঁস দেওয়া খুব শক্ত। ফাঁস ঠিক না হলে মাছ খুলে যাবে আর গিঁট পড়ে গেলে সুতো ছিঁড়ে যাবে। সুতরাং খুব যত্ন নিয়ে সুতোর শেষে ফাঁস দেবেন আর ফাঁসের গোড়ায় এলো মুগা দিয়ে ভাল করে জড়িয়ে নেবেন। মনে রাখবেন, গিঁট পড়লেই সুতো ছিঁড়ে যাবে। খুব জোরে ভাঁজ পড়ে গেলেও এসব সুতো ছিঁড়ে যায়।

বঁড়শি বেশ দেখেশুনে তবে বাঁধা উচিত। আগে ছোটবড় ঝুলে জোড়া বঁড়শির চলন ছিল—আজকাল বেশির ভাগ শিকারীই তিন-কাঁটা সমান ঝুলে বাঁধিয়ে নেন। এর অনেক সুবিধে। বিশেষ করে, কাৎলা মাছ লাগলে অনেক সময় দেখা যায় যে মাছের মুখে দুটো বঁড়শি লেগে আছে। এতে মাছ তাড়াতাড়ি জব্দ হয় আর আচমকা খুলে যাওয়ার ভয় কমে। জঙ্গলপুকুরে অবশ্য একটা বঁড়শি ফেলা ভাল—নাহলে খালি বঁড়শিটা জঙ্গলে আটকে মাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বঁড়শি কিন্তু সব সময়েই একটু বড় ঘেরের হলে ভাল হয়—ছোট বঁড়শিতে বড় মাছ লাগলে প্রায়ই খুলে যায়, কারণ তা মাছের মুখে ভাল ভাবে চেপে বসতে পারে না।

মাছ খেলিয়ে তোলার সময় ল্যাণ্ডিং নেট ব্যবহার করা উচিত। অনেক সময় মাছের বঁড়শি অত্যন্ত আলগাভাবে লেগে থাকে। শিকারী সুতো টান রাখেন বলে মাছ খুলে যায় না, তখন তাড়াতাড়ি ল্যাণ্ডিং নেটে মাছ তুলে ফেলা দরকার। এমনি টেনে মাছকে ডাঙায় তুলতে গেলে এইসব ক্ষেত্রে অনেক সময় মাছ বঁড়শি থেকে খুলে গড়িয়ে জলে ফিরে যায়।

হুঁশিয়ার

মাছ ধরতে গিয়ে নানা রকম বিপদ-আপদ ঘটে। মোটামুটি কয়েকটি আমি শিকারী বন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। বর্ষায় পুকুরপাড়ে সাধারণত খুব জঙ্গল হয় এবং কখনো কখনো এইসব জায়গায় সাপের দেখা পাওয়া যায়। পুকুরের পাড়ে বা আলের গর্তে বিষাক্ত সাপের বাসাও থাকতে পারে। মাছ ধরার ঝোঁকে শিকারী এসব কথা ভুলে যান। সুতরাং চারিদিক দেখেশুনে তবে মাছ ধরতে বসা উচিত। কারণ, একবার মাছধরা আরম্ভ হলে শিকারী দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তাই আমি বলি আগেভাগে দেখেশুনে বসুন। মাছধরাটা একটা খেলা বা শখের চেয়ে বড় কিছু নয়—এর জন্য জীবন বিপন্ন করে সাপের গর্তের মুখে বসার কোনো মানে হয় না। পুকুরপাড়ে জোঁক, পোকামাকড় পিঁপড়ের যন্ত্রণাও বড় কম নয়। একরকম বিষাক্ত পিঁপড়ে আছে, যার কামড় সাপের ছোবলের মতই যন্ত্রণাদায়ক। দু ঘণ্টায় জ্বালা জুড়োয় না আর ক্ষতস্থান ক্রমশ ফুলতে থাকে। পুকুরপাড়ে পিঁপড়ে থাকলে পিঁপড়ের ডিম লাগিয়ে কয়েকটা টোপ কিছুদূরে ফেলে রাখবেন যাতে পিঁপড়েগুলো তারই উপর পড়ে থাকে। পিঁপড়ের ডিমেও ভীষণ পিঁপড়ে লাগে; তাই জলে একটা ইট বসিয়ে তাতে পিঁপড়ের ডিমের কৌটোটা বসিয়ে রাখতে হয় তাতে পিঁপড়ের উপদ্রব এড়ানো যায়।

চারে বসার সময় ঝোপজঙ্গল যেমন দেখা দরকার, তেমনি বড় গাছপালাও দেখে বসা উচিত। বড় গাছের আওতায় ছায়া পাওয়া যায় বটে, কিন্তু চারে নিশ্চয় পাতাপচা ময়লা থাকে। সময় সময় এতে মাছের টোপ নেওয়ায় বাধা পড়ে। তাছাড়া বড় তাল-নারকেল গাছের নিচে বসাও বড় বিপজ্জনক। হঠাৎ একটা তাল বা নারকেল পিঠে বা মাথায় পড়লে প্রাণ নিয়ে টানাটানি হওয়া বিচিত্র নয়।

যাঁদের মাছ ধরার শখ, তাঁদের সাঁতার না জানলেই নয়। বর্ষায় বা তার পরও পুকুরের পাড় খুব পিচ্ছিল হয়ে থাকে; তাই সাঁতার না জানলে হঠাৎ পিছলে জলে পড়ে বিপদ ঘটতে পারে। কোনো কারণে জলে যদি নামতেই হয় জুতোপায়ে নামা উচিত। নাহলে জলের তলায় কাঁচ বা শামুকে পা কেটে যেতে পারে।

মাথা বাঁচিয়ে

বলা বাহুল্য, রোদ-বৃষ্টির মধ্যেই মাছধরার খেলা। তবে যতটা পারা যায় রোদ-বৃষ্টি বাঁচিয়ে চলা ভাল। বিশেষ করে রোদ। তাই সর্বদা একটা ছাতাবাঁধা লাঠি সঙ্গে রাখা উচিত। চারে বসার সময় লাঠিতে ছাতা বেঁধে আপনার শরীরটা ছায়ায় থাকে এমন জায়গায় পুঁতে দেবেন—আপনি ছায়া বাতাস দুই-ই পাবেন, কষ্ট অনেক কম হবে। তাছাড়া ছাতা ধরার জন্যে একটা হাত জুড়ে থাকবে না—ছিপে মাছ লাগলে দুহাতেরই সমান কাজ। তাই হাতদুটো সর্বদা খালি থাকাই ভাল। মাছ ধরতে বার হওয়ার সময় কিছু খাবার আর খানিকটা জল সঙ্গে নেবেন। সারাদিন রোদের তাতে শরীর ভীষণ টেনে যায়, তাই জল না হলে চলে না।

বঁড়শি থেকেও অনেক বিপদ ঘটে। অথচ মাছধরায় বঁড়শি বাদ দেওয়া চলে না। জোড়া বা তিন-কাঁটায় গাঁথা মাছ খোলার সময় খুব সাবধান হওয়া দরকার—মাছকে রীতিমত জোরে চেপে ধরে তবে বঁড়শিতে হাত দেবেন। জীবন্ত মাছের মুখে একটা বঁড়শি আর অন্যটা অসাবধান শিকারীর হাতে বেঁধা—এমন দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়। মাছধরার শেষে বঁড়শি থেকে টোপ ঝেড়ে ফেলার সময়ও অনেক বিপদ হয়। এ-সময় ছিপের আগায় সুতো খুব ছোট করে নেবেন, যাতে জলে ঝাপটা মারার সময় ঘুরে এসে বঁড়শি আপনার গায়ে না বেঁধে।

মাছ ধরার জন্যে 'পেঙ্গুইন' ছিপ

লেনিনগ্রাদের ইঞ্জিনিয়ার 'পেঙ্গুইন' ইলেক্ট্রোনিক ছিপ তৈরি করেছেন। ছিপটিকে বঁড়শি সুতোসহ একটি ছোট্ট খাপে রাখা যায়।

'পেঙ্গুইন' ব্যবহার করাও খুব সহজ। একটি বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে টোপ নিয়ে বঁড়শিটা থর থর করে কাঁপতে থাকে জলের নীচে, যাতে মাছেরা আকৃষ্ট হয়। ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থার ফলে এই কাঁপুনিকে কমান বাড়ান যায়।

একটি টর্চের ব্যাটারি দিয়েই 'পেঙ্গুইন'-এর কাজ চলে এবং ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত একটা ব্যাটারি চালু থাকে।

পপলাবাবু

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়

গেন্দ্রা আউরৎ বনে গেছে—আব, ওর বৌ বনে গেছে মরদ।

কথাটা আরও পরিষ্কার করে বুঝে নেবাব জন্যে বললুম—'তুমি তো মরদ-ই ছিলে?' ও বললে 'হাঁ'। 'আর তোমার বৌ ছিল—আউরৎ?' বললে—'হাঁ'। বললে, 'দাবাবাবু বোলেছে, আউর দুটা মাস গেলে আমাকে ভি মরদ করে দিবে।'

এখানকার ডাক্তারবাবুকেই ওরা বলে 'দাবাবাবু'।

বনবিভাগের বন আর সাহেব কোম্পানির চা বাগানের ঘেঁসাঘেঁসি এই জায়গাটি। এখানে এসে প্রথমেই আলাপ হলো এখানকার বিচিত্রনামা বাবুদের সঙ্গে। 'দাবাবাবু' 'মানিজারবাবু' অর্থাৎ চা-বাগানের ম্যানেজার, 'ফরাসবাবু' অর্থাৎ ফরেস্ট অফিসার, 'মালোযারীবাবু' অর্থাৎ অ্যান্টিম্যালেরিয়া বিভাগের কর্মচাবী। সংখ্যায় এই সব বাবুরা খুবই কম। কাঠের খুঁটির ওপর বাংলো ধরনের বাড়ি এঁদের। সামনে বাগান। অনেকগুলো সিঁড়ি পেরিয়ে উঠতে হয় এঁদের বাড়ির একতলায়। বাড়ির চারদিকের বারান্দা মিহি তারেব জালে ঘেরা,—বন্য কীট-পতঙ্গ নিবারণের জন্যে।

যাদুঘরের এই সব কীট-পতঙ্গ সংগ্রহের কাজেই আমি এখানে এসেছিলুম। ঝিঁঝিঁ পোকা, গণ্ডার পোকা, বাঘের গায়ের এঁটুলী, বিষাক্ত মাকড়সা, নানা ধরনের প্রজাপতি এই সবই বনে বনে বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করতে

হতো। বিষাক্ত কি কোনও অপরিচিত কীট কি পতঙ্গ পেলে তা ওষুধে ভিজিয়ে রাখতে হতো। ভিজে মাটিতে কতগুলো শুকনো কুঁকড়োনো ঝরাপাতা পড়ে আছে। একটু এগুতেই তা সব প্রজাপতি হয়ে উড়ে চলল। ছুটলুম জাল নিয়ে। ধরা হলো কয়েকটি। আহা! ডানার ভেতরের দিকটিতে কী বর্ণ, কত যে কারুকার্য, দেখে মনে হয় অজন্তা ইলোরার শিল্পীরা কোত্থেকে যে প্রথম আঁকা শিখেছিলেন, তা যেন জেনে গেলুম।

অথচ প্রথমে যা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি নি তা হলো অন্য সব বাবুদের মত কখন যেন আমারও একটি নামকরণ হয়েছিল—'পপ্‌লাবাবু।' এখানকার ভাষায় পপ্‌লা মানে প্রজাপতি। এই প্রজাপতিই আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, গেন্দ্রার সঙ্গে, সাবীনার সঙ্গে, ডিকেন্স, ডুগ্‌রু আর চা-বাগানের 'বিলায়েতি সব্‌সা বঢ়া' সাহেবটির সঙ্গে।

সাবীনা ছাড়া এখানকার সব মেয়েই আমাকে দেখলে মুখ ঘুরিয়ে হাসত। হাসবেই বা না কেন! বয়েস হয়েছে, উন্মাদ নয়, অথচ হাতী-বাঘের বনে এসে লোকটা ছুটে বেড়ায় কিনা ফড়িং আর প্রজাপতির পেছনে। আমাকে ওরা চিনেওছিল সহজেই। ওদের নাচ-গানের উৎসবে আমি যেতুম। মেয়েদের হাতে হাত বেঁধে, গায়ে গায়ে লেগে, 'ঝিলিমিলিঝিল্লা'—বলে বুক টান করে এক পা পেছিয়ে যেতে যেতে, 'ঢেঁাসিরে'—ব'লে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত সামনে ঝুঁকে পড়ার নাচ। আবার কখনো অনেকে মিলে নেচে গান করত—

'লম্পটিয়া শাম
ফাঁকি দিয়া পলাইল আসাম।
সাহেব বলে 'কাম্ কাম্'
বাবু বলে ধরে আন্
সর্দার বলে লিম্বু পিঠের চাম্।'

এ সব গান ওদের মুখে মুখে চলে আসছে।

সন্ধ্যে হবার আগেই ফিরে আসতে হতো বাংলোয়। কেন না বাঘ ওখানে সুলভ প্রাণী। একলা চলা কোনও সময়েই নিরাপদ নয়। অথচ এই ফিরে আসার পথেই, জনবিরল নিভৃতে, ঝিঁঝিঁর আওয়াজ সমুদ্রের এক কোণে, হঠাৎ চোখে পড়ত সাবীনাকে। দল থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন সে। একটি

পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে, আর একটি পা হাঁটুর কাছ থেকে পেছন দিক মুড়ে গাছে ঠেস দিয়ে গম্ভীর মুখে মাথাটি নিচু করে থাকত। পরণে হাঁটু অবধি চটের ঘের। এক টুকরো কাপড়ের কোনা কোমরে গুঁজে তা দিয়ে গা ঢাকা। গোলগাল মাজাঘষা নিটোল চেহারাটি। শুকনো কুঁকড়োনো ঝরা পাতার মত প্রজাপতিগুলোকে প্রথমে যেমন চেনাই যায় না, সাবীনার মুখখানিও অনেকটা তেমনি। বিশেষ ভাবে নজর না করলে অন্যদের সঙ্গে ওর তফাৎটুকু চোখেই পড়ে না। ও যেন কালের হাওয়ায় পালিশ উঠে যাওয়া একটি খোদাই শিল্প। গোলপানা ছোট্ট ঠোঁট। চিবুকটি কচিকচি—ভগবান শিল্পী বড়ই নিপুণভাবে যেন গড়েছেন। নাকের বাঁশিতে ছোট্ট একটি নাকছাবি। কপাল থেকে মাথার খোঁপা অবধি মোটা তুলির বলিষ্ঠ একটি গোল টান।

অন্য মেয়েরা প্রজাপতি কি ফড়িং দেখলে সেদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করায়। সাবীনা এ সব কিছুই করে না। তা ছাড়া, পিঠে ডোকো অর্থাৎ মাথার সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঝোলানো চাপাতি তোলার ঝুড়ি, আর সামনের দিকে, গলার সঙ্গে বুকের কাপড়ে বাঁধা ছেলে নিয়ে ওরা যখন দলের মধ্যে থাকে, তখন অতটা আলগাভাবে কাউকে চেনাও যায় না।

গেন্দ্রা কাজ করত বাংলোর ফুলবাগানে। লোকটাকে কখনো হাসতে দেখিনি। কোনও দিকে তাকাতে বা কারও সঙ্গে কথা বলতেও দেখিনি। এই বনপ্রান্তের অনাবিল কিচিমিচি কর্মস্রোতের মধ্যে গেন্দ্রা যেন একেবারেই একা। দেহটি সুঠাম স্বাস্থ্যবহুল নয়। বয়েস চল্লিশের কাছেপিঠে। বেশ লম্বা। চোয়ালের হাড় বেরুনো। কালো কুচকুচে চেহারা। ঘাস কাটছে তো একমনে কেটেই চলেছে। ভাবলুম একটু আলাপ করা যাক। বললুম, 'ফুলবাগানের কাজে কত করে পাও?' কোনও জবাব নেই। ভাবলুম কানে কম শোনে। একটু জোরে বললুম, 'তোমার নাম কি গো?' আমার দিকে না তাকিয়েই বললে—'গেন্দ্রা'। বুঝলুম, আমাকে খুব একটা পাত্তা দিতে চাইছে না। একটু এগিয়ে এদিক সেদিক একবার দেখার ভাণ করে চাপা গলায় বললুম—'তোমরা হাড়িয়া খাও না?' হাড়িয়া হলো ঘরে তৈরি মদ। মরচেপড়া খাপ থেকে ঝকঝকে তলোয়ার বেরিয়ে আসার মত এক ঝলক হাসির সঙ্গে, এবারে, গেন্দ্রা একেবারে আমার আপন লোক হয়ে গেল। ঘাসকাটা ছুরিটা একধারে সরিয়ে রেখে, আমার দিকেই সম্পূর্ণ মন বসিয়ে

দিলে। এত দিনের আলতো করে দেখা লোকটি বেমালুম পালটে গেল। আমাকে বললে—'তুই দিন ভোর পোপ্‌লা ধোরিস কেনো?' বললে—'উতে তুর কি হয়?' চাপা গলায বললুম, 'ওতে খুব ভাল মদ তৈরি হয়। কলকাতার বাবুরা আর বড বড সাহেবরা তো ঐ মদই খায়।'

যাই হোক্, এই সব কথায় কথাযই, ও এক সময় কয়েক মাস আগে ওর আউরৎ বনে যাওয়া আর ওর বৌ-এর মরদ বনে যাবার কথাটা বললে। আমি বললুম, 'ছেলেপুলে নেই তোমাদের?' ও বললে, 'ছেলে ভি আছে, মেইয়ে ভি আছে। তো—দাবাবাবু বলেছে আউর দুটা মাহিনার ভিত্‌রেই আমাকে ফিন্ মরদ করে দিবে। বাগানকা সবসা বঢা সাব্, বিলায়েতি সাব্ দাবাবাবুর কথা খুব মানে।' আমি বললুম, 'তুমি আউরৎ হয়ে গেলে আর তোমার বৌ হয়ে গেলো মরদ?' গেন্দ্রার মুখখানা আবাব আগের মত কালো হয়ে গেল। কপালে হাত ঠেকিযে বললে, 'নসিব খারাপ হলে আউর কি হোবে বল্!'

কোনও নারী বা পুরুষের এ জাতীয় পরিবর্তনের খবর এব আগেও শুনেছি। পরশুরামের গল্পেও পড়েছি। কিন্তু এ যে স্বামী-স্ত্রী একেবারে দুজনেই পাল্টে গেল। এমন একটি পৃথিবীচমকানো খবব, এত নিভৃতে, এতটা কাছে, এত সজীব ভাবে বসে আছে দেখে, ভেবে সময় নষ্ট না কবে ওর সঙ্গে কথা বলতে লাগলুম। বললুম, 'তুমি আমার সঙ্গে কলকাতা যাবে?' ও বললে—'সেইটা কোতো দূর আছে?' বললে, 'পোপ্‌লা দিয়ে যে মদটা হয় সেটা খেতে কেমন লাগে?' বললুম, 'সে অনেক দামী মদ।' ও বললে, 'কলকাতায় একটা কাজটাজ মিলবে?' আমি বললুম—'কলকাতায মস্ত মস্ত অনেক চা-বাগান আছে। গেলেই কাজ পাওযা যায।' বললুম, 'তোমার ভাবনা কি, তুমি তো আমার সঙ্গে ঐ মদ তৈরিবই কাজ করবে। পারবে না?' গেন্দ্রার মুখখানা উজ্জ্বল হযে আবার মিইয়ে গেল। বললে, 'কি করে যাবো। আউরৎটা যে মবদ বনে গেছে, এখন উর কথাতেই আমাকে চোলতে হোবে।'

গেন্দ্রা-ই একদিন দূব থেকে চিনিয়ে দিযেছিল ওর স্ত্রীকে। আর ওর কাছ থেকেই জেনেছিলুম যে ওব স্ত্রীর নাম—সাবীনা। প্রথমে স্ত্রীব নাম বলতে চায নি। ওটা ওরা বলে না। বললুম—'বাঃ বেশ সুন্দর নামটি তো তোমার বৌ-এর।' বললুম, 'তোমার নামটা কিন্তু তেমন সুন্দর নয়।

বৌএর প্রশংসায় গেন্দ্রাব মুখখানি বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল—কিন্তু তার নিজের অপ্রশংসায় সে ভাবটি আবার মিলিয়ে গেল। বললুম, 'তোমাব বৌ ঐখানে ঐ কাঁঠাল গাছটার তলায় ভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকে কেন বলো তো।' গেন্দ্রার গলার পাশের নীল রগটা হঠাৎ ফুলে উঠল। বেশ দৃঢ় গলায় বললে, 'ওইটা তুকে দেখে।' ওর এই আকস্মিক দৃঢ় ভাবটি লক্ষ করে প্রসঙ্গটা পাল্টাব কি না ভাবছিলুম। ও হঠাৎ আমাব প্রতি সম্পূর্ণ অমনোযোগী হয়ে ঘস্ ঘস্ করে ঘাস কাটায মন দিলে। আমিও একটু চুপ করে থেকে আবার বললুম, 'তোমার বৌ একা একা ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িযে আমাকে কেন দেখে বলো তো?" গেন্দ্রা এক মনে ঘাস কেটে চলেছে। বললুম, 'এ তো ঠিক নয়। ম্যানেজার বাবুকে একবার বলবো নাকি।' একটু থেমে আবার বললুম, 'তুমি তো আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবে—আর কলকাতায় আমার বৌ আছে তো, আমার বৌ যদি একথা জানতে পারে—' গেন্দ্রা বাধা দিয়ে খানিকটা ধমকানোর মতই বললে, 'উ দেখে তো তুর তাতে কি।' ঘস্ ঘস্ করে আবার কয়েক ছোপা ঘাস কেটে ছুরিটা একধারে সরিয়ে রেখে বললে—'ওইটা তো আন্য বাগানে ছিল। সেখানে চিরকু বলে একটা ছোকরাকে উর চোখে লেগেছিল। চিবকুটার সঙ্গে উর বিযা ভি হইয়েছিল। তো পবে একদিন সেই ছোকরাটা বললে, আমি খৃস্টান হবো নাই। সাবীনা সেই জন্যে উটাকে ছেড়ে এই বাগানে পেলিয়ে এলো—আউর আমাব সঙ্গে সাদি হোলো।' বলে গেন্দ্রা তার গলায ঝোলানো ক্রস্ চিহ্নটি গর্বেব সঙ্গে আমাকে দেখাল। একটু থেমে আমাব দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, 'তুকে সেই চিরকু ছোকবাটার মতো দেখতে লাগে। একদিন তুই যখন পপ্‌লা ধরছিলি তখন সাবীনা তুকে দেখিয়ে হামাকে এ কথা বলেছে। সেই জন্যেই সাবীনা তুকে দেখে।' আমি বললুম, 'আচ্ছা আমাকে যে তুমি একদিন তোমার বস্তিতে নিযে যাবে বলেছ সে কথা তোমার বৌ জানে?' গেন্দ্রা বললে, 'আলবৎ জানে। তবে উ সেটা না করে দিয়েছে। তো—উ না করেছে তো কি হয়েছে। উর 'না' আমরা কেন শুনবো। উর পইসায আমরা খাবো? দুটা মাহিনা পরে আমি ভি মরদ বনে যাবো।'

গেন্দ্রাব আউরৎ বনে যাওয়া আর ওর বৌ-এর মরদ বনে যাবার ব্যাপারটা সুযোগমত খোদ্ দাবাবাবুকেই জিজ্ঞেস করেছিলুম। ভদ্রলোক তো হেসেই

অস্থির। বললেন, 'স্কেল্—স্কেল্ মশাই, চা-বাগানের পে-স্কেল। তিনটে আলাদা হারে এখানে মাইনে দেওয়া হয়। সব থেকে বেশি 'মরদ', তারপবে 'আউরৎ' আর সব থেকে কম 'লোটামোরো'। গেন্দ্রার বৌ বেশি কাজ দিতে পারে, তাই তার হযেছে পদোন্নতি। আউরৎ হার থেকে মরদ হারে মাইনে পাচ্চে। আর গেন্দ্রার হযেছে অবনতি। নেশাটেশা করে কাজে অবহেলা করলেই এরকম হয়।'

দাবাবাবু অর্থাৎ ডাক্তারবাবু লোকটি ভারি মিষ্টি স্বভাবের। তাঁর বাংলোরই একটি ঘরে আমার থাকবার জাযগা হয়েছিল।

একদিন গভীর রাতে বাইবে থেকে ডাক এল—'দাবাবাবু—এ দাবাবাবু—' গলাটা মনে হলো গেন্দ্রার। বাইরে ঝিবি ঝিরি বৃষ্টি। বনভূমির হিংস্র শ্বাপদরা এই চা-বাগান এলাকায হামেশাই ভ্রমণে আসে। কোথাও বাঘ পডলে কি কারো কঠিন রোগ হলেই এত রাত্রে দাবাবাবুর ডাক হয়। বেচাবাকে গুলি বন্দুক কি ওষুধেব ব্যাগ নিযে সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে হয। ডাক্তাববাবু উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠলুম। টর্চ জ্বালিযে দেখি, লোকটি গেন্দ্রা নয। ডাক্তারবাবু বললেন, 'কীরে ডিকেন্স—এত রাতে?' ডিকেন্সের বস্তি এখান থেকে মাইল দুই দূরে হবে। সরকারি বনেব ভেতর দিয়েই যেতে হয়। একটা আলো কি একখানা লাঠি পর্যন্ত লোকটির সঙ্গে নেই। অবশ্য চেহারাটি বেশ পেটা-কোঁডা। সমস্তপথ একা ভিজতে ভিজতে এসেছে। ডিকেন্সও এই চা-বাগানেই কাজ করে। বললে, 'দাবাবাবু তুকে একবার হামার বস্তিতে যেতে হোবে। যদি না যাবি তো একটা খুন হযে যাবে।' ডাক্তারবাবু বললেন, 'খুন! কেনরে—খুন হবে কেন?' সে বললে, 'আমি খুন হবো কি আমার দাদাটা খুন হবে। আমরা দুটা ভাইয়ে একটা ঝগডা লেগে গেছে।' ডাক্তারবাবু বললেন, 'ঝগডা লেগেছে তো আমি কি কবব! তোদের সর্দারকে বল্। কাল সকালে ম্যানেজার বাবুকে বল্।' সে বললে, 'না, আমরা উসব জানি নাই। আমরা তুকে জানি, তুর কথা আমরা মানবো। আমাদের দুটা ভাই-এর বৌ দুটা বদল হয়ে গেছে। এখন আমবা কেউই চিনছি না—কি—কোনটা কাব বৌ।' ডাক্তারবাবু হেসে ফেলে ধমক দিয়ে বললেন, 'যা ভাগ। তোরা না চিনিস্ তোদের বৌদের বলগে যা—তারা ঠিক চিনবে' ডিকেন্স বললে, 'সে

উদেরকে বলেছি। ওরা দুটাতে খালি জড়াজড়ি করে হাসছে আর বলছে আমরা কি বলবো। তুদের বৌ তোরা নিজেরা না চিন্‌লে তো আমাদের কথার বিস্‌ওযাস কী আছে?' ডাক্তারবাবু বললেন, 'এ সব নিযে রাতদুপুরে আমার কাছে আসবি না। এখন যা। কাল ম্যানেজারবাবুকে বলব সে ঠিক করে দেবে।' ডিকেন্স 'বহুৎ আচ্ছা' বলে সেলাম ঠুকে চলে গেল।

ঝিরি ঝিবি বৃষ্টি পড়েই চলেছে। আমরাও শুতে গেলুম। ডাক্তারবাবু বললেন, 'নেশার ঝোঁকে এ ধরনের ঘটনায় খুনটুন হওয়া বিচিত্র নয়। এই সব ঘটনার মধ্যে যাওযাও খুব মুস্কিল।'

ঘণ্টা দুই পরে আবার ডিকেন্সের গলা। 'দাবাবাবু—এ দাবাবাবু।' বৃষ্টি তখন একটু জোব বাড়িযে দিয়েছে। 'দুত্তোর'—বলে আবার উঠলেন ডাক্তারবাবু। আমিও উঠলুম। ডিকেন্স এবারে একটা ছাতা মাথায় দিয়ে এসেছে। বললে, 'ঐ আমার দাদাটা ভি আসছে। তুই নিজের মুখে উকে বুলে দে। উ আমার কোথাটা শুনছে না।'

একটু পরে ভিজতে ভিজতে যিনি এসে দাঁড়ালেন, তিনি আর কেউ নন—গেন্দ্রা। গেন্দ্রাই ডিকেন্সের দাদা। ডাক্তারবাবু বললেন, 'হ্যাঁরে—আমি তো বলেই দিলুম, কাল সকালে ম্যানেজার বাবুকে বলব, সে সব ঠিক করে দেবে—আবার কী।' গেন্দ্রা বললে, 'ব্যাস্‌। আউর কুছু নাই। তোর নিজের মুখে কোথাটা শুনে নিলুম, সব ঠিক হয়ে গেলো। ভাইটা ভি এ কোথা হামাকে বোলেছে, লেকিন উব কোথা হামি বিস্‌ওয়াস্‌ করি নাই।' বলে মাথার দিকে হাত তুলে বললে, 'তুই এখন্‌ শুতে যা দাবাবাবু—জয়হিন্দ!' ডাক্তারবাবু বললেন 'ভিজে যাস নি রে গেন্দ্রা, আমার ছাতাটা নিয়ে যা, কাল দিয়ে যাস।' একটু সরে দাঁড়িযে ছিল ডিকেন্স। সে বলল, 'এখন আউর ছাতা লাগবে কেনো। এখন আমরা দুটাতে একটা ছাতাতেই যেতে পারবো।' গেন্দ্রা বললে, 'হাঁ হাঁ, এখনতো ফয়সালা হয়েই গেলো!' বলে ছুটে গিয়ে ডিকেন্সের ছাতাব তলায় ঢুকল।

আমি বহুক্ষণ চেযে রইলুম, ওদের দুটি ভাইয়ের একই ছাতার তলায় গায়ে গা লাগিয়ে চলে যাবার দিকে।

পরদিন সকালে ফয়সালাটা যে ঠিক কী ভাবে হলো তা আর আমার দেখা হলো না। ভোর বেলা জীপ্ এল, ফরাসবাবু এলেন আর চা-বাগানের বিলায়েতি বড সাবও এলেন। আমাকে যেতে হলো একটা নতুন বনের দিকে। সে বনটি গত পাঁচ বছর দর্শকদের জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। কোনও বনে কোনও দুষ্প্রাপ্য পশুর সংখ্যা বাড়িয়ে তোলার জন্যে এ ধরনের নিষেধ বহাল করা হয়। বন্দুকের আওয়াজ, গাড়ির শব্দ কি মানুষের হৈ-হল্লায় যাতে বনের শান্তিভঙ্গ না হয়। এইভাবে সংরক্ষিত বনে নানা ধরনের কীটপতঙ্গও অবাধে বেড়ে ওঠে। আমার যাবার দরকার এই জন্যে।

দুদিকে ছায়া-সবুজ গভীর সতেজ বন। মাঝখানে জীপ চলার রাস্তা। বিলায়েতি বড়া সাব, ফরাসবাবু আর ড্রাইভার ছাড়া আমাদের সঙ্গে ছিলো—ডুগরু। ডুগরু ফরাসবাবুর বাংলোয় কাজ করে। জীপ চলেছে আর সমস্ত পথ চোখমুখের সামনে থেকে নানা রং-এর প্রজাপতি সরাতে হচ্ছে আমাদের। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রজাপতি। গায়ে, মুখে, কোলে, জীপের ভেতর পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়ছে। ড্রাইভার এক হাতে প্রজাপতি সরাচ্ছে আর এক হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং। গায়ের পোশাক রেণুতে রেণুতে রং-এ রং-এ লাঞ্ছিত। মাইলের পর মাইল একই অবস্থা। যেন একটা প্রজাপতির ঝর্নাধারায় ডুবসাঁতার কেটে চলেছি আমরা। হঠাৎ এক সময় পেছন ফিরে দেখি, সমস্ত পথটির উপর বরাবর চলে আসছে জীপের চাকার দুটি দাগ। কোটি কোটি প্রজাপতি চাপা পড়ার দাগ। দাগ দুটির পাশের দিকে লক্ষ লক্ষ যে সব প্রজাপতির একটি করে ডানা চাপা পড়েছে—তাদের বাকি ডানাগুলো সোজা দাগের পাশে পাশে থরথর থরথর করে কাঁপছে। চাকার ফেলে আসা দাগদুটি এতে বহুদূর পর্যন্ত আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

চা-বাগানের বিলিতি বড় সাহেবও আমার সঙ্গে সঙ্গে পেছন দিকটা একবার দেখেই জীপ থামাতে বললেন। তারপর গাড়ি থেকে নেমে—তাঁর সঙ্গের দামী ক্যামেরায় জীপের চাকায় চাপাপড়া ডানাকাঁপা প্রজাপতির দাগ দুটির অনেকগুলো ফোটো তুললেন। ফরাস্‌বাবু বললেন, 'কি মশাই, এ দৃশ্য জীবনে আর কখনও দেখেছেন?' বললুম—'না'। ফরাস্‌বাবু

বললেন, 'পাঁচ বছর এপথে মানুষ আসে নি। তাই বেচারারা না শিখেছে ভয় পেতে, না শিখেছে চটপট পালাতে।

এ সব ব্যাপারে ডুগরুর কিছুমাত্র উৎসাহ ছিল না। ছেলেটির বয়েস বছব বারো হবে। বাগানের বাংলোর সামনেই প্রথম দেখেছিলুম। একটা বিড়ি টানতে টানতে এসে বাকি অংশটা গেন্দ্রার দিকে ছুঁড়ে দিলে। গেন্দ্রা হাত বাডিযে সেটুকু তুলে টানতে টানতে আমায় বললে,—'এইটা আমার ছেলে আছে।' বিড়িতে আর একটা টান দিয়ে বললে—'এইটাকে এতটুকু কোলে লিয়ে সাবীনা আন্য বাগান থেকে পেলিযে এলো—আউর আমার সঙ্গে সাদি হোলো।' আমি বললুম—'বাঃ তা হলে ও তোমাব বড ছেলে বলো।' গেন্দ্রা বললে, 'হাঁ'। বললে, 'উব একবার ভারি বুখার হয়েছিল। দাবাবাবু উর পেট থেকে চেপ্টামতো, দুহাত একটা সফেদ পোকা বাহার করেছিল। সে পোকাটা একটা বোতালের ভিত্‌রে হাপ্‌সাতাল-মে রেখে দিয়েছে।' কথাটা বলে বেশ গর্ব অনুভব কবেছিল গেন্দ্রা।

আমিও গর্ব অনুভব করেছিলুম। আমাদের সভ্য জগতের সব থেকে বড় সমস্যাটাকে গেন্দ্রা এক তুড়িতে কেমন সহজ করে নিয়েছে। 'ডুগরু গেন্দ্রার বড় ছেলে,'—কথাটা যেন লোকালযেব ভযংকর বিষাক্ত একটা ছোট্ট কীট, এই পবিবেশে, অপূর্ব সুন্দর দুখানি হাল্কা ডানায় ভর ক'রে, নিঃশব্দে আমার সামনে ঘুরে ঘুবে উড়ে বেরিয়েছিল।

প্রজাপতিব বন থেকে ফিবে এসে, কয়েকদিন পবে বাগানের হাটবারে হাটে গিযেছিলুম একজোড়া ময়ূরের ডিম কিনতে। ময়ূর ডিমে তা দেয়না। মুরগী দিয়ে ফোটাতে হয়। হাটে ডিকেন্সের সঙ্গে দেখা। বললুম—'আমাকে চিনতে পারছ ডিকেন্স? ডিকেন্স হাত কপালে ঠেকিযে বললে—'নমস্তে'। বললে, 'হাঁ, পপ্‌লাবাবু', বলে একটু হাসল। বললুম—'তার পরদিন তোমাদের ফযসালা হযে গিয়েছিল?' বললে—'হাঁ, একটা রাত যদি দুটা বৌ দুটা ঘরে বদল হযে থাকবে তো তাতে কী হলো। সোকাল হলে পরে আমরা নিজেরাই সব চিনে লিলুম।' বললুম—'এসব ব্যাপার তোমরা তোমাদের বস্তির সর্দারকেই তো বলতে পারো।'—ডিকেন্স বললে, 'সর্দার কী করবে। উব বিচার তো আমাদের জানা আছে। উ বলবে,

আজ রাত দুটা ভাই একটা ঘরে থাকবি। আউব একটা ঘবে বৌ থাকবে। আউর সাবীনাটাকে উ লিয়ে যাবে উর নিজের ঘরে। সকাল বেলা গেন্দ্রা কুছু বলবে—তো উ বলবে—তুকে মরদ্ কবে দিবো, মানিজাব বাবুকে বোলবো—যেমন কাজটা জলদি হয়। ব্যাস্—এই সব। আউর জাদা কি কোরবে।'

মনে মনে ভাবলুম, আব তখন একটা ডানা-চাপা-পড়া প্রজাপতির মত গেন্দ্রার বাকি ডানাটা ওড়ার চেষ্টায় থথব থথর করে কাঁপতে থাকবে।

আমি ওখান থেকে চলে আসার কদিন আগেই চা-বাগানের বিলিতি বড় সাহেব সাগরপারে তাঁব নিজের দেশে চলে যান। যাবাব সময় ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর নিজের ঘরে ডেকে দাবাবাবুকে তাঁর সেই দামি ক্যামেবাটা দিয়ে চলে যান। যন্ত্রটির ব্যবহাব দাবাবাবুর মোটেই রপ্ত ছিল না। আমাকে একদিন বললেন, 'মোশাই দেখুন তো, এতে কয়েকটা ছবি তুলে এটি ব্যবহারের কাযদাটা আমায় একটু শিখিযে দিতে পারেন কিনা!' বলছিলেন, 'সাহেবদের খেযাল, হঠাৎ একেবারে বাড়িব অন্দরমহলে ডেকে নিযে বললে, এই ক্যামেরাটি আমি তোমায় দিয়ে গেলুম। অবিশ্যি ওর বাড়ির অন্দরমহলে, একমাত্র আমিই বোধহয়'—একটু থেমে, একটু হেসে ডাক্তারবাবু বললেন, 'এর আগে আরও বহুবার গেছি।'

আমি ওখান থেকে চলে আসার দিন ভাবছিলুম, ঐ কাঁঠাল গাছটির তলায সাবীনা যে ভাবে এসে দাঁডায ঠিক তেমনি ভাবে তার একখানি ফোটো তুলে রাখলে বেশ হতো। হঠাৎ বাইরের দিকে তাকিয়েই দেখি, ঠিক তেমনিভাবে, ঠিক সেই কাঁঠাল গাছের তলায, সাবীনা দাঁড়িয়ে।—গোলপানা ঠোঁট, চিবুকটি কচিকচি, ভগবান-শিল্পী বড়ই নিপুণ ভাবে গডেছেন। আমাকে ওর দিকে তাকাতে দেখেই ও মাথা নিচু করে নিলে। আমিও মাথা নিচু করলুম। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভাবলুম, এক কাজ কবলে হয়, বরং আমার নিজের একখানা ফোটো গেন্দ্রাব কাছে দিয়ে গেলে হয। গেন্দ্রা সেটি নিশ্চযই সাবীনাকে দেখাবে, আর সাবীনা তার ভেতর থেকে দেখবে চিরকুকে, ধর্মের চাকার তলায় চাপাপড়া ডানাটা একটু হযতো হাল্কা লাগবে ওর।

বাইরে থেকে ডাক এল—'দাবাবাবু'। তাকিয়ে দেখি কাঠের সিঁড়ির

সামনে দাঁড়িযে সাবীনা। ডাক্তারবাবু বাইরে এলেন। বললেন—'কীরে—।' সে এক টুকরো ভাঁজকবা কাগজ ডাক্তারবাবুর হাতে দিয়ে একটু সলজ্জ হেসে চলে গেল।

টুক্‌রো কাগজটুকুর লেখাটুকু দেখে নিয়ে একটু পরে ডাক্তারবাবুই বললেন, 'ও যে কী দিযে গেল তা ও নিজেই জানে না। ওকে দিতে বলেছে তাই ও দিয়ে গেল।' বলে কাগজটুকু আমাব হাতে দিলেন। ইংরিজিতে লেখা ছোট্ট একটুকরো চিঠি। তাতে লেখা—'প্রিয় ডাক্তার, তোমাকে আমার ক্যামেবাটি দিয়েছি,—একে দিয়েছি আমার যে ব্যাধির তুমি চিকিৎসা করেছিলে। সম্ভব হলে পূর্বাহ্লেই চিকিৎসা কোরো—এই অনুরোধ। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি।'

এককালীন ১০০৲ টাকায় 'পরিচয়'-এর আজীবন গ্রাহক হতে চাইলে অবিলম্বে টাকা পাঠান। ১৯৬৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সুবিধার মেয়াদ সাব্যস্ত হয়েছে।

ডোরাকাটার অভিসারে

শের জঙ্গ

লোকে নিযতির অভিসারে যায় শুনি। আমার অভিসার বাঘের সঙ্গে। কথাটা আরও সঠিক হয়, যদি বলি—আমার এই অভিসার আমার জন্মসূত্রে ঠিক হয়েই ছিল। যেমন আমার কোনো হাত ছিল না আমি ছেলে হয়ে জন্মাব, না মেয়ে হয়ে জন্মাব—সেটা ঠিক হওয়ার ব্যাপারে।

কথাটা একটু গালভরা শোনাল। কিন্তু সে ভেবে আমি বলি নি। কেননা বাঘশিকার জিনিসটা আমার রক্তে; আমাদের বংশে অনেকদিন থেকেই এর রেওযাজ—তা প্রায় বেশ কযেক পুরুষ ধ’রে তো বটেই।

আমাব পূর্বপুরুষদের বাঘশিকারের যে কি রকম বাতিক ছিল, তা বোঝা যাবে তাঁদের রেখে-যাওযা নিদর্শনগুলো দেখলে—সেকালের সেই ঘোড়া-

●

লেখক

ইংরেজি উর্দু হিন্দী—তিন ভাষাতেই লেখেন। বাবা ছিলেন দেশীয রাজ্যের দেওযান। বিলেতের স্যাণ্ডহার্স্ট স্কুল থেকে পাশ করে শেষ পর্যন্ত ভগৎ সিং-এর দলে যোগ দিয়ে ধরা পড়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ফাঁসি মকুব হযে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয। পরে দেউলি বন্দীনিবাসে থাকার সময় কমিউনিস্ট হন। স্বাধীনতার পর কর্নেল হিসেবে কাশ্মীরে যুদ্ধ করেন। পরে গোয়ায আত্মগোপন করে থেকে সশস্ত্র মুক্তিবাহিনী সংগঠিত করেন। ‘ডোরাকাটার অভিসারে’ তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ ‘ট্রস্ট্ উইথ টাইগার’-এর অনুবাদ। ‘পরিচযে’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

●

আটকানোর ব্যবস্থাওয়ালা গাদা বন্দুক থেকে শুরু ক'রে ফ্লিন্ট-লক, ক্যাপ-লক পর্বের ভেতব দিযে ব্রীচ-লোডিং খরবেগ সম্পন্ন কর্ডাইট রাইফেল পর্যন্ত—কিছু বাদ নেই। বাঘকে ধাওযা করার এই নেশা, এ আমি তাঁদের কাছ থেকেই উত্তবাধিকারসূত্রে পেযেছি—বিশেষ করে, আমার বাবার কাছ থেকে। আমার বাবা ছিলেন মস্ত শিকাবী। শিকাবী বলতে, প্রাণীহন্তা নয়। বাবা ছিলেন বন্য জীবজন্তু সংরক্ষণের একজন বড পাণ্ডা—এমন একটা যুগে, যখন জন্তুর চামডা টাঙানো আর মাথার খুলি গোণা, এ দুইয়েরই খুব চল ছিল।

ছিল গরুর গাডি, আর আজ দেখুন জেট প্লেন। আদি ও অকৃত্রিম অরণ্য থেকে জগৎ আজ কত দূরে সরে এসেছে। এখন সেখানে ষোডশোপচারে কলকারখানা আর যন্ত্রকুশলতার কত প্রসার হয়েছে। আজ সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। এ থেকেই বোঝা যায়, বড বড জানোয়ার শিকার বলতে আমরা যা বুঝি, তার দিন গত হয়েছে।

আজ কোনো অস্তিত্ব থাকছে না আর—না বন্য জীবজানোয়ারের, না বনের। গৃহস্থের গরুছাগলে গাছপালা ঘাসদুর্বো এমনভাবে মুডিয়ে মুডিয়ে খেযে চলেছে যে, ওপরকার ভূমিস্তর খোয়াইতে গ্রাস করে ফেলছে। পরিবেশের সঙ্গে বোঝাপডায় আসতে মানুষ অপারগ হওয়ায় জলহাওয়াকে জলহাওয়াই পালটে যাচ্ছে। যে জায়গায বন ছিল, আমরা সে জায়গায় বন উজাড করে দিচ্ছি—সেইসঙ্গে বনের জীবজানোযারদেরও উচ্ছন্নে পাঠাচ্ছি। মানুষ গত পঞ্চাশ বছরে স্তন্যপায়ী গোষ্ঠীর আটত্রিশটি—আমি আবার বলছি, আটত্রিশটি—প্রজাতিকে এবং প্রায ঐ একই সংখ্যক পাখিকে মেরে মেরে শেষ করে ফেলেছে। আরও অনেক পশুপাখি দুনিয়ায লোপ পেতে বসেছে। বনের পশুপাখি আর বন উজাড করার ব্যাপারে আমরাও এদেশে কম যাই না। এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই আমাদের হাতে স্তন্যপাযী প্রাণীদের দশটি এবং পাখিদেরও দশ দশটি প্রজাতিকে আমরা লুপ্ত অথবা লুপ্তপ্রায করে ছেডেছি। পঞ্চাশ বছর আগে এদেশে যেখানে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার বাঘ ছিল, আজ সেখানে বাঘের সংখ্যা দাঁডিয়েছে সর্বসাকুল্যে চার হাজারের বেশি নয়। হিমালযের তরাইযের জঙ্গল আর পূর্বঘাট-পশ্চিমঘাটের অরণ্য—এই সব বৃক্ষবহুল বনজঙ্গল মাত্র বছর কুডির মধ্যে আমাদের একপুরুষেই একেবারে ঢালাওভাবে উজাড করা হযেছে—যা ফুরিযে ফেলতে আমাদের পূর্বপুরুষদের দু শতাব্দী

লেগে যেত। প্রকৃতির জীব-উদ্ভিদের যে উত্তরাধিকার আমরা পেয়েছিলাম তার একটা বড অংশ আমবা ফুঁকে দিযেছি।

এর একটা বিহিত করা দরকার। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কথা ভেবে, আসুন আমরা ইতিমধ্যেই হ্রাস-পাওযা বনের প্রাণিকুল আর গাছপালা রক্ষা করি। নইলে আমাদের সেই অনাগত বংশধরদের বেডাবার মত বনজঙ্গল কিংবা দেখে চেনবার মত জানোয়ার—দুটো থেকেই আমরা তাদের বঞ্চিত করব।

ধ্বংসেব এই তাণ্ডবলীলা সত্ত্বেও এখনও এদেশে প্রচুর বনজঙ্গল আর জন্তুজানোযার আছে। সবসুদ্ধ আছে স্তন্যপাযীদের পাঁচ শো, পক্ষিকুলের তিন হাজার আর কীটপতঙ্গদের জানা তিন সহস্রাধিক প্রজাতি। আসুন এদের আমরা অভয় দিই, বনজঙ্গল রক্ষা করি। এটা দরকার শুধু বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্যেই নয়, মানুষেরও এতে বাঁচার উপায হবে।

শিকারে আনন্দ মেলে—যদি তা আমাদের ভেতরকার পশুত্বের রক্তপিপাসা মেটাবার উদ্দেশ্যে না হয। প্রথমত, যদি জীবজন্তুর স্বভাব-চরিত্র আর আস্তানা সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ হয়; দ্বিতীয়ত, যদি বুনো জানোয়ারদের ভেতরকাব মারাত্মক অংশটাকে নিকেশ করার জন্যে হয়—তবেই শিকাবে গিযে আনন্দ। এটা সব সময়েই করতে হবে কাটা-ছাঁটাব বিচক্ষণ মনোভাব নিয়ে—মত্ত হাতির মারমুখো মনোভাব নিযে নয়। শিকারীর বন্দুক হল অস্ত্রোপচারকের ছুরির মত—যাতে যথাসম্ভব কম ক্ষয়ক্ষতি করে ফালতো অংশটাকে বাদ দেওয়া যায়। বন্দুক যেন দুর্বৃত্তের বেপরোযা হাতের অস্ত্র না হয। কে কোন্ ধাতুতে গডা, কে কত চৌকস—তা জঙ্গলে গেলে ধরা পডবে। জঙ্গী অভিযান আর পাইকারী খুনের জন্যে নয়—বন হয়েছে ব্যক্তির বুকের পাটা দেখাবার জন্যে। যার যে জায়গা, তাকে সেখানেই জঙ্গলবিদ্যার কৌশলে কাত করা—সেখানেই শিকারের মজা। আপন-বাঁচাকে মুখ্য না করে যে গৌণ করবে—বলা যাবে আত্মরক্ষার গুপ্তবিদ্যায় সে পারঙ্গম হয়েছে। শুধু শিকারে নয়, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই নীতি সব সমযই আমার কাছে খুব লাভের হয়েছে।

আমি যে ধরনের শিকার পছন্দ করি, তাতে দরকার জন্তুজানোযারদের চালচলন আর স্বভাবচরিত্র জানা এবং বনবিদ্যা আয়ত্ত করা। এ কথা মনে

রেখে, এই বইয়ের জন্যে আমি শুধু এমন সব গল্পই বেছেচি যাতে বনবিদ্যা অথবা জন্তুজানোয়ারদের চালচলন ও স্বভাবচরিত্রের ব্যাপারটা অল্পবিস্তর ফুটে উঠেছে। এটা করতে গিয়ে জায়গায় জায়গায় কোনো কোনো কথা খোলসা কবার জন্যে আমি হয়ত একটু বাগ্‌বিস্তার করে ফেলেছি, কোথাও কোথাও মাঝখানে হঠাৎ গল্প থামিয়ে জন্তুজানোয়ারের ব্যবহারেব কোনো একটা দিক সম্বন্ধে-আমার মতামত ব্যক্ত করেছি। আমাব মতামত কোথাও কোথাও পণ্ডিতম্মন্য শোনাবে, জায়গায় জায়গায় বিতর্কেরও সৃষ্টি করতে পারে এবং এইভাবে লেখার ফলে কোথাও কোথাও গল্পের তাল কেটে গিয়ে থাকতে পারে। তবে এ সমস্তই যে ভাব নিয়ে আমি অনুপ্রাণিত হয়ে এই বই লিখেছি—তাব সঙ্গে খাপ খায়। আমি চাই ক্রীড়াকৌতুকের এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে পাঠকদের আমার অর্জিত সমস্ত অভিজ্ঞতার ভাগীদার করতে। আমার ছেলে আর তার বয়সীদের সঙ্গে নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা ত্রিশ বছরেরও বেশি দিনের।

আমি নিজেব কথা বলতে পারি। জঙ্গলে যে আনন্দ, তার বিনিময়ে দুনিয়ায় রাজার হালে থাকার লোভও আমি স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দিতে রাজী। আমাকে যখন স্বর্গে পাঠানো হবে আমি চাইব একটা রাইফেল আর একজোড়া হান্টিং বুট—অপ্সরা-অপ্সরী থাকল না-থাকল, তাতে আমার ভারি বয়েই গেছে।

বাঘ

বাঘ। 'বাঘ' বললেই একেক জনের মনে একেক রকমের ছবি ফুটে ওঠে। বাঘের মধ্যে কেউ মাত্রা চড়িয়ে দেখেন চরম হিংস্রতা, কেউ বা অবিমিশ্র সৌন্দর্য। আমার মনে পড়ে যায় ছেলেবেলাকাব এক অপরূপ স্মৃতি—বন্য প্রকৃতির কোলে জীবনে যেদিন সেই প্রথম আমি এই রাজকীয় প্রাণীটিকে দেখি।

দিনটা ছিল শীতের। তকতকে ঝকঝকে আকাশ। ছুরির ফলার মত ধারালো দমকা হাওয়া। লোহ্‌গর-খোল উপত্যকার ক্রমসূক্ষ্ম ভূখণ্ডে তখন দিনের আলো সবে নিভে আসছে। শিবলিক পর্বতমালাব পাদদেশের এই জায়গাটাতে কুখ্যাত এক গোহন্তা বাঘের সন্ধানে এসে বাবা আড্ডা গেড়েছেন। আমি তাঁর সঙ্গ নিয়েছি ফুর্তিতে তোফা মাঠেঘাটে ঘুরব বলে—একঘেয়ে স্কুলে যেতে ভালো-না-লাগাটাও হয়ত তার কারণ ছিল।

আনকোবা নতুন সিঙ্গ্‌ল্‌-শট রাইফেলটা একবার পরখ করে দেখবার জন্যে একে আমার হাত নিস্‌পিস্‌ করছিল, তার ওপর দু পা যেতে পারলেই বনমোরগের দেখা পাই। সুতরাং রাইফেলটা নিযে এক ফাঁকে আমি তো বেরিয়ে পড়লাম। আমার সঙ্গে মহা উৎসাহে গুটি গুটি চলল আমার ছাযাসহচর প্রিয়সখা ডিউক। আমার এই ফক্সটেবিযার কুকুরটি ছুটে গিয়ে শিকার কুড়িযে আনার ব্যাপারে খুব তুখোড়।

আমাদের তাঁবুর কাছের ভ্যালীটা ক্রমশ সরু হয়ে গিয়ে পড়েছে কুপীমতন দেখতে নদীর খাতে। খাত বরাবর নুড়ির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পুরো একশো হাতও যাই নি, একটা বাঁকেব মুখে এসে পডলাম। দেখি একটা গর্তে টলটল করছে কাঁচের মত স্বচ্ছ জল। নদীর খাতকেই বলে 'খোল'। খোলটা ষাট হাতের বেশি চওডা নয়। প্রায় পুরো জায়গাটাই আগাগোডা সমান, সেখানে দৃষ্টি আডাল করবার মতন কিছু নেই। জাযগাটার দু পাশে একটানা ক্ষয়া-খর্বুটে পাহাড, শুধু বাঁ-পাডে খানিকটা ফাঁক।

আমি ডানদিকের পাডে উঠে গর্তটার হাত বিশেক দূরে একটা করণ্ডা ঝোপের আডালে গিয়ে লুকিয়ে থাকলাম। ডিউক আমার পাশে মাটিতে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে কানদুটো খাডা করে রইল—কেননা বনমোরগের দল কঁকর কঁকর করতে করতে, একটু যেন পা-টিপে পা-টিপে জলের জাযগাটাতে আসছিল। কোনো একটা ব্যাপারে বন থেকে বেরিয়ে আসতে তাদেব বাধো-বাধো ঠেকছিল। ডিউকের দেখাদেখি আমিও একেবারে নিঃসাডে নিজের জাযগায বসে।

হঠাৎ বনমোরগদের মধ্যে একটা তুমুল কলরব পডে গেল—হৈচৈ করে পাখা ঝপ্‌টাতে ঝাপ্‌টাতে তারা পাহাডটা টপ্‌কে চলে গেল। আমার তখন কী মন খারাপ। আমি খুব মুষডে পডেছি, এমন সময দেখি ডিউক আমার গায়ে গা ঘষছে। আমি ওর মধ্যে ভীষণ একটা ছটফটে ভাব, কেমন একটা অস্থিবতা লক্ষ্য করলাম—যা এ ধরনের সুশিক্ষিত কুকুরের মধ্যে বড একটা দেখা যায় না। আমি ডিউকের পিঠে হাত রাখলাম—আশ্চর্য, ডিউকের সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। ডিউককে নিযে আমি মহা চিন্তায পডলাম। ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ও না কেঁপে থাকতে পারছে না

আর আতঙ্কে চোখদুটো গোল-গোল করে একদৃষ্টে খোলের ওপারে চেয়ে আছে। আমি ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখি নালার মুখে দুটো পাহাড়ের মাঝখানের ফাঁকটাতে অস্তোন্মুখ সূর্যের পাণ্ডুর আলোয় সামনের দিকে খাটো হয়ে আমাদের একেবারে মুখোমুখি একটা প্রকাণ্ড মূর্তি লম্বা বিশাল বপু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—আমার কুকুরের ভড়কানোর সেই হল কারণ। তাকে দেখে মনে হল, আবছায়া গোধূলির কঠিন দেয়ালে আমার সামনে কেউ যেন আলোছায়ায় বড় ক'রে একটা ভারি সুন্দর প্রাচীরচিত্র এঁকে রেখেছে।

গোধূলির সোনায় কালোয় নিজের গায়ের সোনা-কালো রং ফেলে মূর্তিটা কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, তারপর মাথাটা নীচের দিকে ঝুলিয়ে, শরীরটাকে ধনুকের মত বেঁকিয়ে খোলের ভেতর সাঁ করে ছুটে গেল। এক মুহূর্ত লাগল ওটা কার মূর্তি সেটা বুঝতে, ওর চলনের সুঠাম ছন্দ আর দেহের মসৃণ রেখা ছাড়া আর কিছুই তখন আমি অনুধাবন করি নি। মূর্তিটা যখন খোলের মাঝ বরাবর এসেছে, একমাত্র তখনই আমার মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল—ওটা বাঘ।

সোজা হেঁটে আমাদের কাছাকাছি জলের জায়গায় এল, কিছুক্ষণ থম্‌কে দাঁড়াল, চারদিক দেখল, তারপর আস্তে আস্তে, যেন রোদ-চিকদিক মেঘের মত, সে যে কী সুন্দরভাবে তার দেহটা নুইয়ে শান্ত নিথর জলে গোঁফসুদ্ধ মুখটা ডুবিয়ে দিল বলবার নয়। আমাকে ঘিরে বাঁকানো ধনুকের মত টান-টান হয়ে আছে ঘনায়মান সন্ধ্যা, আর আমি যেন টান দেওয়া ছিলার ওপর সামলানো তীরের মত ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসে আসন্ন ওড়ার আবেগে কাঁপ্‌ছি।

বাঘটা অনেকক্ষণ ধরে চকচক করে পেট ভরে জল খেল আর আমি প্রাণ ভরে দেখলাম পৃথিবীতে কোটিকে গোটিক সেই দৃশ্য। আর তারপরই, সটান উঠে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড মাথাটাকে ঝাঁকালো, তারপর নীচেকার ঠোঁট বেয়ে ঝুর ঝুর করে জল পড়তে পড়তে সন্ধ্যার অন্ধকারে সে মিলিয়ে গেল—তাকে আমার মনে হল স্বপ্ন।

আমার মনে প্রাণে আনন্দের সে কী পুলক। আমার সমস্ত সত্তা জুড়ে আমি অনুভব করেছিলাম কী অনির্বচনীয় উন্মাদনা। কটা দিন বাঘের

কথা ছাড়া আর কিছুই আমার মনে স্থান পায নি। আর এদেশেব বনের সেই বাজার সম্মোহন আজও আমি কাটিযে উঠতে পারি নি।

তুনিয়ায বাঘের মত আর কোনো প্রাণীই মানুষের কল্পনারাজ্যকে এভাবে অধিকার করে থাকে নি। এদেশে বাঘ এমনভাবে আমাদের মন জুড়ে রযেছে যে, শুধু ছেলে-ভুলানো ছড়া আর লোককথাতেই নয—আমাদের চিরাযত সাহিত্যেও বাঘের নাম পাওয়া যাবে। আমাদের দেশে 'শের' আর 'সিং' দিযে আছে আকছার নাম; মন্দিবে মন্দিরে মা-কালীর যে মূর্তি, সেখানেও বাহন বাঘ।

বাঘের সৌন্দর্যে আর বলবত্তায কবিরাই শুধু মুগ্ধ হন নি। আমাদের প্রাচীন যুগের আলঙ্কারিকেরাও বাঘের সন্তর্পণে সচ্ছন্দ রমণীয পদচারণার প্রশস্তিতে একটি ছন্দের নাম দিযেছেন : শার্দুলছন্দ।

আস্তানা

ককেশাস থেকে শুরু করে উত্তর পারস্য, ভারত, বর্মা আর মালয় উপদ্বীপ হয়ে ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন, মাঞ্চুরিযা, আমুরভূমি আর কোরিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ জুড়ে বাঘের বসবাস।

এদেশে জঙ্গলেব রাজাধিরাজ বলতে বাঘ। অনেকের বিশ্বাস, এদেশে এসে বাঘ আস্তানা গেড়েছে অনেক পরে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের ধারণায, শেষ তুষার যুগেব পর উত্তর এশিযা থেকে এদেশে বাঘের পত্তন হযেছে। তাঁরা বলেন, চীনের ভেতর দিয়ে হিমালয় পর্বতমালার পূর্ব-প্রান্ত হযে তারা উত্তরপূর্ব ভারতে এসে ঢুকেছে। মধ্যে সমুদ্র পড়ায তারা সিংহলে যেতে পারে নি। মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার আগে সিংহল এককালে ভারতের সঙ্গে যুক্ত ছিল, ভূতত্ত্বের দিক থেকে তার প্রমাণ আছে। সুতরাং সিংহল দ্বীপ গড়ে ওঠবার পরে বাঘ এদেশে এসেছে।

এদেশ আজ বাঘের প্রধান বাসভূমি। হিমালয থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বড় বড় অরণ্যে আর আগাছার জঙ্গলে তারা কোথাও কম আবার কোথাও বা ভিড় করে আছে।

হিমালয অঞ্চলে সাগরাঙ্ক থেকে সাত-আট হাজার ফুট উঁচুতেও বাঘের হদিশ মেলে। কিন্তু আফগানিস্থান আর বেলুচিস্থানে বাঘের কথা শোনা যায় না।

এদেশের ভূ-প্রকৃতিতে দু ধরনের বাঘ দেখা যায়: পাহাড়ী এলাকার গোলগাল মোটাসোটা বাঘ আর সমতল-ভূমির ঘাসজঙ্গলের দীর্ঘদেহী, কিছুটা সিড়িঙ্গে ধরনের বাঘ।

শেষের ধরনটাকে ভুলভাবে রয়াল বেঙ্গল টাইগার বলা হয়। নেপাল আর উত্তর প্রদেশের তরাইতে, আসামের দক্ষিণখণ্ডের পাহাড়গুলোতে, সুন্দরবনে, বর্মায় এই বাঘ দেখতে পাওয়া যায়। প্রায় হাজার দেড়েক মাইল জোড়া ঘাসজমি আর শালবনে ঘেরা এই বিশাল ভূখণ্ডটি পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো শিকারের জায়গা। বাঘেরও এটাই সবচেয়ে যুতসই আস্তানা।

তরাইয়ের পরেই বাঘের জন্যে মধ্য ভারতের বনজঙ্গলের খ্যাতি। উত্তরে রেওয়া, দক্ষিণে চণ্ডা আর দণ্ডকারণ্য (বস্তার) এবং পুবে উড়িষ্যা আর ছোট নাগপুর থেকে পশ্চিমে গোয়ালিয়র আর হোসাঙ্গাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত শালসেগুনের এই বনাঞ্চল।

তারপর আসে মহীশূর, কোঙ্কন, মালাবার, নীলগিরি আর পশ্চিমঘাট জুড়ে দক্ষিণ ভারতের বনজঙ্গল। এসব বনে, বিশেষ করে মহীশূর আর মালাবারের জঙ্গলে, খুব বেশি রকম বাঘের পদার্পণ ঘটে।

পূর্ব ঘাটের জঙ্গলেও বাঘ দেখা যায়, তবে সংখ্যায় খুব কম এবং আকারে আর রঙে তেমন দর্শনীয় নয়।

গুজরাটে বাঘ যা আছে তা বলবার মত নয়। সামান্য যা আছে তাও আকারে ছোটখাটো। গুজরাটের গির অরণ্যে অবশ্য সিংহ আছে—যা এখন এদেশে আর কোথাও নেই। সেখানে বাঘের চেয়ে সিংহের খাতিরই বেশি।

লাগাও এলাকা রাজস্থানে আজও প্রচুরসংখ্যক বাঘ দেখা যায়। সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও উদয়পুর, জয়পুর আর আলওয়ারে প্রায়ই বাঘ দেখতে পাওয়া যায়। দৈর্ঘ্যে কম হলেও এখানকার বাঘগুলো ভারী বহরের এবং মাথায় কিছুটা বড়।

এক সময় যে সব জায়গায় ছিল বাঘের অপ্রতিহত প্রতাপ, সে সব জায়গায়ও এই অতি সুন্দর দামী জানোয়ারটির টেঁকা ক্রমশ দুষ্কর হয়ে পড়ছে। খেতখামারের প্রসার, বন আর বনের বাসিন্দাদের সম্বন্ধে রাষ্ট্রের বেদরদী মনোভাব এবং এদেশের লোকজনদের উপেক্ষার ভাব—এই সব কিছুর ফলে বনের পশুদের জীবনে সর্বনাশ নেমে এসেছে। যেমন ধরুন, ব্রহ্মপুত্রের যে

চরগুলোতে আগে বন্যজন্তুর ছড়াছড়ি ছিল—এখন সে সব জায়গা ফাঁকা। মেরে মেরে বাঘ উজাড় করা হয়েছে। স্যার স্যামুয়েল ডব্লু বেকার লিখেছেন, গত শতাব্দীর শেষে ধুবড়ির কাছারিতে কিছুদিন অন্তর অন্তর আট আনায় বাঘের চামড়া বিক্রি হত।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের কড়চা থেকে জানা যায়, সেকালে কাংড়া শিবলিক অঞ্চলের জঙ্গলগুলো এত ঘন ছিল যে, তার ভেতর পাখিরা ডানা মেলতে পারত না। মানুষ সেই জঙ্গল কেটে কেটে সাফ করে ফেলেছে। আজ সেই পাহাড়ী জায়গা বেবাক ন্যাড়া; এখানে সেখানে কিছু ঘাসের চাপড়া আর কাঁটাঝোপ কোনোরকমে টিঁকে আছে। তেমনি হাঁড়ির হাল হয়েছে আজ বহির্হিমালয় অঞ্চলেরও।

'জার্নাল অব দি বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি' (২৭ তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৩, ১৯২০) পত্রিকায় শ্রী এন. বি. কিন্নেয়ার তখন কোথায় কত সিংহ ছিল সে সম্বন্ধে একটি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখছেন, '…সিন্ধু, বাহাওয়ালপুর আর পাঞ্জাবে সিংহ মেলে…।' পূর্বাঞ্চলের দিকে '১৮১৪ সালে বিহারের পালামৌ জেলায় একজন নিহত হওয়ার সংবাদ আছে।…১৮৩২ সালে একজন মারা পড়ে বরোদায়।…আমেদাবাদের আশপাশে সিংহ প্রায়ই দেখা যেত। মধ্যভারত ছিল সিংহের একটা মস্ত আস্তানা।…মিউটিনির সময় জর্জ অক্ল্যাণ্ড স্মিথ তিন শতাধিক ভারতীয় সিংহ হত্যা করেন এবং তার মধ্যে পঞ্চাশটা মারেন দিল্লী জেলায়।…সে সময় এদেশে কত সিংহ ছিল এ থেকে খানিকটা আঁচ পাওয়া যায়।"

১৮৮৫ সালের ৩০শে জুনের 'এশিয়া' পত্রিকায় কর্নেল মার্টিনের এক লেখায় জানা যায়, তিনি এবং জেনারেল ট্র্যাভার্স্‌ ১৮৬০ সালে গোয়ালিয়রের গুনার পশ্চিমে এক পাহাড়ে দুটি সিংহ মারেন এবং দুবছর পরে তিনি এবং কর্নেল বিডন্‌ গুনার উত্তর-পশ্চিমে সত্তর মাইল দূরে পাটুলঘরে কমপক্ষে আটটি সিংহ মেরেছেন।

আজ সেখানে ভারতে সিংহের মোট সংখ্যা এসে ঠেকেছে মাত্র তিন শো-তে। তাও এখন তাদের পাওয়া যায় শুধু গুজরাটের কাথিয়াবাড় অঞ্চলের গির অরণ্যে। পূর্বাঞ্চলের হিমালয়ের পাহাড়তলীতে গণ্ডার মিলবে পুরো দু-শোও হয়ত নয়।

এদেশের আরও নানা পশুপাখি দ্রুত লোপ পেয়ে যাচ্ছে—যেমন : সানগাই (থামিন), কস্তুরী মৃগ, কৃষ্ণসার, হাঙ্গল (কাশ্মিরী হরিণ), ঘোড়খাড় (ভারতীয় জংলী গাধা), তুষার চিতা (আউন্স), পিগমী বা বামন শুয়োর, ঘোডার (ভারতীয় বাস্টার্ড), গোলাপীমাথা হাঁস ইত্যাদি।

করুণা আর মৈত্রীর জন্যে যেদেশের এত গর্ব, সেদেশের মানুষ আর সরকারের পক্ষে এটা লজ্জার কথা। আমাদের শাস্ত্রপুরাণে পশুপাখি সসম্মানে স্থান পেয়েছে। গরুকে ভগবতী আর হনুমানকে মহাবীর জ্ঞানে আমরা পুজো করি। কিন্তু আজ বনের জীবকে যেভাবে আমরা হতশ্রদ্ধা করছি, তাকে নির্মম পরিহাস বলতে হবে।

সমসাময়িক কালের যে বর্ণনা কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্রে' (খৃষ্টপূর্ব ৩২১-২৯৬) দিয়েছেন, তাতে জানা যায় এদেশে বন আর বনের বাসিন্দাদের রক্ষার জন্যে রীতিমত আইনের দণ্ডবিধি ছিল। তা থেকে অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি :

"যেসব মৃগ, পশু, পক্ষী ও মৎস্য রাজাদেশে অভয়লাভের পাত্র বলে ঘোষিত হয়েছে, যারা রাজকীয় সর্বাতিথিবনে বাস করে—কেউ তাদের ফাঁদে ফেললে, মারলে এবং পীডন করলে তাকে উত্তমসাহসদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

"গৃহস্থেরা অভয়বনে অনধিকার প্রবেশ করলে তাদের মধ্যমসাহসদণ্ড দেওয়া হবে।...

"জ্যান্ত পশুপাখির একষষ্ঠাংশ অভয়বনে ও সর্বাতিথিবনে ছেড়ে দেওয়া হবে।...

"হাতি, ঘোড়া, মানুষ, বৃষ ও গর্দভের আকৃতিবিশিষ্ট প্রাণী, পুকুর, সরোবর, খাল আর নদীর মাছ, তাছাড়া ক্রৌঞ্চ, উৎক্রোশক, কোকিল, হাঁস, চক্রবাক, জীবঞ্জীবক, ভৃঙ্গরাজ, চকোর, ময়ূর, শুক আর মদনসারিকা আর সেই সঙ্গে অন্যান্য মঙ্গল্য প্রাণী—তা সে পশুই হোক আর পাখিই হোক—এদের মারণ-পীডনের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

"কেউ এই রক্ষাকর্মের বিরুদ্ধাচরণ করলে তাকে প্রথমসাহসদণ্ড দেওয়া হবে।..."

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মাছ, পশু, পাখি আর বনজঙ্গল সুরক্ষিত করার উপদেশ দিয়ে অশোকের পঞ্চম অনুশাসনে লেখা হয়েছে। আমরা যারা

অশোকচক্র আর ত্রিসিংহ মূর্তি দিয়ে পতাকা বানিয়েছি, দুঃস্থ বনের জীব আর অরণ্য সম্পর্কেও আমরা চরম অবজ্ঞা দেখিয়ে এসেছি।

আজ বাঘেরও অভয় দরকার। বন আর বনের জীবদের রক্ষা করতে পারলে তবেই তাদের আমরা বাঁচাতে পারব। যদি আমরা তা না করি, তাহলে এমন সুন্দর প্রাণীরও লুপ্তপ্রায় সিংহের দশা হবে।

গড়ন আর গায়ের রং

যাকে বলে মাংসাশী, বাঘ সেই জাতের প্রাণী। প্রাণহননের ক্ষমতা যেমন তাদের প্রচণ্ড, তার উপায়টা তেমনি সাদামাঠা। দাঁত-টাত হজম-টজমের অতসব ভজকট নেই। স্রেফ গোটাকয়েক কাঁচির মত দাঁত আর বাঘা বাঘা শ্বদন্ত—শ্বদন্তটা শিকার ধরা আর তারপর দাঁত বসিয়ে দফা নিকেশ করার জন্যে—সেই সঙ্গে কোঁৎ করে গেলা যায় এমনিভাবে মাংস টুকরো টুকরো করে কাটার জন্যে কাঁচির মত দাঁত। বাঘের পাকস্থলী বলতে নিছক একটা থলি—তাতে আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠ নেই; অন্ত্র ছোট্ট—শরীরের মাপের চেয়ে খুব বেশি হলে তিনগুণ দীর্ঘ।

বাঘ তার চোয়াল আড়াআড়িভাবে নাড়াতে পারে না। নীচের চোয়ালের গোলগাল অস্থাস্থি এত বেশি চ্যাটালো এবং কোটরের সঙ্গে এমন ভাবে লাগসই যে, উপর-নীচে কাঁচির মত ভঙ্গীতে ছাড়া অন্য কোনো দিকে নাড়ানো যায় না।

বিড়ালগোষ্ঠীর প্রাণীদের আরেকটি বিশেষত্ব হল তাদের নখ ঢেকে রাখার ক্ষমতা। শিকার পাকড়াবার দিক থেকে বাঘের পক্ষে দাঁতের মতই জরুরী তার নখ। নখ যেন সব সময় ধারালো থাকে, যেন চোট খেয়ে ভোঁতা না হয়। বাঘের মাংসপেশীগুলোর সন্নিবেশ এমন যে, মাটিতে নখাগ্র না ঠেকিয়ে বাঘ তার নরম থাবা মেলে নিঃশব্দে হেঁটে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, ছুটে গিয়ে শিকার ধরতে হয় না ব'লে বাঘের পক্ষে ভালো করে মাটি আঁক্‌ড়ে চলবার জন্যে নখের সাহায্য লাগে না। বাঘ চুপিসাড়ে গিয়ে শিকার ধরে, তার জন্যে গতিবেগের চেয়েও তাকে বেশি নির্ভর করতে হয় নিঃশব্দে পা টিপে চলার ওপর। বাঘের শিকারপদ্ধতিতে পায়ের আঙুলের চেয়ে ঢের বেশি প্রাধান্য পায় থাবার মাংসল অংশ।

যেসব জানোয়ার ওত পেতে শিকার করে, হঠাৎ চম্‌কে না উঠলে অথবা

ঠিক লাফিয়ে পড়বার মুহূর্তে ছাড়া, তাদের নখ কখনও মাটিতে ঠেকে না—সেইজন্যে রাস্তায় কখনও তাদের নখের দাগ দেখা যায় না।

প্রকৃতির কোলে যে বাঘ, তার সঙ্গে চিড়িয়াখানা বা সার্কাসের বাঘের কোনো তুলনাই হয় না। রাতবিরেতে দূর পাল্লায় সমানে দৌড়ঝাঁপ করে আর শিকারের সঙ্গে মরণপণ লড়াইয়ের ধ্বস্তাধ্বস্তিতে তার মাংসপেশীগুলো ফুলে বেঢপ হয়ে দাঁড়ায়। পেট পুরে খেতে পাওয়া বাঘের গড়ন মোটেই ছিপছিপে নয়; বরং একটু বেশি রকম কেঁদো; ইয়া চওড়া কাঁধ, পিঠ আর পাছা; সেই সঙ্গে অসম্ভব মোটাসোটা হাত পা, বিশেষ করে কনুই থেকে কাঁধ আর কব্জি। পেশীগুলো যেমনি কড়া তেমনি নিরেট; আর সেই সঙ্গে অস্থি-কঙ্কালের কাঠামোর সঙ্গে অসংলগ্ন ভোজালি আকারের অদ্ভুত দুটি ছোট্ট হাড় আছে, যার নাম 'লাকি বোন।' প্রত্যেকটি কাঁধের গায়ে যে থলথলে মাংস আছে, সেখানে এই হাড় দুটোর অবস্থান; দেখে মনে হয়, এতে বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে একটা এককাট্টা ভাব আসে, যার ফলে থাবা মারার সময় এবং ধ্বস্তাধ্বস্তির পর্বে বাড়তি জোর পাওয়া যায়।

বাঘের পেশীতে অসম্ভব শক্তি। তার যে কী রকম গায়ের জোর, তার প্রমাণ পাওয়া যায়—যখন বুনো মোষ মেরে টানতে টানতে সে অক্লেশে দূরের রাস্তা পাড়ি দেয়। একসঙ্গে পঁচিশ তিরিশ জন লোকও কিন্তু এতটা ভার বইতে গিয়ে হিমসিম খাবে।

একটা সুস্থ জোয়ান বাঘ অবলীলাক্রমে তিরিশ ফুটেরও বেশি লাফিয়ে পার হতে পারে। কোচ বেলীতে একবার একদল বন্ধুর সঙ্গে বনমোরগের খোঁজে জঙ্গল ঢুঁড়তে গিয়ে বাঘের এই আশ্চর্য লাফ দেখেছিলাম। সেদিন ছিল শান্ত সকাল; মোরগগুলো ঝটপট পালাচ্ছে আর আমরা তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বন্দুকে গুলি ভরছি। গুলির আগুন সশব্দে ঝলসাচ্ছে। জঙ্গল-খেদার গোলমালে ভয়ে তাবৎ প্রাণীর বন ছেড়ে পালাবার কথা। হঠাৎ দেখি বীট বন্ধ হয়ে গেছে, পাখিরাও উড়ে পালাচ্ছে না।

বীট থেমে যাওয়ায় মনে মনে চটেছিলাম। যারা জঙ্গল খেদাচ্ছিল, খানিক বাদে তাদের দিকে এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি ভয়-পাওয়া এক পাল বাঁদরের মত তারা সব গাছের ওপর উঠে বসে আছে। আমাকে দেখতে পেয়ে বলল, হঠাৎ তারা একটা বাঘের সামনে গিয়ে পড়েছিল। গোলমাল শুনে ভড়কে

গিয়ে বাঘটা উল্টো দিকে সট্‌কে পড়েছে। আঙুল দিয়ে তারা আমাকে দেখিয়ে দিল বাঘ কোন্ দিকে গেছে। আমি হেঁটে গিয়ে একটা নালা দেখতে পেলাম—বাঘ যে নালাটা এক লাফে পেরিয়েছে।

নালার এপারে যে জায়গাটা থেকে লাফিয়ে বাঘ ওপারের যে জায়গায় পড়েছিল—দু জায়গাতেই বাঘের পায়ের গভীর স্পষ্ট ছাপ দেখতে পেলাম। জঙ্গল-খেদার দলের একজনের মাথার পাগড়ি চেয়ে নিয়ে দুটো দাগের দূরত্ব মেপে নিয়ে দেখলাম বাঘটা সটান তেত্রিশ ফুটের ওপর টপকেছে। এমন কি লম্বা লাফানোর আর হার্ড্‌ল্ পার হওয়ার তালিম-পাওয়া দুরন্ত ঘোড়ার কথা ধরলেও—খুব কম ঘোড়ারই এমন আশ্চর্য লাফ দেবার ক্ষমতা আছে।

বড়সড় জোয়ানমর্দ বাঘ ওজনে কোন্ না দশমণী হবে। সাধারণত বাঘের ওজন হয় উনিশ-বিশ থেকে চব্বিশ-পঁচিশ মণের ভেতর। ১৮৬১ সালের অযোধ্যার দুতিয়ারায় কর্ণেল বয়লিন একটা বাঘ মেরেছিলেন—তার দৈর্ঘ্য বারো ফুটের ওপর ছিল। এর চেয়ে লম্বা বাঘের কথা আমাদের জানা নেই। তবে এখন কোনো বাঘের লেজের ডগা থেকে নাকের ডগা পর্যন্ত মাপ দশ ফুট হলেই তাকে বলা যাবে বিশাল জানোয়ার। বুড়ো বয়সে খেতে না পেয়ে বাঘ বেজায় কাহিল হয়, তার পেট খালি থলির মত চুপ্‌সে গিয়ে ঝুলে পড়ে।

বাঘ হল এক বিশাল গুরুভার দেহের বিড়াল; গায়ে জলজলে পাটকিলে রঙের ওপর এইটুকু এইটুকু ঘন লোম। গায়ের রঙের ইতরবিশেষ আছে—ফিকে হলদে, গিরিমাটি থেকে শুরু করে গাঢ় স্বর্ণাভ লাল এবং পোড়ামাটির রকমারি ছাঁদের রং। বয়েস, শরীরের অবস্থা, জলহাওয়া আর বাসস্থান অনুযায়ী এই পারিপার্শ্বিক রঙে একের সঙ্গে অন্যের তফাত দেখা যায়। পেট, মাথার তলার দিক এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভেতর দিক সাদা বললেই হয়। কানের পিঠ কালো, তাতে লক্ষণীয় সাদা ফোঁটা। গা আর পিছনের পায় আড়াআড়ি ডোরা কাটা—প্রায়ই অনিয়মিত ধরনের ডবল লাইন—কখনও একক টানা দাগ, কখনও গ্রন্থি ধরনের, আবার কখনও চ্যাটালো পটির মত। সামনের ঠ্যাঙের বাইরের দিকে ডোরাকাটা দাগের কোনো চিহ্ন দেখা যাবে না, অন্যদিকে মাথার আশপাশে এই দাগ সবচেয়ে ঘনবদ্ধ। লেজে চক্কর কাটা, ডগার দিকটা কালো এবং তাতে চুলের গুছি। মানুষের হাতের রেখায় যত বৈচিত্র্য, বাঘের গায়ের ডোরাকাটা দাগেও তেমনি বিস্তর বৈচিত্র্য দেখা যায়।

দাগের মাত্রার দিক থেকে বাঘে বাঘে তারতম্য তো আছেই, উপরন্তু একই বাঘের শরীরের দু পাশের দাগ কখনই অবিকল একই ধাঁচের হয় না। মদ্দা বাঘের গালে আকর্ণ লোমের গুছি থাকে, লোকে তাকেই বাঘের গোঁফ বললেও —ঠোঁটের ওপরকার কুঁচিগুলোই বাঘের আসল গোঁফ। সাদা বাঘ আর কালো বাঘ দেখা যায় বটে, তবে পৃথিবীতে খুবই বিরল, বিশেষ করে কালো বাঘ। শরীরের রঙ্গকক্রিয়ার দোষেই এ রকমটা হয়ে থাকে।

বাঘের ডোরাকাটা দাগের সঙ্গে শুক্‌নো ডালপালা, ঘাসের হলুদ্‌বর্ণ স্তবক আর পোড়া গাছের গোড়ার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। বাঘ বেশির ভাগ সময় এই পরিমণ্ডলের মধ্যে থাকে। এর মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে প্রায় নিঃশব্দে সে এগোতে বা পিট্‌টান দিতে পারে—মাত্র কয়েক হাত দূরে থেকেও সে এইভাবে মানুষের চোখে ধুলো দিতে পারে।

অনেকদিন ধরে এই রকমের একটা ধারণা ছিল যে, শালবনে বা ঘাসের বনে আলোছায়ার লম্বালম্বি দাগের সঙ্গে মিল রাখার তাগিদে বাঘের গায়ে এই রকমের ডোরাকাটা দাগ ফুটে উঠেছে। কিন্তু সাইবেরিয়ার বাঘ? তার গায়েও তো একই রকমের ডোরা। অথচ সে দেশের প্রকৃতি তো একেবারেই ভিন্ন জাতের।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সমরবিজ্ঞানীরা শত্রুর চোখকে ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে রঙের ক্রিয়া নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছিলেন। গবেষণা করে তাঁরা জানতে পারলেন, মোটামুটিভাবে কয়েকটা নিয়ম মেনে চললে শত্রুর চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায়—হয় দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়ে, নয় পশ্চাদ্‌ভূমিতে বর্ণসমন্বয়ের বৈচিত্র্য ফুটিয়ে। এর প্রধান প্রধান কয়েকটা নিয়ম হল এই :

১। যে বস্তু গোপন করবেন তার রূপরেখা ভাঙাচোরা করতে হবে।

২। রঙের জন্যে কোনো বস্তু ঘন দেখালে রংটা মারতে হবে।

৩। ছায়া পড়লে হয় উঠিয়ে ফেলতে হবে, নয় ঢাকতে হবে।

৪। রঙে রঙে মিলিয়ে দিতে হবে।

আমরা যদি প্রাকৃতিক পরিবেশে বাঘকে দেখি, তাহলে তার আত্মগোপনের ক্ষমতার মধ্যে এর কোনো না কোনো নিয়মের খেলা দেখতে পাব।

ডোরাকাটা দাগ, ফোঁটা আর এখানে সেখানে অনিয়মিত রঙের ছোপ এবং তার ঠিক পাশেই বাঘের গাত্রবর্ণের সাধারণ জমি থাকায় একটা জোরালো

প্রতিরূপের সৃষ্টি হয়—তার ফলে বাঘেব স্বাভাবিক রূপরেখা ঢাকা পড়ে। এই সব দাগ আর ছোপগুলো দর্শকের চোখে পড়ে মন বিক্ষিপ্ত করে এবং দর্শক যা নয় তাই ভেবে বসে। যেমন ধরুন, বড চিতাবাঘের গায়ে ফুটকি ফুটকি দাগ আর রঙের নকশা। কিপলিঙের ভাষায়, 'তুমি (চিতাবাঘ) বাইরে ফাঁকা জমিতে শুযে থাকলে তোমাকে দেখতে হবে ডাঁই-করা নুডির মত। ন্যাডা পাহাডের খোলা জাযগায পড়ে থাকলে তোমাকে দেখাবে যেন একখণ্ড গোলা পাথর। গাছের ঝাঁকড়া ডালে শুযে থাকলে তোমাকে দেখে মনে হবে পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে; রাস্তাব মধ্যিখানেও যদি তুমি পড়ে থাকো, লোকে তোমাকে দেখেও দেখবে না।' জীবতাত্ত্বিকেবা একেই বলেন 'বর্ণবিক্ষেপ' এবং লড়াইতে যখন এর ব্যবহার হয তখন এব নাম 'চোখ-ধাঁধানো বর্ণচুরি'। স্পষ্টতই এ এক ধরনের দৃষ্টিবিভ্রম।

স্বাভাবিক রঙের ছাঁদটিকে 'পাল্টা রঙের ছাঁদেব' কৌশলে মারতে হবে। একরঙা কোনো জিনিস—ধরুন, পাটকিলে রঙের একটা পুতুল—যদি খোলা জায়গায় রোদের মধ্যে ধরেন, তাহলে দেখবেন তাব পিঠের দিকটাতে আলো পড়ে পাঁশুটে দেখাচ্ছে, তার তলার দিকটা দেখাচ্ছে কালো আর দু পাশটা না ঠিক পাঁশুটে, না ঠিক কালো—মোটামুটি পাটকিলে রঙের। পাটকিলে বঙের জন্তুজানোযারের পিঠের দিকটা একটু ঘোব বর্ণের হয়। তলার দিকটা খুব ফ্যাকাসে হরিদ্রাভ আব সাদা হয এবং দুপাশ ঘোর-ঘোর থেকে ক্রমশ ফ্যাকাসে হরিদ্রাভ হযে সাদাব মধ্যে মিলিযে যায়। ফলে, তার বং ঢালাও-ভাবে পাটকিলে দেখায়; ত্রিমাত্রিক না দেখিযে দেখায দ্বিমাত্রিক। এও আবার এক চোখের ভুল। পটভূমিও একই রঙের হওয়ায় জানোয়ারটি চোখেই পড়ে না।

জানোয়ারটি জমির সঙ্গে এমনভাবে সেঁটে থাকে এবং এমন একটা জায়গা বেছে নেয়, যার ফলে ছায়ার জাযগাটা ঢাকা পড়ে।

একদিকে সেই জানোয়ার আর অন্যদিকে তার চারপাশের গাছপালা, পাথর বা জমিজায়গা—এই দুয়ের রং ঢং ছায়া নিখুঁতভাবে মিলে যাওয়ার দরুন বর্ণের সমন্বয় ঘটে।

প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকা বাঘের মধ্যে এই সব গুণ এত বেশি যে, তার গা ঢাকা দেবার ক্ষমতায় তাক লাগে। বিশেষ করে ভাঙা ভাঙা রেখায়

বকমারি গাত্রবর্ণ, রঙে বঙে মেশামেশি এবং ছড়ানো ছিটানো অনিয়মিত দাগ থাকায়, যখন সন্ধ্যার আলো-আঁধাবিতে শিকাব খুঁজতে বেরোয় বাঘকে তখন আদৌ ঠাহব করা যায় না।

বাঘ হয়ত হাত কয়েক দূরে আছে আপনি চলে যাচ্ছেন, কিংবা বাঘের আস্তানা থেকে চার হাত দূরে হয়ত আপনি বসে আছেন, অত বড জানোয়ারটাব উপস্থিতি আপনি টেরও পাবেন না। তার কারণ, অদ্ভুত ভু-পেয়ে প্রাণীটা চলে না যাওযা পর্যন্ত সে চুপটি করে গুটিসুঁটি মেরে পড়ে থাকবে।

লুকিয়ে থাকার এই অদ্ভুত ঝোঁকের ব্যাপারটা বছর কয়েক আগে উত্তর প্রদেশের তরাইয়ের জঙ্গলে একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে আমি জানতে পারি।

সেখানে কালুশহীদ ব্লকের নালাকাটা সোঁতায একদিন সকালে যেতে যেতে আমরা একটা টানাহেঁচড়ানোর দাগ আর তাব পাশে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম। আমরা সেই দাগ দেখে দেখে এগোতে লাগলাম। আধ মাইল রাস্তা ঠেঙাবাব পর আমরা দেখলাম সোঁতার পাড়ে একটা ঘাসঝোপের মধ্যে একটা প্রমাণ সাইজের মরা মোষের দেহ লুকানো রয়েছে। ঠিক করলাম সন্ধ্যে নাগাদ টোপটাতে এসে আমরা বসব।

বিকেল তিনটে নাগাদ নালাটার কাছে ফিরে এসে তো আমাদেব চক্ষুস্থির। মোষটা যে জায়গায় আমরা দেখে গিযেছিলাম, সেখানে নেই। মোষটাকে পাওয়া গেল সোঁতার ঠিক মাঝখানে—এমন জাযগায় শিকার ফেলে রাখাটা বাঘের পক্ষে স্বাভাবিক নয। জায়গাটা একে খোলামেলা, তার ওপর ঘাসে ঢাকাও নয়—এখানে শেয়াল শকুন ঠেকাবার কোনো উপায় নেই। আসলে বাঘ ওটাকে টেনে নিযে যাবাব সময আমাদের সাড়া পায। তখন তাড়াতাড়ি সোঁতাব মধ্যে মোষটাকে ফেলে রেখে পিট্টান দেয়।

একটা গাছ ঠিক করে আমাব সঙ্গের লোকদের মাচা বাঁধার ব্যবস্থা করতে বলে আমি সোঁতাব পাড়ে চলে গিযে বালিব ওপব বসলাম। লোকজনেবা মাচার জন্যে আশপাশের গাছ থেকে দুড়দাড়িযে গাছের ডাল কাটতে লেগে গেল। গাছের ডাল কাটতে ছুলতে কমপক্ষে নিশ্চয় আধ ঘণ্টা সময় লেগেছিল এই সময়ের মধ্যে আমরা সারাক্ষণ কথা বলেছি, সিগারেট টেনেছি এবং আর যাই করি না কেন চুপচাপ থাকি নি।

আমি দিব্যি পা ছড়িয়ে বসে দুটোর পর তৃতীয় সিগারেটটা ধরিয়ে মৌজ করে টানছি, হঠাৎ আমার মাথার ওপর ঘাসের ঝোপটা নড়তে দেখলাম। ঝোপের ঠিক মাঝখানটা। নড়েছিল খুব সামান্য। তাতে ঘাসের ডগাগুলো তির তির করে কাঁপছিল। বনে বাতাস ছিল না, গাছের উঁচু ডালের পাতাগুলোও সব তখন নিথর।

কী ব্যাপার দেখবার জন্যে উঠে পড়লাম। রাইফেলটা যেখানে ছিল রেখে পাড় বেয়ে ওপরে উঠলাম। বড় ঘাসের একটা ঘন ঝোপ, আট ফুটের মত তার বেড়, লম্বা হয়ে সোঁতার পাড় বরাবর চলে গেছে। বার কয়েক ঝোপটা পাক দিলাম; উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুই ঠাহর হল না। ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে দেখলাম ঝোপের মাঝখানে ঘাসের ডগাগুলো আবার তির তির করে কাঁপছে।

ঝোপটার মধ্যিখানে চিতল হরিণের একটা ছানা গা ডুবিয়ে বসে মাঝে মাঝে কান নাড়াচ্ছে আর তাইতেই যে ঘাসের ডগাগুলো কেঁপেকেঁপে উঠছে, এ বিষয়ে আমার আর কোনো সন্দেহ রইল না। আমার খুব ইচ্ছে হল হরিণছানাটাকে দেখবার আর সম্ভব হলে তার ফটো তুলবার। পাড় বেয়ে নেমে গিয়ে আমার লাইকা ক্যামেরাটা নিয়ে এলাম। রাইফেলের ঠিক পাশেই ক্যামেরাটা হ্যাভারস্যাকের মধ্যে রাখা ছিল। ঝোপের ধারে এসে সোঁতা যেদিকে সেইদিক থেকে সাবধানে হাত দিয়ে ঘাসগুলো সরিয়ে সরিয়ে পা টিপে টিপে আমি ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করলাম। দু পা এগিয়েছি কি এগোই নি, হঠাৎ ঝোপটা কাঁপিয়ে একটা ক্রুদ্ধ আওয়াজ কানে এল—'অওফ্'। আর তৎক্ষণাৎ ঝোপের ও প্রান্তে একটা বাঘের মূর্তি ঝিলিক দিয়ে উঠে গোটাকয়েক লাফ দিয়ে কাছাকাছি জঙ্গলের আড়ালে গিয়ে উধাও হয়ে গেল।

অনায়াসে আমাকে মেরে ফেলতে পারত। বাঘটা মহাশয় ছিল বলতে হবে। অবশ্য বেশির ভাগ বাঘই মহাশয়। আর তাছাড়া আমাতে তার অভিরুচি ছিল না। আমরা যে রকম হৈচৈ করে কথা বলছিলাম আর দুড়দাড়িয়ে গাছ কাটছিলাম, তাতে বাঘের নিঃসন্দেহে এই ধারণা হয়েছিল যে, আমরা নেহাৎই নিরীহ দেহাতী লোক। স্বাভাবিক পরিবেশে একটা স্বাভাবিক বাঘ—সে শুধু আমাদের চলে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। আমরা চলে গেলেই সে তার অসমাপ্ত আহারে মন দেবে।

সামনে থেকেও চোখকে ফাঁকি দেবার এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। আমি ছিলাম একেবারেই তাব সান্নিধ্যে। চারদিকে ছিল দিনদুপুরের আলো। অথচ আমি ধরতেই পারি নি। আমার চোখ তার ওপর পড়েছিল, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই—তবু তাকে আমাব চোখে পড়ে নি। চোখে ধাঁধা লাগার ব্যাপারটা এমন নিখুঁতভাবে ঘটেছিল যে, মনোযোগ দিয়ে দেখা সত্ত্বেও আমি তাকে চিনে উঠতে পারি নি।

ব্যাঘ্রমিথুন ও ব্যাঘ্রশাবক

বাঘ-বাঘিনীতে জোড বাঁধে তিন বছরে একবার। এই সময়ের মধ্যে ব্যাঘ্রশাবক তার মা-র কাছে থাকতে পায়। ফেব্রুয়ারি থেকে মে বাঘিনীদের ঋতুকাল; দিন দশেক তারা এই অবস্থায় থাকে। বছরের শুধু এই সময়টা বাঘবাঘিনী সাধারণত একত্রে কাটায়। তাও একটানা একসঙ্গে নয, এইটুকু সময়ের মধ্যেও পালাক্রমে তাদের বিচ্ছেদ আর পুনর্মিলন ঘটে। এই সময়ে তারা জোড বেঁধে শিকার করে। বাঘিনীর নেকনজর পাবার জন্যে বাঘ মাঝে মাঝে অবিশ্বাস্য রকমের বাহাদুরি আর তাকত দেখায়।

বাঘিনীব এই জোড বাঁধার সময়টাতে বাঘ আর বাঘিনীর বিশেষ রকমের একটা ডাক আছে; সেইভাবে ডেকে ডেকে তারা পরস্পরকে খোঁজে। এই সময ক্ষিধেতেষ্টা তাদের মাথায় ওঠে। সাক্ষাৎ চোখোচোখি আর জোড বাঁধার আগে পর্যন্ত দিনের পর দিন তারা পরস্পরকে ডেকে বেডায আর ভাবে বিভোর হয়ে থাকে। যখন তাদের এই অবস্থা হয়, আমি জানি বাঘকে কিছুতেই টোপে গাঁথা যাবে না। সারা রাত বাঘ যদি টোপের কাছে বসেও থাকে, টোপ কিছুতেই সে মুখে দেবে না।

বছর কযেক আগে একদল বন্ধুর সঙ্গে আমি একবার নেপাল সীমান্তে সোনারিপুর জঙ্গলে শিকাবে গিয়েছিলাম। বাঘের এই আশ্চর্য স্বভাব আমি সেই সময় লক্ষ করি।

জাযগাটার ঘাঁতঘোঁত বুঝতেই আমাদের দিন দুয়েক লেগে গেল। বাঘ যেখানে নিয়মিত আনাগোনা করে, সেই জাযগাটা শেষ পর্যন্ত আমরা খুঁজে বার করলাম। বাঘ নয়, আসলে সেটা ছিল বাঘিনী। পায়ের দাগ দেখে ধরা গেল, বাঘিনীর সঙ্গে আছে তার বছর তিনেকের এক বডসড বাচ্চা। বাঘিনীটি সম্পর্কে আমাদের খুব আগ্রহ ছিল না। ঐ এলাকার এক গোখাদক

বাঘ, শুধু তাকেই আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। সেই সুবাদেই রোজ সকালে একবার করে ঐ জায়গাটাও আমরা দেখে আসতাম। বাঘের বাচ্চা আর তার মা-র আগের রাত্রের সগু সগু পায়ের ছাপ সকালবেলায় দেখা যেত।

সপ্তাহখানেক পরে একদিন দেখি দুটির বদলে কেবল একটিরই পায়ের ছাপ। শুধু বাচ্চাটির।

সে রাত্রে সারা বনে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল বাঘিনীর গর্জন। সে যেন জানিয়ে দিতে চাইছিল—'বসন্ত আসে পাত্র যে কেউ হোক'। দু রাত আর দু দিন ধরে পাগলের মত সে গাঁক গাঁক করে বেড়াল। তার আনাগোনার রাস্তাতেই মোষ বেঁধে রাখা হয়েছিল—এই দুদিনে কমপক্ষে ছ'বার সে তার পাশ দিয়ে গেছে, কিছু বলে নি।

তারপর এক সাঙ্গাত খুঁজে পেয়ে বাঘিনীর গর্জন থামল। একটা ডোবার ধারে মোষ বেঁধে তার সামনে দিব্যি একটা গাছের ওপর মাচা করে সে রাত্রে আমি বসেছিলাম। আমার ডান দিকে আর পেছনে পুকুরটাকে বেড় দিয়ে একটা ঘন ঝোপ বনের রাস্তার একেবারে যেন ঘাড়ে গিয়ে পড়েছে।

দিনটা ছিল মেঘলা। শুরু হল ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। একে কৃষ্ণপক্ষের রাত্তির, তার ওপর বৃষ্টির মুষলধারায় অন্ধকার আরও ঘনকালো দেখাচ্ছিল। মেঘের গুরু গুরু আওয়াজে থেকে থেকে অন্ধকার কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

ঠিক ছিল রাত আটটা অবধি বসে থাকব। কিন্তু এই বৃষ্টিতে যাই কী করে। যে রেস্ট হাউসে আমরা উঠেছি, এখান থেকে তা দু মাইলের ওপর। ভেবেছিলাম বৃষ্টি ছেড়ে যাবে, কিন্তু বহুক্ষণ পরেও যখন তার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, মনে মনে তখন ঠিক করলাম দুর্যোগ মাথায় নিয়েই রেস্টহাউসের দিকে পাড়ি দেব। এমন সময় একটা গব্‌র্‌ গব্‌র্‌ আওয়াজ—যেদিকে মোষ বাঁধা ছিল সেইদিক থেকে। চোখে আমার কিছুই ঠাহর হচ্ছিল না—আমার নিজের হাত, এমন কি আমার মুখের ওপর আর খালি মাথায় ঝমঝম করে পড়া জলের ধারাও আমার দৃষ্টির আর গোচরে নয়।

বাঘ আর বাঘিনী তখন কামকেলির উদ্যোগপর্ব হিসেবে ফষ্টিনষ্টিতে ব্যস্ত। এমন ছুটোপাটি লাগিয়েছিল যে দেখে মনে হচ্ছিল যেন প্রাণ ওষ্ঠাগত

হওয়ার ব্যাপার। ওদের দাপাদাপিতে আমার চারপাশে তিরিশ গজ ব্যাসার্ধ জুড়ে ঝোপঝাড়গুলো মাটিতে কুপোকাত হয়ে পড়েছিল।

একদিকে বৃষ্টি আর অন্যদিকে বাঘের এই হৈ-হুল্লোড় আরও ঘণ্টা দুই ধরে চলেছিল। এমন সময় হঠাৎ একটা মোটর গাড়ি এসে পড়ায় জানোয়ার দুটো বিরক্ত হল। আমার বন্ধুপুত্র আলিম আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়িটা এনেছিল।

তিরিশ চল্লিশ হাত গাড়ি চালিয়ে যেতেই হঠাৎ হেডলাইটের আলোয় রাস্তার একেবারে মধ্যিখানে বাঘবাঘিনীকে আমরা পেয়ে গেলাম। ওরা তখন গাড়ির আলো, ইঞ্জিনের শব্দ—এসব বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে সুরতক্রিয়ায় মত্ত। ছোকরা আলিম গাড়ি থামিয়ে হর্ন বাজাতে লাগল। কিন্তু যতক্ষণ ইঞ্জিনটা পুরোদমে চালিয়ে সেইসঙ্গে হর্নের শব্দ করে রীতিমত একটা হট্টগোল সৃষ্টি করা না হল, ততক্ষণ ওরা নড়ল না। শেষকালে খুব বেজার হয়ে বাঘিনীকে ছেড়ে বাঘ মাটিতে চার পা হল এবং বেরসিক গাড়িটার দিকে চেয়ে দাঁত খিঁচোতে খিঁচোতে দুটিতে রাস্তা ছেড়ে ঝোপের মধ্যে চলে গেল।

বাঘিনীর ঋতুকালের এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে পালে পালে বাঘ এক জায়গায় হতে দেখা যায়। বাঘিনীর ঋতুকালের সূত্রপাত থেকে শুরু করে যে পর্যন্ত না বাঘেরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নেয় যে কে তার যোগ্য প্রার্থী হবে—সেই পর্যন্তই বাঘের এই জমায়েত দেখতে পাওয়া যায়।

১৯৬১ সালের মে মাসে হালদোয়ানির কাছে নানধৌর ফরেস্ট ব্লকে আমি একবার এই রকমের জমায়েত দেখেছিলাম। এক বাঘিনীর ঋতুকাল দেখা দেওয়ায় আমাদের কোনো টোপে তাকে গাঁথা যাচ্ছিল না। এক সন্ধ্যেয় আমার ছেলে একটা চিতাবাঘ মেরেছিল। একটা নালার মুখে লাশটা আমরা ফেলে রেখে আসি। বাঘিনী তার প্রার্থীদের নিয়ে ঐ পথ দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেয়ে তার ওপর হামলে পড়ে। পরদিন সকালে গিয়ে দেখি আধ-খাওয়া লাশটা একটা নিরাপদ জায়গায় সরানো। আমার বন্ধু জলিলসাহেব তুখোড় শিকারী, উঁচু জায়গার লক্ষ্যভেদে শটগানে তাঁর হাতে ভেল্‌কি খেলে। কাছেই একটা গাছের ওপর তিনি বসলেন। সন্ধ্যে হওয়ার একটু আগে আওয়াজ শুনে বুঝলেন কয়েকটা জানোয়ার

আসছে। লাশটাব দিকে মুখ করে জলিলসাহেব বসে ছিলেন, একটা স্তোলি নদীর খাতের মধ্যে লাশটা রাখা ছিল। তাঁর পেছনদিক থেকে জানোয়ারগুলোর গুটি গুটি এগিয়ে আসার শব্দ হচ্ছিল। শব্দটা ক্ষীণ হয়ে যেতে তিনি পেছন ফিরলেন। পেছন ফিরেই দেখলেন একটা বাঘের ল্যাজ এবং আরেকটা বাঘের সম্মুখভাগ নালার বাঁকের আড়ালে মিলিয়ে যাচ্ছে।

নিজের ভাগ্যকে দুষবার সময়টুকুও জলিলসাহেব পেলেন না; তাঁর মাচার ঠিক নীচেয় তখন জোরে জোরে কার যেন নিশ্বাস পড়ছিল। নীচে তাকিয়ে দেখলেন আরেকটা বাঘ ঠিক একটা কুকুরের মত উবু হয়ে বসে জিভ বার করে হাঁপাচ্ছে।

ডবল রাইফেলটা নীচু করে জলিলসাহেব বাঘটার ঘাড়ের ঠিক নীচে বুলেটটা বিঁধলেন। বাঘটা গড়িয়ে পড়ল। ঠিক সেই সময় তিনি টের পেলেন তাঁর পেছনে নালার মধ্যে আরও একটা বাঘ নড়াচড়া করছে। পেছন ফিরে তিনি দেখতে পেলেন—একটা কোথায়? দু দুটো বাঘ হাত বিশেক দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

একটার বেশি বাঘ মারবার তাঁর অনুমতি ছিল না। বাঘদুটো যাতে ভয় পেয়ে পালায় তার জন্যে তিনি গলা ফাটিয়ে চেঁচালেন। কিন্তু বাঘদুটো কোনোই আমল দিল না। সমানে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর দিকে তাকিয়ে তারা অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করতে লাগল। জলিলসাহেব তখন ফাঁকা আওয়াজ করলেন। তাতে ফল হল। দুটো বাঘের একটাকেও আর দেখা গেল না।

জলিলসাহেবের গুলিতে মারা পড়েছিল একটা মদ্দা বাঘ। গোঁয়ার-গোবিন্দ বাঘিনীটা তার প্রার্থীদের একটাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ঘাতকতায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল। পরদিন সকালে পায়ের ছাপ দেখে আমরা ধরলাম—কুল্লে পাঁচটা বাঘ এসেছিল; সব কটাই জোয়ানমদ্দ—তারা এসে জুটেছিল বাঘিনীর স্বয়ম্বরসভায় বরমাল্যের আশায়।

প্রয়োজনের সময় সঙ্গী না জুটলে বাঘিনীর মেজাজ তিরিক্ষে হয়। আবার সঙ্গীর যন্ত্রণাদায়ক (নিশ্চয় অনিচ্ছাকৃত) ব্যবহারের দরুন জোড় বাঁধার সময়টাতে এবং তার পরে বাঘিনীর মেজাজ আরেক কাঠি চড়ে থাকে। বাঘ আর বাঘিনীতে সত্যিকার লড়াই কদাচিৎ হয়—তাও বাচ্ছার

বিপদ আপদের আশঙ্কা দেখা দিলে কিংবা সন্তানধারণেব বয়স পেরিয়ে গেলে।

গর্ভে ধারণ করার মেযাদ চোদ্দ-পনেরো সপ্তাহের মত। পেট থেকে পডার সময় বাঘের বাচ্ছা আকারে হয় গৃহপালিত বেড়ালের চেযে সামান্য ছোট। গায়ে ভারি সুন্দর নরম নরম লোম। তবে ঢের বলিষ্ঠ গডন। কান আর সামনের থাবাদুটো বেশ বড বড। বাঘিনী মা-র অনভিজ্ঞতার দরুন সাধারণত প্রথমবারের বাচ্ছাগুলো পরিত্যক্ত হওযায না খেতে পেয়ে মবে কিংবা মদ্দা বাঘেরা এবং অনেক সময় স্বয়ং বাঘিনীরাও বাচ্ছা মেরে ফেলে এবং খেযেও ফেলে।

কখনও কখনও একেকবারে বডজোর সাতটা করে বাচ্ছা হয়। কিন্তু বাঘ যে বাঘ, প্রকৃতি তাকেও ছেডে কথা বলে না। শেষ পর্যন্ত উস্তন-খুস্তন হযে শুধু সেই কটা বাচ্ছাকেই বাঘিনী মা নিজের কাছে রাখে যারা তুলনায় সবচেয়ে শক্তসমর্থ।

রোগব্যাধি, লডাই, গোলাগুলি এবং জীবনেব অন্যান্য ঝডঝাপ্টা পেরিয়ে যদি বাঁচে, তাহলে পঁযত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বাঘের পরমাযু। বুড়ো বয়সের স্বাভাবিক পবিণাম মৃত্যু, বুড়ো বাঘ তাই শিকার করে পেট চালাতে অপারগ হয়ে অজ্ঞাতবাসে চলে গিয়ে শান্তভাবে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করে।

মৃত্যুর আগে বুড়ো বাঘের হৃতশক্তি আব ক্রমবর্ধমান বযসের নানা লক্ষণ প্রকাশ পাবে। বুড়ো হয়ে হযত গরু-বাছুর মেরে বেডাবে এবং পরে মানুষখেকো হবে। গাযে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন থাকা ছাডাও বাঘের চেহারায় চামডার সে চাকচিক্য আর থাকবে না। বাঘের সুন্দর লাল রঙের অনেকখানিই ক্ষয়ে গিযে নিছক ম্যাড ম্যাড করবে। বাঘের মুখের চুলগুলো দস্তুরমত কিছু কিছু সাদাও দেখাতে পারে। বাঘের নখগুলোর ধার কমে গিযে এদিক ওদিকে ছডিযে পডতে আরম্ভ কববে। বুড়ো বাঘের অনেক দাঁতই হয় আধভাঙা হযে থাকে, নয একেবারে থাকেই না। বুড়ো বাঘেব পাযের ছাপ ছেতরে পড়বে এবং বর্ষায দেখলে অনেক চিড় খাওয়া আর ভাঁজ পড়ার দাগ দেখতে পাওয়া যাবে। (ক্রমশ)

অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পরিকল্পনার সলিলসমাধি

কল্যাণ দত্ত

দেশব্যাপী অভাব-অনটন, মূল্যবৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ, ছাঁটাই ও মন্দার কবলে পড়ে দেশবাসী যখন হাবুডুবু খাচ্ছে, তখন অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই তাঁর অর্থনীতির জ্ঞান প্রচারে আসরে নেমেছেন। সময়টা শ্রীদেশাই ভালোই বেছে নিয়েছেন, কেননা তাঁর দর্শন গ্রহণের মানসিক প্রস্তুতি সারা দেশ জুড়ে বেশ ভালোই তৈরি হয়েছে। ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো পেলেও আঁকড়ে ধরে, দেশের লোকও আজ তেমনি নতুন একটা কিছু শুনতে চায়, পুরনো সব কিছুই ভুলতে চায়।

১৬ই জুলাই হায়দরাবাদে এক সম্মেলনে বক্তৃতায় শ্রীদেশাই বলেন: ভারতের অবস্থা যেন দ্রুত ধাবমান এক লোকের মতো। কোনও এক সময়ে ঐ লোক যদি স্বেচ্ছায় বিশ্রাম গ্রহণ না করে, তাহলে জোর করেই তাকে বিশ্রাম নেওয়াতে হবে। বিশ্রাম নিলে তাকে বোঝাতে হবে তার কী ভুল হয়েছিল। অত্যন্ত নীচু মান থেকে আমরা উন্নয়নের কাজ আরম্ভ করি। পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের সামান্যই জ্ঞান ছিল; প্রকৃতিও আমাদের শক্তি পরীক্ষা করছিল এবং আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের সামনে নতুন অসুবিধা সৃষ্টি করেছে।

শ্রীদেশাইয়ের বক্তব্যের সারমর্ম হল যে, এতকাল আমরা পরিকল্পনার পিছনে বড় বেশি টাকা ঢেলেছি, এবার সমঝে চলতে হবে। বড় বড়

কলকারখানা, বিশেষ করে মূলশিল্পের প্রকল্পগুলির জন্য ব্যয়বরাদ্দ কমাতে হবে। দেশাইয়ের এই সমালোচনা কিছু নতুন নয়। তৃতীয় পরিকল্পনা রচনার সময়ে লোকসভা বিতর্কে বেশ কিছু সদস্য (কংগ্রেসী সদস্য) দাবি করেছিলেন যে, দেশ হাঁপিয়ে পড়েছে, এবার পরিকল্পনায় একটা ছুটি দেওয়া হোক। সে সময়ে শ্রীনেহরু ঐ সমস্ত সদস্যকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন যে, পরিকল্পিত অর্থনীতিতে কোনো ছুটি থাকতে পারে না; হয় আরও এগিয়ে যেতে হবে, না হয় পিছনে সরে আসতে হবে। একবার যে সমস্ত প্রকল্পে হাত দেওয়া হয়েছে সেগুলিকে পূর্ণ করতে হবে এবং পূর্ণ হলে তাকে উৎপাদনের কাজে লাগাতে হবে এবং তার জন্য আরও বেশি বেশি টাকা মূলধন লগ্নী করা দরকার। তা না করলে দেশের সম্পদ অব্যবহৃত থাকবে ও অপচিত হবে।

টাটার সুপারিশ

শ্রীদেশাইয়ের কথাটা আরও পরিষ্কার করে বলেছেন শ্রীজে. আর. ডি টাটা। আমেদাবাদে গত ৭ই জানুয়ারি এক সম্মেলনে তিনি বলেন: আমি মনে করি, আমাদের দুঃখকষ্টের জন্য উচ্চপ্রত্যাশী পরিকল্পনা যতখানি দায়ী, পরিকল্পনার ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনা ততখানি দায়ী নয়।… বড় আকারের পরিকল্পনা, বিশেষ করে যেখানে ভারী শিল্পের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যেখানে শিল্পের পত্তন ও উৎপাদনের মধ্যে বেশ কিছুটা সময়ের দরকার, তার অবশ্যম্ভাবী ফল হল মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি ও চাহিদা-যোগানে ক্রমবর্ধমান ফারাক। এরই ফলে, প্রকল্পগুলির রূপায়নে দেরি হয় এবং খরচও বেড়ে যায়। মূল্যবৃদ্ধি ও চাহিদা-যোগানে অসামঞ্জস্যের জন্যই প্রয়োজন হয় নানারকমের কন্ট্রোল; আবার কন্ট্রোলের ফলে আমাদের দেশের সীমিত প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর অনাবশ্যক বেশি চাপ পড়ে।

নিজ বক্তব্যের সমর্থনে উদাহরণ দিয়ে শ্রীটাটা বলেছেন: ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন, ফার্টিলাইজার করপোরেশন, হেভী-ইলেকট্রিক্যাল নাইভেলী লিগনাইট এবং হেভী ইঞ্জিনীয়ারিং করপোরেশন—এই পাঁচটি প্রকল্পে ১৯৬৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত খরচ করা হয়েছে ৬৩০ কোটি টাকা। অথচ ঐ বছর এদের মোট উৎপাদন মাত্র ৫৬ কোটি টাকা, অর্থাৎ লগ্নীর শতকরা ৯ ভাগ মাত্র উৎপাদন হয়েছে।

পরিকল্পনার ধাঁচ কী ভাবে বদলানো উচিত তা বলতে গিয়ে শ্রীটাটা বলেন কতকগুলি মূল লক্ষ্যে সরকারের সমস্ত প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত। এই লক্ষ্যগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান হল কৃষি, পরিবার-পরিকল্পনা এবং সরাসরি কৃষিকে সাহায্য করে এমন সব শিল্প। এইসব বিষয় ছাড়া অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পুঁজি ও উদ্যোগের উপরই নির্ভর করতে হবে। কারণ ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত পুঁজিপতিরা উৎপাদন বাড়িয়ে যাবেন এবং সরকারী প্রশাসনিক ক্ষমতার উপর অকারণ চাপ পড়বে না।…বিদ্যুৎ, ইস্পাত ও নদীপরিকল্পনাগুলি শেষ করতে সময় অনেক লাগবে এবং এই পরিকল্পনাগুলির পরিপূরক হিশাবেই আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সেই সমস্ত শিল্পে নিবদ্ধ করতে হবে, যেখানে মূলধন লগ্নীর অল্প পরেই উৎপাদন শুরু হয়।

শ্রীটাটার সুপারিশগুলি একত্র করলে যা দাঁড়ায় তা হল:

১ পরিকল্পনায় মূলধন লগ্নীর পরিমাণ বিশেষভাবে কমাতে হবে।

২ সরকারি প্রচেষ্টা প্রধানত সীমাবদ্ধ থাকবে কৃষি, পরিবার পরিকল্পনা এবং কৃষির জন্য সরাসরি প্রয়োজনীয় শিল্পগুলির মধ্যে।

৩ যে সমস্ত শিল্পে তাড়াতাড়ি উৎপাদন আরম্ভ হয় (যেমন ভোগ্যপণ্য), সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

৪ অন্যান্য শিল্পে (এবং ভারী শিল্পে যেমন মেশিনটুল, বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, রসায়ন শিল্প, খনিজ শিল্প ও তৈল ইত্যাদি) ব্যক্তিগত পুঁজিকে অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে।

মূলশিল্প চক্ষুশূল কেন

শ্রীদেশাই ও শ্রীটাটা সরকারি উদ্যোগে মূলশিল্প বিস্তারের প্রয়াসকেই আক্রমণ করেছেন। কিন্তু যে সত্যটি তাঁরা গোপন করছেন তা হল এই যে আমাদের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মূলে রয়েছে কৃষি সংকট সমাধানে তাঁরা অপারগ বলেই বোধহয় মূলশিল্পের উপর তাঁদের আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

বিভিন্ন পণ্যে মূল্যবৃদ্ধির গতি তুলনা করলে দেখা যাবে যে ১৯৫২-৫৩ সালের তুলনায় ১৯৬৬-৬৭ সালে খাদ্যবস্তুর দাম বেড়েছে শতকরা ১১৮ ভাগ, তুলা ও কাঁচা পাটে বেড়েছে শতকরা ৯২ ভাগ, তৈলবীজে শতকরা ২১৫

ভাগ আর শিল্পজাত পণ্যের দাম বেড়েছে শতকরা ৫৮ ভাগ। কৃষি উৎপাদনের মন্থরতা ও তার বণ্টনের অব্যবস্থাই মূল্যবৃদ্ধির সংকট সৃষ্টি করেছে।

এখন খাদ্যের দুর্মূল্যতার প্রতিকার কী সে কথাটা আলোচনা করা যাক। খাদ্যের দুর্মূল্যতা যে আমাদের অর্থনীতির বিপর্যয়ের প্রধান কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এটাও বোঝা গেছে যে কন্ট্রোল করে সমস্যার সমাধান হয়নি, বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানিও হ্রাস করা যায় নি। গত দশ বছরে খাদ্যের গড় উৎপাদন প্রতিবছর বেড়েছে শতকরা ২ থেকে ২·৫ ভাগ। এর সঙ্গে বিপুল পরিমাণ খাদ্য আমদানির অঙ্ক যোগ করলে দেখা যাবে, ভারতের জনসংখ্যার (যা বেড়েছে বছরে শতকরা ২·৫ ভাগের কিছু কম) মাথাপিছু খাদ্যপ্রাপ্তি বেশি বই কম হয় না। তাহলে এই দুর্মূল্যতার কারণ কী?

প্রথমত মনে রাখা দরকার যে, আমাদের দেশে জমির মালিকানা খুবই কেন্দ্রীভূত—শতকরা ২৫ ভাগ লোক শতকরা ৮৩ ভাগ জমির মালিক। দ্বিতীয়ত, জমির মালিকানা কেন্দ্রীভূত হলেও চাষ কিন্তু হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতে এবং বড় জমির মালিকরা জমি টুকরো টুকরো করে ছোট ছোট বর্গাদারদের দিয়ে চাষ করায়। ফলে জমির উৎপাদন হয় কম এবং যেটুকু হয় তার অনেকটা পরিমাণ গ্রামের লোকেরাই খেয়ে ফেলে। তৃতীয়ত, গ্রামে যেটুকু উদ্বৃত্ত থাকে তা কেন্দ্রীভূত হয় বড় বড় জমির মালিকদের হাতে। এই মালিকেরা খাদ্যশস্য দীর্ঘদিন ধরে রাখতে পারে, কেননা জমির খাজনা বা ট্যাক্স্ এত কম যে তা মেটাতে এদের উদ্বৃত্তের পুরোটাই বিক্রি করতে হয় না। এই উদ্বৃত্ত সরকার ন্যায্য দামে কিনে নেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন, কেননা এ ব্যাপারে আমলা থেকে শুরু করে ছোট চাষী ও বর্গাদার পর্যন্ত সবাই বড় জমির মালিকের সহায়ক। আবার বহু রাজ্যে (বিশেষ করে উদ্বৃত্ত রাজ্যে) এই জমিদার জোতদার গোষ্ঠীই রাজ্যের শাসক পার্টির মূল কর্ণধার। ফলে গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামের হাটে গঞ্জে এক দুস্থ চাষী ছাড়া খাদ্যশস্য বিক্রি করতে কেউ আসে না। বড় মালিকদের শস্য বিক্রি হয় অন্যপথে, চড়া দামে।

কৃষিতে পরগাছা বৃত্তি

বড় বড় জোতের যারা মালিক, উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে তাদের কোনো

আগ্রহ নেই। একদিকে খাদ্যশস্য মজুত করে বেশি দর পাওয়ার সম্ভাবনা, অন্যদিকে খেতমজুর বর্গাদারদের যৎসামান্য পারিশ্রমিক দিয়ে চাষের মেহনত ও ঝুঁকিটা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা থাকায়, তারা জমিটা টুকরো টুকরো করে ছোট ছোট বর্গাদারদের বিলি করে দেয়। বর্গাদারদের জমির উপর স্থায়ী কোনো স্বত্বও নেই। এই অবস্থায় কখনও উৎপাদন বাড়তে পারে না।

কৃষিতে এই পরগাছা বৃত্তি এতদিন চলে আসার অন্যতম প্রধান কারণ হল, জমিদার জোতদারদের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব। কংগ্রেসের রাজ্য-শাখাগুলিতে জোতদারদের বিপুল আধিপত্য। এরাই গ্রামের শিক্ষিত শ্রেণী, পঞ্চায়েতের নেতা, স্কুল ও কলেজ কমিটির হর্তাকর্তা। এদের দমন করা মানে কংগ্রেসের নিজের পায়ে কুড়ুল মারা।

কংগ্রেস সরকার জোতের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেবার চেষ্টা করলে জোতদারেরা অনায়াসেই জমি বেনামিতে হস্তান্তর করে ফেলে। একমাত্র গ্রামের গরিবরা যদি দলবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করে তবেই জোতের সর্বোচ্চ সীমা বাঁধা যেতে পারে। কিন্তু নানা কারণে সে সংগ্রাম আজও গড়ে ওঠে নি।

আরও একটি ব্যবস্থা নিলে জোতদারদের ক্ষমতা খর্ব করা যেতে পারে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থারও উন্নতি হতে পারে। ভারতের বিভিন্ন প্রগতিশীল অর্থনীতিবিদ দাবি করছিলেন যে, জমির উপর উচ্চহারে কর বসানো হোক। অধ্যাপক কে. এন. রাজের হিশাব মতে, ১৯৫২-৫৩ সাল থেকে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত শহরাঞ্চলে যে আয় বেড়েছে তাব শতকরা ৪০ ভাগ সরকার ট্যাক্স্ করে নিয়েছেন, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বাড়তি আয়ের শতকরা ১৪ থেকে ১৫ ভাগ মাত্র সরকার ট্যাক্স্ হিশাবে নিয়েছেন। কৃষির উপর ট্যাক্স্ করার ক্ষমতা কেবলমাত্র রাজ্য সরকারগুলিরই আছে। এ কাজে রাজ্য সরকারগুলির, বিশেষ করে কৃষিপণ্যে উদ্বৃত্ত রাজ্যের সরকারদেব ঔদাসীন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অথচ এই সমস্ত রাজ্যের সরকারেরাই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ওভারড্রাফট নিযে এবং দেনা শোধ না করে মুদ্রাস্ফীতিকে বাড়িযে দিচ্ছে।

অধ্যাপক রাজের সুপারিশ

অধ্যাপক রাজ সুপারিশ করেছেন যে, পাঁচ একরের বেশি জমির উপর

ট্যাক্স্ দ্বিগুণ করা হোক। পাঁচ একরের নীচের জমিকে ছাড় দিলে গ্রামের শতকরা ৭৫ ভাগ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তিনি আরও বলেছেন যে, জোতদার যে খাজনা আদায় করে তার উপরও ট্যাক্স্ ধার্য হোক। বড় বড় জোতদারদের উপর এই ট্যাক্স্ বসলে তারা বাধ্য হবে উৎপাদন বাড়াতে এবং পণ্য তাড়াতাড়ি বাজারে ছাড়তে।

অবশ্যই তারা এই ট্যাক্স্ ফাঁকি দিতে পারে বা এর বোঝাটা গরিব কৃষক ও বর্গাদারদের উপর চাপিয়ে দিতে পারে। তা প্রতিরোধ করতে হলে খেতমজুর-বর্গাদার ও ছোট কৃষকের মিলিত সংগ্রাম প্রয়োজন। কিন্তু কি কেন্দ্রীয় সরকার, কি রাজ্য সরকার, কেউ-ই যে এ ব্যাপারে কোনো মন দিচ্ছেন না, তার কারণ জোতদার-জমিদারদের অপরিসীম রাজনৈতিক প্রভাব। জোতদারদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা খর্ব হলে দেশের ধনতান্ত্রিক বিকাশ রুদ্ধ হয় না, বরং সে বিকাশ আরও দ্রুত ও ব্যাপক হয়। কেননা কৃষিজাত কাঁচামাল এবং খাদ্য শস্তা হলে শিল্প মালিকদেরই উৎপাদন খরচ কমবে। গত কয়েক বছরে শিল্পজাত পণ্যের দাম যে হারে বেড়েছে, খাদ্য ও কৃষিজাত কাঁচামালের দাম বেড়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি।

জে. আর. ডি. টাটা আমাদের বর্তমান দুরবস্থার জন্য পরিকল্পনায় ভারী শিল্প স্থাপনের প্রয়াসকেই দায়ী করেছেন এবং পরিকল্পনা ছাঁটাই করতে বলেছেন। কিন্তু ঐ বক্তৃতায় আরেক জায়গায় তিনি স্বীকার করেছেন: ভারতের কৃষি-উৎপাদিকা শক্তিকে বাড়িয়ে খাদ্য ও কাঁচামালের চাহিদাকে পূরণ করার কার্যকর ব্যবস্থা যদি নেওয়া হত, তাহলে লক্ষ লক্ষ মানুষ বর্তমানে যে দুর্ভোগ ভোগ করছে তা থেকে তারা রেহাই পেত এবং শুধু তাই নয়, মূল্যবৃদ্ধি হত না বা অনেকাংশে কম হত। টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস করারও প্রয়োজন হত না এবং অর্থনীতির চেহারা অনেক ভালো হত। কৃষির উৎপাদিকা শক্তি যে বাড়ে নি তার জন্য শ্রীটাটা পরিকল্পনাকে দায়ী করেন নি, দায়ী করেছেন পরিকল্পনার রূপায়ণে রাজ্য সরকারদের ব্যর্থতাকে।

শ্রীটাটা এবং শ্রীমোরারজী দেশাই ধরে নিয়েছেন যে, জোতদার-জমিদারদের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ তাঁরা বন্ধ করতে পারবেন না। তাই দাবি উঠছে— মূল শিল্পের প্রসার বন্ধ করো, ব্যক্তিগত পুঁজিকে অবাধ অধিকার দাও,

মজুরি বৃদ্ধি রোধ কব। পনেরো বছর আগে শিল্পায়নের যে স্বপ্ন দেখত ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণী আজ তা বাষ্পে বিলীন হতে চলেছে। মূলশিল্পের প্রসার বন্ধ করে ব্যক্তিগত পুঁজিকে অবাধ-অধিকার দেওয়ার অর্থ, বিদেশী পুঁজির আধিপত্য মেনে নেওয়া। এই কারণেই ভারতীয় শাসক শ্রেণী এতকাল এ দাবি মেনে নেয় নি। আজ সামন্ত প্রথার প্রতিরোধে হীনবল হয়ে তারা যে পথ নিতে বলেছে তা বিদেশী অর্থনৈতিক আধিপত্যের পথই সুগম করবে। এ পথ যদি তারা নিতে সক্ষম হয় তাতে দেশে নেমে আসবে মন্দা ও বেকারির অভিশাপ এবং শ্রমিকশ্রেণীই হবে তার মোক্ষম শিকার। তাই সামন্ততান্ত্রিক প্রথাব চূড়ান্ত অবসান ঘটাতে শ্রমিক-শ্রেণীকেই এগিয়ে আসতে হবে।

নিবেদন

সুধেন্দু মল্লিক

না তুমি এসো না। ছবিও পাঠিয়ো না।
তোমার ছোট্ট ছবি আমাব সব দেয়াল কেড়ে নেবে।
যদি শ্বাস ফেলতে ভয় হয়
আমি কতদিন বুকের ভেতর ধবে বাখব।

তুমি একটিও পা রাখলে এই ছায়াদীর্ঘ
বাড়িতে আমাব দাঁড়িয়ে থাকার স্থান হবে না।
আমি এত নিরভিমান নই
মাটির ভেতর চিরদিনের মতো ডুবে যাব।

সারা রাতেব বৃষ্টিতে ভিজে
মমতাহীন ঝাউ গাছ হাওয়ায় সারা শরীব
ছিন্নভিন্ন করে বলে উঠল, না তুমি এসো না—
না ছবি—না তুমি।

'স্পুৎনিক' মনুষ্যনির্মিত উপগ্রহ নয়, একটি নতুন পত্রিকা। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত এই পত্রিকাটির প্রকাশন শুরু হয়েছে এ-বছরের জানুয়ারি মাস থেকে। কিন্তু এই ছ-সাত মাসের মধ্যেই এদেশে এবং পৃথিবীব যে অংশেই ইংরেজি ভাষা পঠিত হয় সেখানেই, পত্রিকাটি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে।

এককালে সোভিয়েত পত্র-পত্রিকা বলতেই যে গুরুগম্ভীর চেহারার, রামগরুডের ছানার মত হাসতে মানা, শুষ্কং কাষ্ঠং এক ধরনের রচনার সংকলন বোঝাত—স্পুৎনিক তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।

অবশ্য ইদানীংকালে সব সোভিয়েত পত্র-পত্রিকারই (ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাব কথাই বলছি) অল্পবিস্তর পরিবর্তন হয়েছে। 'সোভিয়েত লিতারেচার' পত্রিকাটি বছর পনেরো-কুড়ি আগে ভক্তিভরে আমবা অনেকেই কিনতাম, কিন্তু কজনে পডতাম জানি না। আমি অবশ্য স্বীকার কবতে পাবি, ঐ পত্রিকাটির বেশ কিছু সংখ্যাই আমাব শেলফে এখনও অপঠিত অবস্থায় সযত্নে রক্ষিত আছে। পডবার সদিচ্ছার যে অভাব ছিল তাও নয়। কিন্তু ওই যে মার্ক টোয়েন বলেছিলেন, ধ্রুপদী সাহিত্য হচ্ছে সেই সাহিত্য যা পড়া থাক তা সকলেই চায়, কিন্তু কেউ পড়ে না। আমাবও হয়েছিল সেই অবস্থা। সেই 'সোভিয়েত লিতারেচার' পত্রিকাটিরও এখন ভোল পাল্টে গেছে। সেই ভীতিজনক গাম্ভীর্য আর নেই। কিন্তু তাই বলে পত্রিকাটির রচনার মানের যে কোনো অবনতি হয়েছে তা নয়।

স্পুৎনিক অবশ্য একেবারেই ভিন্ন জাতের পত্রিকা। নির্বাচিত একটি পাঠকগোষ্ঠী এর লক্ষ্য নয়, আপামর পাঠক সাধারণের কাছে পৌছুনর উদ্দেশ্যেই যে পত্রিকাটি পরিকল্পিত, প্রথম মলাট থেকে শেষ মলাট পর্যন্ত, উল্টে গেলেই তা পরিষ্কার হযে যায়। পাতায পাতায় ছবি, কারটুন, অসংখ্য রঙীন ছবি। লেখাগুলি হালকা চালের। ট্রেনে যেতে যেতে, রাত্রিবেলা ঘুমোবার আগে শুয়ে শুয়ে, আবার টেবিলে আটসাঁট হয়ে বসেও এই পত্রিকাটি অনাযাসে পড়ে যাওয়া যায়। কিন্তু লেখাগুলি হাল্‌কা চালের হলেও, হাল্‌কা মানের লেখা নয়। যে-পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে আছেন শলোখোফ, পাউস্তভস্কি, ফেদিনের মত সর্বাগ্রগণ্য সাহিত্যিক, কেলডিশ, কাপিৎসা, এঙ্গেলহার্ডেব মত বিজ্ঞানী, শস্‌তাকোভিচের মত সংগীতকার, সে-পত্রিকার রচনাব মধ্যে শুধুই যে চটক থাকবে, সারবস্তু থাকবে না, তা হতেই পারে না।

পাঠকদের মধ্যে নানা স্তরভেদ আছে। শুধু তাই নয়, একই পাঠকের নানা রকমের চাহিদা আছে। এমন অনেক দুর্ধর্ষ পণ্ডিতকে আমি চিনি, যাঁরা গুরুতর কাজের ফাঁকে ফাঁকে গোগ্রাসে আগাথা খৃষ্টি গেলেন। পরিচয়-এ সুধীন দত্ত মশাইযের আমলের মতো দাঁতভাঙা প্রবন্ধ কম বেরোয় বলে অভিযোগ করেন, কিন্তু নিজেরা কিনে পড়েন 'দেশ', এমনকি 'জলসা', 'উল্টোরথ'ও, আর ট্রেনে যেতে যেতে অবশ্যই 'রীডার্স ডাইজেস্ট'। ইংরেজিতে যাকে বলা যায় 'রিল্যাক্সড রিডিং' তারও একটা প্রয়োজন আছে। 'রীডার্স ডাইজেস্ট' প্রভৃতি কুপথ্য ছাড়া এতদিন এই চাহিদার আর কোনও খোরাক ছিল না। স্পুৎনিক সে প্রয়োজন মেটাবে, কিন্তু কুপথ্য দিয়ে নয়।

'রীডার্স ডাইজেস্ট' ধরনের হলেও এইখানেই তার সঙ্গে 'স্পুৎনিক'-এর মৌলিক পার্থক্য। 'স্পুৎনিক' সম্পূর্ণতই একটি সোভিয়েত পত্রিকা। সোভিযেত জীবনদর্শন, সোভিয়েত জীবনযাত্রার ধরন পত্রিকাটির প্রতিটি পৃষ্ঠায প্রতিফলিত। 'লেনিনের সঙ্গে তিনটি সাক্ষাৎকার' (এপ্রিল সংখ্যা) বা 'রুশ বিপ্লবের প্রথম দিন' (জুন সংখ্যা) প্রভৃতি রচনাগুলি অবশ্যই সুখপাঠ্য কিন্তু তাই বলে অন্তঃসারশূন্য নয়। কিংবা ধরা যাক, 'নিউজ ফ্রম দ অ্যান্টিওয়ার্ল্ড' (মে সংখ্যা) প্রবন্ধটি। এতে বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্বকে অত্যন্ত সহজ ভাষায ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যা চকচক করে তা সবই সোনা না হতে পারে, কিন্তু সোনাও চকচক করে।

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা 'স্পুৎনিক' পত্রিকাটি আরও একটি সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দেয়। সে সমস্যা হল ভাবের ঘরে চুরি না করেও পত্রিকাকে জনপ্রিয় করার সমস্যা। বিশেষিত বা উচ্চকোটির পাঠকদের জন্য পত্রিকা নিশ্চয়ই থাকবে এবং তার প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। কিন্তু যাঁরা চান প্রগতিশীল চিন্তাধারা আপামর জনসাধারণের মধ্যে চারিয়ে যাক, তাদের অবশ্যই ভাবতে হবে কিভাবে পত্রিকাকে জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায়।

কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, প্রগতিশীল পত্রপত্রিকা যাঁরা চালান, এ-সমস্যাটি তাঁদের একেবারেই ভাবিত করে না। তাঁরা আদর্শের জন্য কাগজ বের করেন আর আদর্শের জন্যই শহীদ হতে চান। আর এইসব পত্রপত্রিকার প্রচার-সংখ্যা তাই কয়েক হাজারেই সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ যারা দীক্ষিত তারাই শুধু সে কাগজ পড়ে। তাতে লাভ কী? শহীদ নিশ্চয়ই সম্মানের পাত্র, কিন্তু আদর্শের প্রচার তার চেয়েও বেশি প্রয়োজনীয়। আদর্শের জন্যে কাগজ বের করে কেউ সর্বস্বান্ত হলে তাকে নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা করব, কিন্তু আদর্শে অটুট থেকেও যে-সম্পাদক লক্ষ লক্ষ পাঠককে আকৃষ্ট করতে পারবেন তাঁকে ঢের বেশি সাধুবাদ জানাব।

কিন্তু কথায়ই আছে স্বভাব যায় না মলে। দীর্ঘদিন একভাবে ভাবতে ভাবতে আমাদের এমন একটা চিন্তা-জড়তা এসে গেছে যে অভ্যস্ত পথের বাইরে একটু পা বাড়াবার চেষ্টা হলেই একেবারে গেল গেল রব উঠে পড়ে।

চারজন "বাম" (শিশুসুলভ বিকার অর্থে)-কমিউনিস্ট-সম্পাদিত **'কালপুরুষ'** নামধেয় একটি সংকলনগ্রন্থে তাই এই ধরনের গেল গেল রবের প্রতিধ্বনি শুনে বিস্মিত হই নি। পেশাদার সোভিয়েতবিরোধিতায় এই ধরনের বামপন্থীরা যে সি-আই-এর অর্থপুষ্ট কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডমকেও লজ্জা দিতে পারেন তা জানাই ছিল। কিন্তু বিস্মিত হতে হল এঁদের পর্বত-প্রমাণ অজ্ঞতায় এবং মাত্রাজ্ঞানের অভাবে। এঁরা 'স্পুৎনিক'-এর সমালোচনা-সূত্রে একেবারে প্রমাণ করে ছাড়লেন সোভিয়েত ইউনিয়নে এখন সাংস্কৃতিক প্রতিবিপ্লব শুরু হয়ে গেছে! সম্পাদক চতুষ্টয় অবশ্য সংস্কৃতি বিপ্লব বলতে কি বোঝেন, বা আদৌ কিছু বোঝেন কি না, তা কোথাও স্পষ্ট করে বলেন নি।

তবে সংস্কৃতি বিপ্লবের অর্থ যদি হয় শেক্সপীয়র, গ্যয়েটে , বালজাক, বেঠোফেনের বহ্ন্যুৎসব—তবে কালপুরুষের চার-ইয়ারি সংস্কৃতি-সংবাদে যাকে 'প্রতিবিপ্লব' বলা হযেছে তাই শ্রেয়। কেননা, মার্কস-এঙ্গেলস্ ও লেনিন সেই 'প্রতিবিপ্লবী' দলেই পড়বেন। প্রলেতারিয় সংস্কৃতি ভুঁইফোড় কিছু নয় এবং "বিশ্বমানবের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে" এগিযে নিয়ে যাবার কথাবার্তা লেনিনই বলেছেন। সম্পাদক চতুষ্টয় একটু কষ্ট করে তরুণ কমিউনিস্ট লীগের প্রতি লেনিনের অভিভাষণ পড়ে দেখবেন।

শলোখোফ ইয়েভতুশেঙ্কো ইত্যাদি সম্পর্কে সম্পাদকদের চার-ইয়ারি এতই অশ্রদ্ধেয় যে তা নিযে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তাতে লাভও হবে না। কারণ মার্কস তো বলেইছিলেন, যাদের সংগীতের কান নেই সূক্ষ্মতম সংগীতও তাদের কাছে অর্থহীন। কিন্তু সবচেয়ে তাজ্জব লাগল যে কাগজের সম্পাদকদের মধ্যে দুজন কলকাতার কলেজে ইংরেজি পড়ান, তাঁরা খবর রাখেন না কিপলিং-এর প্রকৃতিবিষয়ক গল্পগুলি বিশ্ব-সাহিত্যের সম্পদ। সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি এতদিনে এই গল্পগুলি প্রকাশ করে থাকেন তবে তা তাঁদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বয়ঃপ্রাপ্তিরই লক্ষণ। আর মার্কস-এঙ্গেলসের নন্দনতত্ত্বে আপাতবৈপরীত্যের একটা তত্ত্বও সম্ভবত আছে। সজ্ঞান রাজতন্ত্রী বালজাক নিজের রচনায় নিজের মতকেই খণ্ডন করেছিলেন নিজের অজ্ঞাতসারে।

সম্পাদক চতুষ্টয কিন্তু তাঁদের জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখিযেছেন 'সোযান লেক' ব্যালে সম্পর্কে মন্তব্যে। তাঁরা লিখেছেন. "সোভিযেতের নিজস্ব সৃষ্টির দিকেও একটু তাকান যেতে পারে। কোন বিপ্লবী সংস্কৃতির পরিচয বহন করছে 'সোয়ান লেক' ব্যালে? সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যালে কতটুকু সাহায্য করছে? পৃথিবীর জনজীবনের বাস্তবতা এবং কঠোর সংগ্রাম এর মধ্যে কতটুকু ফুটে ওঠে?"

সম্পাদক চতুষ্টয়কে সবিনয়ে জানিয়ে রাখি, 'সোয়ান লেক' ব্যালে "সোভিয়েতের নিজস্ব সৃষ্টি" নয়, সোভিযেত বিপ্লবের বহুযুগ পূর্বে এই নৃত্যনাট্যটি রচনা করেন চাইকোভস্কি এবং তদবধি এটি পশ্চিমী ব্যালে নৃত্যের জগতে একটি ধ্রুপদী কর্ম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। সোভিয়েত ইউনিয়নেও স্তালিন আমল থেকেই এটি মঞ্চস্থ হচ্ছে। দেশের এবং বিশ্বের

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বর্জন করা মাওবাদসম্মত হতে পারে, মার্কসবাদসম্মত নয়।

আর একটা কথা, কালপুরুষের সম্পাদকেরা কি তাঁদের বিপ্লবের জগৎ থেকে রূপকথাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে চান? তবে কি বুঝতে হবে সব সময় দাঁতমুখ খিঁচোনোই বিপ্লবীর ধর্ম?

কিন্তু আরও তাজ্জব হয়ে যেতে হল মার্কিন সংবাদপত্রের উপর কালপুরুষের ভদ্রলোকদের অপরিসীম আস্থা দেখে। তাঁরা 'নিউ ইযর্ক টাইমস্' থেকে উদ্ধৃতি (উদ্ধৃতির সত্যাসত্য আমরা অবশ্য যাচাই করে দেখি নি) দিয়ে তাঁরা লিখলেন, "নারীর সৌন্দর্যের উপর সংলাপের সংক্ষিপ্তসার নগ্নদেহের চিত্র-সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।" তারপরই সংশোধনবাদীদের হাতে পড়ে সোভিয়েতের অধঃপতনের বিষয়ে দীর্ঘ ক্লান্তিকর এক বক্তৃতা।

সম্পাদক-চতুষ্টয় অ্যাকাডেমিশিয়ান ফ্রান্তসেভকে "স্পুৎনিক নামক সোভিয়েত পত্রিকাখানি উল্‌টিয়ে" দেখতে পরামর্শ দিয়েছেন, কিন্তু নিজেরা সে কষ্ট স্বীকার করেন নি, যদিও পত্রিকাটি এদেশে মোটেই দুষ্প্রাপ্য নয়। যে রচনাটি সম্পর্কে 'নিউ ইযর্ক টাইমস'-এর মন্তব্য পড়ে সম্পাদক চতুষ্টয়ের চোখ খুলেছে, তা মোটেই নারীর দৈহিক সৌন্দর্যের আলোচনা নয়—নারীর সৌন্দর্য দৈহিক না মানসিক, তাই এই আলোচনার বিষযবস্তু। আর তাঁরা যাকে "নগ্নদেহের চিত্র" বলেছেন তা হল পিকাসোর আঁকা একখানি ছবি, ভিনাস ডি মেলোর একটি প্রতিকৃতি এবং কযেকটি প্রাচীন চিত্র।

প্রদ্যোৎ গুহ
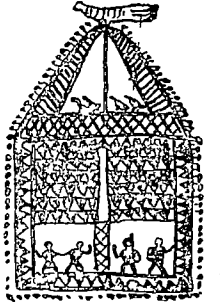
নাট্যসমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি

পত্রিকায় নাট্যসমালোচনা পড়তে পড়তে রাম বসুর কাব্যনাট্যের কোনো এক চরিত্রের মত মাঝে মাঝে নাটুকে ঢঙে বলে উঠতে ইচ্ছে করে, 'আমি কিছু বুঝি নে, ঈশ্বর!'

ভাবাদর্শের কথা বলব। তার আগে চোখে-দেখা একটা ঘটনার কথা বলি। এক হাল-ফেরা গ্রাম্য মহিলা হিল-তোলা জুতো পরে লগবগ করতে করতে র‍্যাকেট হাতে টেনিস খেলতে চলেছেন। দেখা হতে কিছুটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় চললেন?' হেসে উত্তর, 'এই একটু আউট অব দি নলেজ করতে।' আমি হতবাক—'আউট অব দি নলেজ?' মিষ্টি মধুর হেসে উত্তর, 'ইংলিশ মিডিয়ামে সব শেখাচ্ছে—খুব নলেজ হয়। আজকাল সব ভদ্রঘরের মেয়েরাই তো এসব শিখছে।' তাই বলো, টেনিস খেলতে যাবার পথে উনি জ্ঞান বাড়াতে ইংরিজি শেখবার ক্লাসে যাচ্ছেন! বাঃ, বেশ তো—জিজ্ঞেস করলাম, 'টেনিস খেলতে ভালো লাগে?' উত্তর, 'আমি খুব ইন্টারেস্টিং।'

ইন্টারেস্টিংই বটে। পত্রিকার এইসব নাট্যসমালোচনাও এমনি ইন্টারেস্টিং। অন্তত আমার কাছে।

আষাঢ় সংখ্যার 'পরিচয়ে' শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাকি ইতিহাস' সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'অথচ বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পর বুদ্ধিনির্ভর প্রশ্নসংকুল আধুনিক ধর্মের এমন প্রকাশ বোধহয় বাদল

সরকারের আগে আর কারো রচনায় ঘটে নি।' লিখেছেন, 'বাকি ইতিহাস ভাবাবে, প্রচণ্ড ভাবাবে—এই কৃতিত্ব তাঁকে অসাধারণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।'

আমি 'বাকি ইতিহাস' দেখেছি। কথায় বলে, কিসের সঙ্গে কি, পান্তা-ভাতে ঘী। এবং আমার এমনই পোড়াকপাল, প্রচণ্ড ভাবানো তো দূরের কথা—'বাকি ইতিহাস' আমাকে ভাবিয়েছে অন্য কারণে। ভেবেছি—নাটকে যে জিনিস আছে, তা বাইরে থেকে আনা—তাও মাশুল না দিয়ে আমদানী। সার্ত্র বা কাম্যু-র অস্তিত্ববাদী লেখায় যে রস পাই, মনে যে ভাবনার ঘোর লাগে—এসব নাটক সে অনুভূতি জাগাতে পারে না কেন?

'বাকি ইতিহাসে' যেটুকু দিশি রস, তাও বহুরূপীর প্রযোজনার গুণে। নাট্যকার প্রখর ও সতর্ক, তবু তাঁর চিন্তায় গভীরতার অভাবে সমস্তক্ষণ একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব আনে। সংলাপে ধার আছে, কিন্তু ভার নেই, ভাবের রাজ্যে নতুন আবিষ্কার নেই। আজকাল সংলাপের ওপর নাটকের সিচুয়েশন খুব নির্ভর করে। আর সেই সংলাপে থাকতে হবে এমন কিছু, নাটক শেষ হওয়ার পরেও যা মনের মধ্যে ঘুরঘুর করবে। নাটকে দর্শকের ব্যথাবেদনা, ঘৃণা ভালবাসা—এক কথায়, বুদ্ধিতে মাটির টান—না থাকলে তা হয় না।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমালোচনার শেষদিকে আলোচ্য নাটকে নায়কের আত্মজিঘাংসা যে কী ভয়ানক মডার্ন (এবং 'অস্তিবাদী'।) তা প্রমাণ করতে গিয়ে দর্শকদের কল্পিত কিছু আপত্তির কথা তুলে অনর্থক সওয়াল-জবাব করেছেন। লিখেছেন, 'এই আত্মহত্যাসাধের নাটকবিচ্ছিন্ন বিচার নাট্যদর্শকেরই দুর্বলতার প্রমাণবহ।'

আমিও সেই নাট্যদর্শক। তবে আমি নাটকের পরিণতিতে আত্মহত্যা দেখে বিচলিত হওয়া দূরের কথা, অবাক পর্যন্ত হই নি। নাটকের আদি থেকেই তো নাটকে আত্মহত্যা বা খুন চলে আসছে। পিতামহ ভীষ্ম বা মহাভারতের দেশে আত্মহত্যা বা খুন দেখে আমরা চমকাই না।

আপত্তি এ জন্যে নয় যে, এ নাটকে আত্মহত্যা আছে। আসলে যেভাবে আছে, সেই ভাব নিয়েই প্রশ্ন। এও বলি, নাটকের শেষদিকে নায়কের সঙ্গে ভূতের আলোচনাটি ততোধিক ক্লান্তিকর—হাস্যকরও বটে।

আমার আপত্তিটা একটি বিশেষ সমালোচনা উপলক্ষ করে হলেও আসলে নাট্যসমালোচনার একটি বিশেষ ধারার বিরুদ্ধে। আমার মতে, এই একই ধারার দৃষ্টিভঙ্গীর উদাহরণ 'পরিচয়ে' কয়েক সংখ্যা আগে অজিষ্ণু ভট্টাচার্যের লেখা 'কলকাতার থিয়েটার· এক বছর'। এই প্রবন্ধ পড়ে মনে হয়, সমালোচকের দৃষ্টি একটি বাঁধা গণ্ডিতে ঘুরছে। তার বাইরেও ছোট বড নামী-অনামী নাটক-পাগল নানা দল যে-সব চেষ্টা করছে বা চেষ্টা করেও পারছে না—সে সম্বন্ধে উন্নাসিক হলে চলবে কেন ?

যেমন, ঠিক হয নি থিয়েটারের ঐ সালতামামিতে 'নক্ষত্র' গোষ্ঠীকে এবং নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে পুরোপুরি উপেক্ষা করা। 'মৃত্যুসংবাদ' গত বছরে খুব কম বার অভিনীত হয নি। যে নাটকেব দোষত্রুটি সত্ত্বেও শ্যামল ঘোষ অভিনযের গুণে দিনের পর দিন দর্শক মনকে নাড়া দিযেছেন, তাব অনুল্লেখ চোখে লাগে। 'বাকি ইতিহাসে' যে ভাবাদর্শের ঢাক পেটানো হয়েছে, 'মৃত্যুসংবাদ'ও মোটের ওপর সেই পথেরই পথিক। এও রোয়া জিনিস ; তবে বিদেশের ভাবকে এদেশের মাটিতে বসিযেও মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাতে কিছুটা দিশি রস যোগান দিতে পেরেছেন। মতভেদ সত্ত্বেও তাঁকে তাঁর প্রাপ্য দিতে কেন কার্পণ্য করা হবে ?

এইসব 'আঁধোর' ভাবাদর্শের সঙ্গে আছে নাটকের ক্ষেত্রে 'অস্তিত্ববাদ' 'কিমিতিবাদ' ইত্যাদির রকমারি আবাদ। ওতে কী হবে ? আমাদের জমিই যে আলাদা। ও প্রান্তে একদল বেশি খেযে ঢেঁকুর তুলছে বলে খালি পেটে ওদের দেখাদেখি আমাদেরও ঢেঁকুব তোলা সাজে না।

বরং, ভালো বলব অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পরের জিনিস তিনি কখনও নিজের বলে চালান না। দিশি ছাঁচে তিনি তাকে ঢেলে নেন শুধু দূরের জিনিস কাছে আনার জন্যে।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায কোন্ ভাবধারা প্রচার করতে চান ? শুনুন তাহলে—

> "······সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের অসম বিকাশে এবং শ্রেণীগত, বর্ণগত, জাতিগত ও ভাষাগত বিভেদেব আনুষঙ্গিক অসংখ্য ব্যবধানেব ফলে সমগ্র সমাজেব কাছে সমান গ্রহণীয় হবে এমন নাটক রচনাই প্রায় অসম্ভব বলেই ধরতে হবে, অন্তত প্রমোদ বিতরণের লক্ষ্য পেরোবার সাধ থাকলে। শিল্পরুচির

> এই বিশেষ প্রশ্নটি জাতীয় সংহতির জটিল প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। বাদলবাবুর নাটক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের জন্যই লেখা, একথা স্বীকার করতে কোন লজ্জা নেই ; বরং সৌখিন মজদুরির চেয়ে ঢের ভালো নিজের পরিচিত পরিমণ্ডলকে গ্রহণ করা, এতে মননগত সততার মান থাকে।"

এ তো প্রায় গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়ার ব্যাপার। 'বাদলবাবুর নাটক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের জন্যই লেখা' ? সৃষ্টিশীল লেখার কি আবার আমার-তোমার আছে নাকি ? কোনো একটা শ্রেণীর জন্যেই লেখা ? লেখক তো পরিচিত পরিমণ্ডল নিয়েই লিখবেন। লেখা উচিত। কোনো বিশেষ শ্রেণীকে নিয়ে লিখলেই সে লেখা শুধু সেই শ্রেণীর 'জন্যই' হয় না। সাহিত্যে এরই নাম 'উত্তীর্ণ হওয়া'।

'সৌখিন মজদুরি' নিয়েও প্রবন্ধটিতে কটাক্ষ আছে। যাঁরাই 'কুলিমজুর' বা 'চাষাভুষো' নিয়ে নাটক লেখার চেষ্টা করছেন, লেখক কি তাঁদেরই এই বলে ঠেস দিতে চান ? এখানেও সেই উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যাপার। না উৎরোলে হল না। বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবীগর্জনে' আছে চাষীদের জীবন। তাই বলে সে নাটক শুধু চাষীদের জন্যেই নয়। দর্শক সাধারণ তা দেখে নাটকের রস পায়। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবাদর্শকে প্রশ্রয় দিলে কোন্ দিন কেউ বলে না বসে—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও করেছেন 'সৌখিন মজদুরি'। আর রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ? নাকি, যত দিন যাচ্ছে চাষীমজুরদের ততই আমরা অপরিচিতের কোঠায় ঠেলে দিতে চাইছি ?

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পেশাদারির গড্ডালিকায়

বিশ্বরূপা-কর্তৃপক্ষ থিয়েটার সেণ্টার-এর সুপরিচিত নাট্য-প্রযোজক তরুণ রায়কে নতুন নাটক প্রযোজনার দায়িত্ব দেওয়ায় মনে হয়েছিল যে, পেশাদারী নাট্যপ্রযোজনার চরিত্রে হয়ত কিছুটা হেরফের হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তা হয় নি।

ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের 'লেবেডেফের রঙ্গিনী' নামক উপন্যাসটির নাট্যরূপ

'রঙ্গিনী'। নাট্যরূপ দিয়েছেন তরুণ রায় নিজে। 'লেবেডেফ' নামে থিযেটার সেণ্টার-এ এই নাটকটি শ্রীরায এর আগেও কয়েকবাব প্রযোজনা করেছেন। আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র থেকেও নাটকটি 'লেবেডেফ' নামেই প্রচারিত হয়। বিশ্বরূপায প্রযোজনাকালে সেই একই নাটকেব নাম দেওযা হল 'রঙ্গিনী'। দর্শক আকর্ষণের ইচ্ছাই যে এর পেছনে কাজ করেছে একথা শ্রীরায নিজেও স্বীকার কবেন। পেশাদার রঙ্গালয চালাতে গেলে জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য অনেক ধরনের চেষ্টা করতে হয়। আমার বক্তব্য সে-ব্যাপারে নয। আমি ঘটনাটির উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, 'রঙ্গিনী' নাটকের নায়িকা চম্পাকে ইতিহাসে পাওযা যায় না। বাংলা নাটকের আদিতম পর্যায়ের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব গেরাসিম লেবেদেফ। তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই নাটকের নামকরণেই যে ইতিহাসবোধের অভাব প্রতিফলিত, আগাগোড়া নাটকটিতেও সেই অভাব আমাদের পীড়া দেয়।

রুশ পর্যটক গেরাসিম লেবেদেফ ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দের অগস্ট মাসে মাদ্রাজে পৌছন। ঠিক দু বছর পরে তিনি আসেন কলকাতায়। তাঁর বয়স তখন আটত্রিশ। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দেব নভেম্বরে লেবেদেফ আপন ব্যয়ে নির্মিত মঞ্চগৃহ 'বেঙ্গলি থিযেটার'-এ প্রথম বাংলা নাটক অভিনয় করান। দেশী নট-নটী অভিনীত এই নাটক দ্বিতীয়বার প্রযোজিত হয় ১৭৯৬-এর মার্চ মাসে। বাংলা নাটক অনুবাদ ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে আশ্চর্য উৎসাহ ও নিষ্ঠা দেখিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় এই বিদেশী। এ-দেশের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও অভিনিবেশ ছিল; নাটকাভিনয নিয়ে মেতে ওঠার আগে তিনি হিন্দী ও বাংলা ব্যাকরণ রচনার মত দুরূহ ও শ্রমসাধ্য কাজে হাত দেন। বাংলা ও হিন্দী উভয় ভাষাতেই তিনি শব্দকোষ সংকলন করেন এবং 'প্রতিদিনের ব্যবহারের এবং গম্ভীব বিষয়ের উপযুক্ত কথোপকথনমালা' রচনা করেন।

সুদূর রাশিয়া থেকে আসা এই বিদেশী মানুষটি কেমন করে বাংলাদেশের ভাষা ও মানুষের প্রেমে জড়িয়ে পড়লেন, তৎকালীন দেশীয় সমাজ কী ভাবে তাঁকে গ্রহণ করল, কেমন করে তিনি বাংলায় নাটকানুবাদ ও প্রযোজনার ব্যাপারে উৎসাহী হলেন তার বিশ্লেষণ নাটকের শুরুতে একটি কৌতূহলোদ্দীপক অধ্যায় যোগ করতে পারত। 'বেঙ্গলি থিয়েটার'-এ

লেবেদেফের প্রযোজনা অবশ্য 'রঙ্গিনী'তে বড় অংশ জুড়ে আছে, কিন্তু পরবর্তী পাঁচ-ছ বছরের ঘটনা উপস্থাপন অস্পষ্ট। চম্পা নামক একটি উৎপীড়িতা নারীকে ঘিবে নাটকের যে একটি বিশদ আখ্যানাংশ, তাও অতিনাটকীয়তার দরুন তার আবেগগত তাৎপর্য হারিয়েছে। বাইরের সমস্ত ঘটনার অন্তরালে একলা একটি মানুষের মন, স্বপ্ন, সংগ্রাম ও হতাশা নিয়ে তার একান্ত ব্যক্তিগত যে জগৎ, তার কোনো আভাসই লেবেদেফের চরিত্র-বিশ্লেষণে পাওয়া যায় না। তার ফলে, ইতিহাসের এই চরিত্র পুঁথির পাতা থেকে উঠে এসে একটি রক্তমাংসেব মানুষ হিসেবে আমাদের কাছে দাঁড়ায় না।

অন্তত সেট্, আলো ও পোশাকপরিচ্ছদের সমন্বিত ব্যবহারে নাটকটিকে কিছুটা আকর্ষণীয় করে তোলা যেত। সেট্ খাপছাড়া, এলোমেলো এবং নাটকে মোটেই পুরোপুরি ব্যবহৃত নয়। আলোর কাজ অত্যন্ত মামুলি, মাঝখানে একবার হঠাৎ পেছনের পর্দায় ক্রমাগত মেঘ ভেসে যাওয়ার দৃশ্য অবান্তর ও হাস্যকর। তেমনি কষ্টকল্পিত মনে হয় আগুন লেগে বেঙ্গলি থিযেটাব পুড়ে যাওয়ার দৃশ্য। আলোর বোর্ড থেকে ক্রমাগত সিগারেটের ধোঁয়া উইংসের ফাঁক দিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করছিল। কয়েকটি চবিত্রের ক্ষেত্রে যুগোচিত পোশাক লক্ষ করা গেল, কিন্তু অপ্রধান ছোটখাট চরিত্রগুলি সারাক্ষণ বিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগের বেশবাস নিয়েই মঞ্চে অবতীর্ণ। এই হাস্যকর সমন্বয়ে প্রযোজকের ইতিহাস-চেতনা ও শিল্পবোধের অভাব বোঝা যায়। গান এবং নাচের ব্যবহারেও তেমন সংযম বা নিষ্ঠা নেই। কণ্ঠিরাম নামে এক ভোজবাজিওয়ালা ও তার সহকারীর (স্ত্রীলোকের বেশে) কাণ্ডকারখানা নিছক ভাঁড়ামি।

অভিনয়ের মানও বেশ নিচু। একমাত্র দীপান্বিতা রায় চম্পার চরিত্রে মোটামুটি ভালো অভিনয় করেছেন। এমনকি তরুণ রায় স্বযং লেবেদেফের চরিত্রে আমাদের হতাশ করেন। চম্পার কাছে প্রণয় জানাবার দৃশ্যে চরিত্রটির অন্তর্দাহ প্রকাশে তিনি ব্যর্থ এবং তাঁর অভিনয়ে বুদ্ধির ছাপ বড়ই বিরল।

অশোক মুখোপাধ্যায়
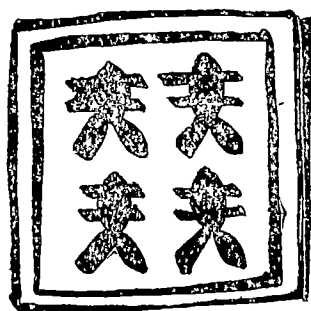
সংগীতের স্বীকৃতি

শুনতে পাই বাংলাদেশে নাকি নতুন করে সংগীতচর্চার ঢেউ এসেছে। একমাত্র কলকাতা শহরেই অলিতে-গলিতে অসংখ্য গানের স্কুল আর প্রায় সারা বছর ধরেই কোথাও না কোথাও গানের জলসাই বোধহয় এর প্রমাণ। পুজোর ক'টা দিন, বিয়ের মরশুমে এবং এসব উপলক্ষ ছাড়াও লাউডস্পীকার মারফত প্রায়ই নানা ছুতোয় অনবরত যে সংগীত পরিবেশন করা হয় তাতেও বাঙালীর সংগীতপ্রীতির পরিচয় মেলে। না, এটা শ্লেষোক্তি নয়। অধিকাংশ লোকই গানবাজনা শুনতে ভালোবাসে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং আজকের দিনে সিনেমা বা চটুল 'পপ্' সংগীত প্রাধান্য পেলেও, উচ্চাঙ্গ বা যাকে ক্ল্যাসিকাল সংগীত বলা হয় তার জনপ্রিয়তাও কম নয়। এমনকি বেঠোফেন, মোৎসার্টের নামও লোকের মুখে মুখে ফেরে। বাঙালীর এই সংগীতপ্রিয়তার প্রশংসা অবাঙালী মহলে প্রায়ই শোনা যায়।

বাঙালীর সংগীতপ্রীতি সম্পর্কে আমার কিন্তু একটা গভীর সন্দেহ বহুকাল থেকেই আছে। বাঙালী যে যথার্থই সংগীতকে জীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছে, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। গানের জলসায় সারারাত কাটানো, বাড়িতে নামকরা গাইয়ে-বাজিয়েদের রেকর্ড বাজানো বা মেয়ের জন্য গানের মাস্টার রাখা—এর কোনোটাই কিন্তু যথার্থ সংগীতপ্রীতির নিদর্শন নয়।

সংগীতের যে একটা মোহিনীশক্তি আছে সে-কথা সবাই মানবেন। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আবালবৃদ্ধ সকলেই এই মোহিনীশক্তির কাছে

বশ মানে। এমনকি পশুপাখিও নাকি বাদ যায় না। সুতরাং সংগীতের আকর্ষণ যে মুখ্যত জৈব—এটা অস্বীকার কববার উপায় নেই। কিন্তু তাই বলে সংগীতের প্রভাব স্রেফ্ সাময়িক একটা ভালোলাগাতেই সীমাবদ্ধ নয়। সংগীতের মূর্ছনা আমাদের সত্তার গভীবে গিযে ঘা দেয। মনের উপর তার প্রভাব অপরিসীম। মনকে সংগীত যতখানি দোলা দিতে পারে আর কিছুতেই তা পারে না। কিন্তু এই সত্যটা ক'জন 'সংগীতরসিক' মানেন বা জানেন, অন্তত সজ্ঞানে?

স্কুলকলেজের কথা ছেড়েই দিলাম, খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে প্রায় কোনো বাড়িতেই নিযম করে ছোট ছেলেমেযেদের গান শোনানো বা শেখানো হয় না। যে-বাড়িতে একটু-আধটু সংগীতচর্চা হয়, সেটা নেহাতই বড়দের অবসরবিনোদনের জন্য। আর, অনেক বাড়িতে যেখানে মেযেদের গানবাজনা শেখানো হয়, সেখানেও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য কাজ করে—সেই উদ্দেশ্যটা হল বিয়ের বাজারে পাত্রী হিসেবে মেয়ের দাম বাড়ানো। তবু যাহোক মেয়েদের গানবাজনা শেখানোর একটা বেওয়াজ সমাজে বহুকাল থেকে চালু আছে। কিন্তু ছেলেদের বেলায অভিভাবকেরা আশ্চর্যরকম অবুঝ। তারা যে শুধু ছেলেদের সংগীতচর্চায় উৎসাহিত করেন না তা নয়, যদি কেউ এ-ব্যাপারে নিজের থেকে আগ্রহ দেখায তবে তাকে তৎক্ষণাৎ নিবস্ত করার জন্য উঠেপড়ে লাগেন। লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে স্বাবলম্বী হবার আগে অবধি ছেলেদের গানবাজনা কবা একান্ত দূষণীয় এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় বলেই গণ্য হয়। যদি কোনো ছেলে দুঃসাহসে ভর করে লেখাপড়ার চাইতে গানবাজনাব দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে, তবে তাকে পুরোপুরি খরচের খাতায ফেলা হয়। সংগীতরসিক বাঙালীর এ এক বিচিত্র মনোভাব। অথচ পুজোমণ্ডপে বা কোনো উৎসব উপলক্ষে যখন তারস্বরে লাউডস্পীকারে শস্তা ফিল্মসংগীত বাজিয়ে ছেলেমেযেরা উল্লাস প্রকাশ করে, তখন অভিভাবকেবা তাদের রুচিভ্রষ্টতায অত্যন্ত রুষ্ট ও উত্তেজিত হন। কেন যে সংগীতের ব্যাপারে আজকের ছেলেমেয়েদের রুচি এত নিম্নস্তরে নেমে যাচ্ছে, সেটা তাঁদের কাছে এক বিরাট সমস্যা হযে দাঁড়ায়। অথচ এঁরা একবারও ভেবে দেখেন না এই রুচিবিকারের জন্য বাস্তবিক দায়ী কে।

আমাদেব সমাজের এই অসম্পূর্ণতা সাধারণভাবে সবরকম শিল্পচর্চার ক্ষেত্রেই দেখা যায়। দেশের শিল্পব্যবস্থা এ-ব্যাপারে স্বাধীনতালাভের আগেও যেমন ছিল, এখনো ঠিক তেমনি পেছিয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য : "দুঃখের বিষয, সংগীত আমাদের শিক্ষিত লোকের শিক্ষার অঙ্গ নহে; আমাদের কলেজনামক কেরানিগিরির কারখানাঘরে শিল্প-সংগীতের কোনো স্থান নাই; এবং আশ্চর্যের কথা এই যে, যে-সকল বিদ্যালযকে আমরা ন্যাশন্যাল নাম দিয়া স্থাপন করিয়াছি সেখানেও কলাবিদ্যার কোনো আসন পাতা হইল না।" (সংগীতচিন্তা)

স্কুলকলেজের শিক্ষাব্যবস্থার যত ত্রুটিই থাকুক না কেন, ছেলেমেয়েদের স্বভাবচরিত্র এবং রুচি গড়ে ওঠে প্রধানত বাড়ির প্রভাবেই। শিক্ষার শুরু গৃহে। সুতরাং একেবারে শিশুঅবস্থা থেকে যদি পিতামাতা সন্তানের রুচি সুন্দর ও সুস্থ রাখাব জন্য সচেষ্ট হন, তবে পরে তাদের রুচিবিকারের আশঙ্কা থাকে না। ছেলেবেলা থেকেই শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বাড়িতে সংগীতচর্চার প্রচলন হওযা দরকার। ছেলেমেয়েদের রুচি ঠিক পথে নিয়ে যেতে হলে তাদের ভালো সংগীত শোনবাব সুযোগ করে দিতে হবে, গানবাজনা শেখাতে হবে এবং এ-ব্যাপারে ছেলেমেযে দুজনকেই সমান উৎসাহ দিতে হবে। ছেলে যদি তবলায় চাঁটি দেয়, তবে তার মাথায় চাঁটি না মেরে বরঞ্চ তাকে আরো উৎসাহিত করা উচিত। এতে ছেলে বিগড়ে যাবে না বা যাত্রাদলে পাঁচটাকা মাইনেতে তাকে জীবনপাতও করতে হবে না। একবার যদি সংগীতের মাধুর্য তার অন্তর স্পর্শ করে, তাব রুচি তো উন্নত হবেই, মনে একটা সহজ সৌন্দর্যবোধ জাগবে আর চরিত্রে আসবে একটা অনাবিল প্রসন্নতা। এতে ধীরে ধীরে সমগ্র সমাজের উপরেই সুফল ফলবে।

সংগীতকে যখন সবাই মনেপ্রাণে গ্রহণ কববে তখনই সংগীতচর্চার সত্যিকার উন্নতি ও প্রসার সম্ভব। যতদিন তা না হচ্ছে, সংগীতের নামে বিকৃতরুচি নানা খামখেযালকে বরদাস্ত করা ছাড়া উপায় নেই।

সুভাষ সেন
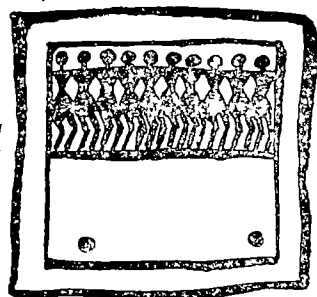
আশমান জমিন

"আকাশ ছোঁয়া" ছবিতে নায়িকার মুখে একটি সংলাপ আছে নায়ক সম্বন্ধে: "আকাশ ছুঁতে চেয়েছিল ও। তার বদলে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে। এ-কথা নায়ক সম্বন্ধে কতটা প্রযোজ্য জানি না, তবে ছবির পরিচালকের উদ্দেশে এ মন্তব্য অনায়াসেই করা যেতে পারে। বাঙালী সিনেমাদর্শকদের যাবতীয় প্রিয় ব্যাপার, যথা—আদর্শবাদ, একনিষ্ঠ প্রেম, চোখের জল, অতি-অতি নাটকীয়তা, অবাস্তবতা,—সবকিছুর সম্ভার সাজিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক শ্রীরাজেন তরফদার। তাঁর উদ্দেশ্য স্পষ্টতই একটি—বক্স-অফিসের আকাশ স্পর্শ করা। কিন্তু আকাশের দিকে তিনি মাটি ছেড়ে বেশি উঠতে পারেন নি।

'গঙ্গা' ছবিটি করবার পর শ্রীরাজেন তরফদার বাংলাদেশের একজন সর্বোচ্চস্তরের পরিচালক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে এ ধরনের বই আমরা আশা করি নি। তাই বোধহয় এ বইটি যতটা খারাপ লেগেছে, নৈরাশ্য এসেছে তার চেয়ে অনেক বেশি।

ছবির নাম যে কেন "আকাশ ছোঁয়া", তা বলা শক্ত। এর কাহিনী হচ্ছে মোটামুটি এইরকম: নায়িকা মিনতি গৃহত্যাগ করে বিখ্যাত স্পোর্টস্‌ম্যান অজিত বোস-কে বিয়ে করল। কিছুদিন পরে অজিতের চাকরি যাওয়ায় সে আর কোথাও কাজ না পেয়ে এক সার্কাসে "ডেথ্ জাম্পারের" চাকরি নিল, এই কাজেই সে একদিন পড়ল দুর্ঘটনায় ও প্রায় পঙ্গু হয়ে গেল। ছবির শেষে নাটকীয়ভাবে আবার "ডেথ্ জাম্প্" দিতে

গিয়ে অজিত তার সুস্থতা ফিরে পেল। এ গল্পের মধ্যে অজিতের আকাশ ছোঁয়াব কোন্ প্রশ্ন নিহিত আছে, আর সেটা কোন্ আকাশ, তা আমার কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য।

যে গল্পটি পরিচালক বেছে নিয়েছেন, তা অনেক জায়গায অবাস্তব হলেও, মোটেই দুর্বল নয়। কিন্তু এর ওপব যে চিত্রনাট্য রচিত হযেছে, তা আশ্চর্যরকম নিস্তেজ। ফিল্মের স্বচ্ছন্দগতির মূলে ক্যামেরাম্যানের বড ভূমিকা আছে। এখানে চিত্রশিল্পী শ্রীদীনেন গুপ্ত তাঁর গুরুদায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে পারেন নি। আরম্ভের মোটর সাইকেল রেস এবং সার্কাসে সিন্থিযার ট্র্যাপিজ থেকে পডে যাওয়া—এ দুটি দৃশ্য শুধু ক্যামেরার কাজ দিয়ে বহুগুণ আকর্ষণীয় করে তোলা যেত। বিশেষ করে, ঐ দ্বিতীযোক্ত ঘটনাটি এত নিরীহ করে তোলা হয়েছে, যে দর্শকেরা একটু চমকে ওঠার সুযোগটুকু পর্যন্ত পান না। তবে মোটব সাইকেল দুর্ঘটনার কাট্‌টি চমৎকার তোলা হযেছে।

অথচ কাজ দেখাবার সুযোগ ছিল প্রচুর। পরিচালক চিত্রনাট্যকে অনেক বেশি গতিশীল করতে পারতেন। পঙ্গু নায়কের যন্ত্রণার অতিনাটক কম দেখিয়ে তাঁর উচিত ছিল অজিতের বাঁচবার কামনার ওপর আরো জোব দেওয়া। তা না করায় ছবিব ক্লাইম্যাক্সে অজিতের "ডেথ্ জাম্প্" দেওয়াটাকে তার আত্মহত্যার চেষ্টা বলেই মনে হয়েছে, একবারও মনে হয় নি যে এটা তার সুস্থ হয়ে বেঁচে ওঠার শেষ মরিয়া চেষ্টা।

কাহিনীর অজস্র অবাস্তবতা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কারণ সাধারণ বাঙালী দর্শক অবাস্তবতাকে ঠিক আপত্তির ব্যাপাব বলে মনে করেন না। তবে একটা কথা না বলে পারছি না। নায়ক অজিতের সামান্য কোনও চাকরির খোঁজে হন্যে হযে ঘুরে বেডানো—আজকের দিনে এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য। আজকাল চাকরির ব্যাপাবে ডিগ্রির চেয়ে দামী হচ্ছে প্রার্থী যে শুধু পডাশুনো কবে নি, তার প্রমাণ। ক্রিকেট ফুটবলে দক্ষতা থাকলে তো কথাই নেই। সাধারণ দৌডঝাঁপে ভালো হলেও মধ্যশিক্ষিতদের চাকরির বাজারে দাম যায় চড়ে। কেবল চাকরি কেন, কলেজে সিট্ পাওয়ার ব্যাপারেও নজীরের অভাব নেই যে একজন ভালো খেলোয়াড যোগ্যতর একজন ছাত্রের ওপর টেক্কা দিয়ে

বেরিয়ে গেছে।—আর "আকাশ ছোঁয়া"-র নায়ক অজিত বোস একজন ভারতবিখ্যাত স্পোর্টস্‌ম্যান। সে আর কোথাও কাজ না পেয়ে শেষে সার্কাসে চাকরি নিল—যথেষ্ট বাস্তবনিষ্ঠ হলে পবিচালক এরকম দেখাতেন না।

অভিনয় সম্বন্ধে অল্পই বলার আছে, কারণ সবাইকে দিয়েই ড্রামা এবং মেলোড্রামা কবানো হয়েছে—সিনেমার অভিনয় করেছেন মাত্র দু-একজন। অজিতের ভূমিকায় শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় ধ্যানমগ্ন বুদ্ধেব মত নিষ্ঠায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঠিক একরকম মুখভঙ্গি করে, ঠোঁটের দুইপ্রান্ত ঝুলিয়ে অভিনয় করে গেছেন। তিনি সবসময়ই পূর্ণসচেতন ছিলেন যে তিনি অভিনয় করছেন এবং দর্শকরা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। নায়িকার ভূমিকায় সুপ্রিয়া দেবী পরিচালকের নির্দেশ সুন্দবভাবে পালন করেছেন। জাত অভিনয় কাকে বলে তা দেখিয়েছেন অনিল চ্যাটার্জী। এরকম অতিদুর্বল সংলাপের ওপর শুধু বাচনভঙ্গি ও অভিনয় (নাটক নয়) দিয়ে যে কতদূর অসাধারণ হওয়া যায়, তা এই রূপায়ণ দেখার আগে জানতাম না।

পরমভট্টারক লাহিড়ী
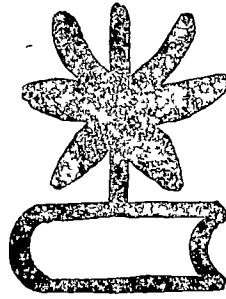
গণতান্ত্রিক জার্মানি থেকে

Kunwar Mohammad Ashraf *An Indian Scholar and Revolutionary.* Edited by Horst Kruger.

ডক্টর কুনওয়ার মহম্মদ আশরফ খ্যাতনামা ঐতিহাসিক, ভারতের জাতীয় আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন নেতা। সমাজতন্ত্রী পূর্বজার্মানিতে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দুর্ভাগা এই দেশে ডঃ আশরফের স্মৃতিরক্ষার কোনো ব্যবস্থা হয় নি। বার্লিনের ইনসটিট্যুট ফর ওরিয়েণ্টাল স্টাডিজ এই স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করে তাই নিঃসংশয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ভারতের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে ভারতীয় এবং বিদেশী লেখকদের বাইশটি প্রবন্ধ এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। তদুপরি আছে ডঃ আশরফের নিজের কিছু লেখা।

আজীবন অক্লান্ত গবেষক ডঃ আশরফের স্মারকগ্রন্থে গবেষণামূলক লেখা আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পরে আমাদের দেশে ঐতিহাসিক গবেষণা যে উন্নত স্তরে পৌঁছেচে, তার ছাপ এই বইতে পড়ে নি। কয়েকজন ভারতীয় বিশেষজ্ঞের লেখা পড়ে হতাশ হতে হয়। নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর প্রবন্ধ তিন পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ডঃ রমেশ মজুমদার ইসলামের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর সুবিদিত মত প্রকাশ করেছেন সাত পৃষ্ঠায়, আর হীরেন মুখোপাধ্যায় হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্পর্কে আলোচনা শেষ করেছেন তিন পৃষ্ঠায়। যত্ন নিয়ে লিখেছেন রমিলা থাপর, চৌধুরী আবদুল হায়ে, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, গোপাল হালদার। কেন জানি না কৌশাম্বীর কোনো লেখা এই সংকলনে স্থান পায় নি। মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে

প্রাচীন ভাবতের ইতিহাসের পুনর্গঠনে কৌশাম্বী যে কাজ করে গেছেন, তার ধারেকাছে আজও কেউ আসতে পারেন নি।

বিদেশী লেখকদের মধ্যে ক্রুগারের লেখা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নতুন তথ্যের ভিত্তিতে তিনি সপ্তদশ শতকের প্রাশিয়ার বণিক পুঁজির ব্যর্থতার ইতিহাস আলোচনা করেছেন। ইংরাজ ও ওলন্দাজদের মত প্রাশিয়াব বণিকদেব প্রসার্যমাণ ভারতীয় বাণিজ্যে অংশ গ্রহণের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত ইংরাজদের শঠতাব কাছে প্রাশিয়ার যুঙ্কাররা হন পবাজিত। ক্রুগার মন্তব্য করেছেন যে, সামন্ততান্ত্রিক বাষ্ট্র প্রাশিযার পক্ষে পশ্চিম ইউরোপের উদীয়মান জাতীয় বাষ্ট্রগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাজয় ববণ করা স্বাভাবিক ছিল।

রাহুল সাংকৃত্যাযন ডঃ আশরফের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেছেন। রাজপুত পরিবারে ডঃ আশরফের জন্ম। এই রাজপুতদের একটি অংশ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। আলিগড এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করেন। অসহযোগ এবং খিলাফতের যুগে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হযে পডেন। লণ্ডনে সাকলাতওয়ালা, সাজ্জাদ জাহির, মাহ্‌মুদুজ্জাফরের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। ১৯২৭-২৮ সালে তিনি সাম্যবাদের দিকে আকৃষ্ট হন। দেশে ফিরে তিনি পেশাদার রাজনৈতিক কর্মীর ব্রত গ্রহণ করেন। জওহরলাল নেহরু তাঁকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব দেন। কংগ্রেসের মধ্যে তিনি বে-আইনী কমিউনিস্ট দলেব প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে চলেন। স্বাধীনতা-সংগ্রাম ,এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে কি করে একজন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী তাঁর মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিলেন, ডঃ আশরফের সাধনায তা প্রতিভাত।

মৃত্যুব তিন বছর আগে দিল্লীর কিরোরীমল কলেজের এক অধ্যাপকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আশরফ নিজের জীবন এবং দেশের রাজনীতি সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছিলেন, বর্তমান লেখকের কাছে তা খুব মূল্যবান বলে মনে হযেছে। শেষজীবনেও সাম্যবাদের প্রতি ডঃ আশরফের নিষ্ঠা অবিচল ছিল, যদিও রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে তিনি তখন বিচ্ছিন্ন। জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীজীর নেতৃত্বের তিনি কঠোর সমালোচক। নেহরু সম্পর্কেও তিনি মোহমুক্ত। তাঁর মতে নেহরু চরম মুহূর্তে দক্ষিণপন্থীদের

সঙ্গে আপস করেছেন। মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের কামনার অভিব্যক্তি মনে করে কমিউনিস্ট দল ভুল কবেছিল। ১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট দলই ছিল ভারতের একটিমাত্র দল, যা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকতার পতাকা তুলে ধরেছিল। কমিউনিস্ট দলের নেতাদের মধ্যে পি. সি. জোশী এবং রণদিভের উপব তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। তাঁর মতে ১৯৩৪-৪০ কমিউনিস্ট দলেব গড়ে ওঠার শ্রেষ্ঠ পর্ব; এই পর্বে পি. সি. জোশীর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট দল এক 'জাতীয় দলে' পরিণত হয়। সেই থেকে জাতীয় রাজনীতিতে কমিউনিস্ট দলের যাত্রা হল শুরু।

ডঃ আশরফ ঐতিহাসিক বলেই নিরন্তর প্রশ্ন করেন 'কেন', এবং এই প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই। ভাবতীয ইতিহাস কংগ্রেসে (১৯৬০) সভাপতির ভাষণে মধ্যযুগের ইতিহাস সম্পর্কে ডঃ আশরফ কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছেন। ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগের কোথায় শুরু এবং কোথায় শেষ? তুর্কী ও মোগলদের ঐতিহাসিক ভূমিকা কী? এই যুগের গণপ্রতিরোধ-আন্দোলনগুলির চরিত্র কী? তিনি আরো গবেষণা, আরো নতুন তথ্য সংগ্রহের আহ্বান জানিয়ে গেছেন। আলোচনার সূত্রপাত করে তিনি এমন একটি ছক তৈরি করে গেছেন যা ইতিহাসের ছাত্রদের গবেষণার নতুন সূত্রের সন্ধান দেবে। মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ডঃ আশরফ গবেষণা এবং তথ্য সংগ্রহের উপর কত গুরুত্ব দিতেন, ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ তার প্রমাণ। অবশ্য তথ্যের বিশ্লেষণ ছাড়া সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক চিত্র উদ্ঘাটিত হতে পারে না। তিনি এক মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন: মধ্যযুগে বিপ্লবী পরিবর্তনেব যে বীজ নিহিত ছিল, তা অঙ্কুরেই শুকিয়ে গেল কেন?

সম্পাদক ক্রুগার এই স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করে আমাদের ঋণী করেছেন। ভারতীয় পাঠকেরা এই বই একটু যত্ন নিয়ে পড়বেন বলে আশা রাখি। লণ্ডনে সাকলাতওয়ালার পাশে ডঃ আশরফেব তরুণ বয়সের ছবিটি খুব ভালো লাগল।

সুনীল সেন

পাঠকগোষ্ঠী

'নাউ'-সম্পাদক প্রসঙ্গে

মহাশয়,

শ্রীঅজিষ্ণু ভট্টাচার্য প্রশ্ন তুলেছেন (পরিচয়, আষাঢ় ১৩৭৪), "ভবিষ্যৎকালে স্পোণ্ডারের (সম্ভবত ছাপার ভুল, আমরা বলি স্পেণ্ডার) মত গোপন অর্থের সংবাদে বিব্রত হয়ে পদত্যাগ" করবেন—"ওটুকু" সাহস "নাও" (আমরা বলি নাউ)-সম্পাদকের আছে কিনা। অজিষ্ণু ভট্টাচার্য সম্ভবত ছদ্মনাম। যদি তাই হয় তাহলে অপরের সাহস সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার আগে স্বনামে লেখার সাহস অর্জন করাটা উচিত বলে মনে করি।

'নাউ' পত্রিকার সম্পাদক, সকলেই জানেন, শ্রীসমর সেন। ১৯৬৪ সালে কী কারণে শ্রীসমর সেন হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার অন্যতম সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন সে-সংবাদ শ্রীঅজিষ্ণু ভট্টাচার্য নিশ্চয়ই জানেন। আদর্শনিষ্ঠা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার সেই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত একাধিক বামপন্থী পত্রিকায় অভিনন্দিতও হয়েছিল। অতঃপর এমন কোনো ঘটনা ঘটে নি যাতে শ্রীসমর সেন সম্পর্কে মতপরিবর্তনের উপলক্ষ ঘটেছে। বরং নিজস্ব রাজনৈতিক মতের প্রতি সততা ও নিষ্ঠার যে-পরিচয় তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বিধৃত, তার তুল্য দৃষ্টান্তও আমাদের দেশে বিরল। তবে রাজনৈতিক-বিরোধী মাত্রই সি-আই-এ এজেণ্ট, অতএব গালিগালাজের পাত্র, এমনি একটা চালের আশ্রয় নেবার প্রবণতা অবশ্য হালের রাজনৈতিক মহলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

যে-কোনো রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করার স্বাধীনতা শ্রীঅজিষ্ণু ভট্টাচার্যের অবশ্যই আছে। কিন্তু সেই মন্তব্য হওয়া চাই যুক্তিনির্ভর। শ্রীশলোখভের বক্তৃতায় উল্লিখিত কিছু কিছু তথ্য উদ্ধৃতিচিহ্ন ছাড়া ব্যবহার করাটা "হলদে সাংবাদিকতা"—এই মন্তব্যটি যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন ছিল। ফ্রাইডরিখ (আমরা বলি ফ্রীডরিখ) ডুরেনমাট, পাবলো নেরুদা ও দক্ষিণ আফ্রিকার আলেক্স লা গুমা-র "মূল্য" সার্ত্র ও আরাগঁ-র চেয়ে "কোন অংশেই কম নয়", "আধুনিক সাহিত্যের খোঁজখবর যাঁরা রাখেন" তাঁদের সকলেরই এই মত—সাহিত্য ও সাহিত্যিকের মূল্যায়নে এমন বাধ্যবাধকতা কবে থেকে শুরু হয়েছে তাও শ্রীঅজিষ্ণু ভট্টাচার্যের কাছ থেকে জানতে ইচ্ছে করি।

অমল দাশগুপ্ত
কলকাতা-২৫

মহাশয়,

স্বাধীনচেতা বুদ্ধিবিদ্‌কে সন্দেহের শিকারে পরিণত করে নিগ্রহ করার প্রবণতাটা মার্কিনী ম্যাকার্থিতন্ত্রের বা স্তালীনযুগীয় লৌহনিয়ন্ত্রণের বা আমাদের দেশে ১৯৬২ সালে 'দেশদ্রোহী' আবিষ্কারে বাতিকগ্রস্ত কিছু 'স্বাধীন সাহিত্য' সেবীদের স্বভাব বলে জানতাম। 'পরিচযে'র পাতায এই জাতীয় স্বভাবের অশালীন প্রকাশ ঘটবে বলে কোনদিন ভাবতে পারি নি।

আষাঢ় সংখ্যার 'পরিচয়ে' বিবিধ-প্রসঙ্গে চতুর্থ সোভিয়েত লেখক কংগ্রেসের আলোচনাকালে লেখক শ্রীঅজিষ্ণু ভট্টাচার্য দেখলাম হঠাৎ কলকাতার ইংরেজি সাপ্তাহিক 'নাও'-ব সম্পাদক সম্বন্ধে যুক্তিশূন্য ও রুচিবিগর্হিত কিছু মন্তব্য করেছেন। উক্ত সম্পাদকের অপরাধ—'নাও'-তে প্রকাশিত উল্লিখিত লেখক কংগ্রেসের বিবরণী সোভিয়েত-বিরোধী মনোভাবে দুষ্ট। সোভিযেত ইউনিয়নেব কোনো ঘটনা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য যে কববে, সে-ই সাম্রাজ্য-বাদের অনুচর—এই ধাবণার বশবর্তী হয়ে একদা সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ রাশিয়ার ভিতবে এবং বাহিরে বহু শুভার্থী সমালোচক ও স্পষ্টবক্তা চিন্তাবিদ্‌কে লাঞ্ছিত ও বিনাশিত করেছিলেন। ইতিহাসের এ কলুষিত অধ্যাযের জন্য সাম্যবাদী কর্মীরা যথেষ্ট পবিমাণ আত্ম-ধিক্কৃত হযে শিক্ষালাভ করেছেন বলে আশা করেছিলাম। কিন্তু দেখছি, ভুলের ভুত সহজে ঘাড থেকে নামে না।

অন্যাযের সঙ্গে কুরুচি যখন যুক্ত হয়, তখন ব্যাপাবটা কদাকার হযে ওঠে। শ্রীভট্টাচার্য উক্ত আলোচনায ব্যক্তিগত আক্রোশের তাডনায এত উন্মত্ত হয়ে পডেছেন যে, অভিযোগ করে বসেছেন যে সি. আই. এ-পুষ্ট কংগ্রেস ফর কালচারল ফ্রীডমের সোভিযেতবিরোধী কাজকর্মের দাযিত্ব এখন 'নাও' গ্রহণ করেছে। এবং শেষে আশা প্রকাশ করেছেন, 'নাও'-র সম্পাদকও "হয়ত কোন ভবিষ্যৎকালে স্পেণ্ডারের মত গোপন অর্থের সংবাদে বিব্রত হয়ে পদত্যাগ করবেন (অবশ্য ওটুকু সাহস যদি থাকে।)।"

স্থূলরুচিপ্রসূত এই প্রগল্‌ভতার স্থান কি 'পরিচয'-এর পৃষ্ঠা? এ কথা সর্ববিদিত যে, তার সূচনা থেকে 'নাও' প্রচলিত রীতিবহির্ভূত প্রগতিশীল মতপ্রকাশে এবং অপ্রিয সত্যভাষণে সচেষ্ট এবং তার সম্পাদক শ্রীসমর সেন এদেশের বামপন্থী সাহিত্যজগতে দীর্ঘকালের সুপরিচিত কবি। পত্রিকা

-সম্পাদনায় প্রতিফলিত তাঁর মতবাদের সঙ্গে অনেকেরই মতপার্থক্য হতে পারে, আমারও অনেক বিষয়ে মতান্তর আছে। কিন্তু সেইহেতু তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধির অপমান ও অপব্যাখ্যা কি 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় শোভা পায়?

শ্রীভট্টাচার্য সমরবাবুর সাহসের অভাবের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। তিনি হয়ত জানেন না যে, ১৯৬৪ সালে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময়, যখন বহু তথাকথিত প্রগতিশীল সাহিত্যিক ও সাংবাদিককে অর্থপ্রাপ্তির আশায় উগ্র ধর্মবিদ্বেষ প্রচার করতে দেখেছি, সেই অন্ধ উন্মত্ততার দিনেও সমরবাবু সাম্প্রদায়িক প্রচারের প্রতিবাদে কোনো এক ইংরেজি দৈনিকপত্রের উচ্চপদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন।

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-১৯

সম্পাদকের কথা

অজিষ্ণু ভট্টাচার্যের লেখার ত্রুটিতে এবং আমাদের অনবধানতাদোষে 'নাউ'-সম্পাদক সমর সেনের প্রতি যে অন্যায় কটাক্ষ প্রকাশ পেয়েছে, তার জন্যে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। নীতি নিয়ে মতভেদ থাকলে তা দৃঢভাবে প্রকাশ করা নিশ্চয়ই উচিত, কিন্তু অযথা ব্যক্তিগত আক্রমণে যুক্তির জোর কমে যায়—তাতে লেখকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। শত্রুকে বন্ধু ভাবা যেমন দোষের, তেমনি বন্ধুকে শত্রু ভাবাও কম দোষের নয়। আমরা আশা করব, প্রগতিশীল অন্যান্য পত্রপত্রিকার সম্পাদকেরাও এ ব্যাপারে অবহিত হবেন। কেননা ছিদ্রান্বেষীদের মধ্যে চালুনির অভাব নেই। সঃ পঃ

'পরিবর্জনে নয়, পরিগ্রহণে'

মহাশয়,

'পরিবর্জনে নয়, পরিগ্রহণে'—অরুণ সেনের লেখা এই প্রবন্ধটি 'পরিচয়ে'র পাতায় পড়ে ভালো লাগল। বিশেষ করে পঞ্চাশের কবিদের সম্বন্ধে যে সব লেখা আগে পড়েছি সবই এত বেশি ফাঁপা,—এই প্রবন্ধের তুলনায়। প্রবন্ধের শেষাংশে এবং পরবর্তী সংযোজনে তার বিস্তারে লেখকের বক্তব্য-বিষয়ে তবু প্রশ্ন তুলতে হল।

পঞ্চাশের কয়েকজন কবি সম্পর্কে লেখকের অভিযোগ—'কবিতা থেকে অকবিতাকে বিসর্জন দেওয়ার ব্যাপারে অতিরিক্ত ছুঁৎমার্গিতা', পরে আরো

বলছেন—'কবিতা থেকে অকবিতাকে বিসর্জন দেওয়ার থিয়োরিও এসেছে ঐ থেকে ....' ইত্যাদি। আমার প্রশ্ন, এই 'অকবিতা' ব্যাপারটা কী? পঞ্চাশের যে-কবির প্রবন্ধের উদ্ধৃতি এখানে আছে, অকবিতা বলতে তিনি যা বোঝেন আর আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক অকবিতা বলতে যা বোঝাচ্ছেন,—মনে হয় দুটোর মধ্যে আশমান-জমিন ফারাক রয়ে গেছে। কবিতাকে জীবন-বহির্ভূত এক সংকীর্ণতায় নিয়ে যেতে যিনি চান, তিনি কেন লিখবেন, "পাঁচ মাথার ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে স্রোত, কেবল এই ভয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি কাগজের ফুলের মতো খসখসে ব্যালকনিতে। কিন্তু ঐ রঙ্গিনী কাকলীর মধ্যে তো থেকে যেতে হবে, তারই সংঘর্ষের মধ্য থেকে বাড়িয়ে দিতে হবে নিঃশব্দের তর্জনী।"

সাম্প্রতিক কবিতাতেও এই কবির জীবননিষ্ঠা কিছু কম,—এমন অবশ্য আমার মনে হয় না, তবে সে অন্য কথা। শঙ্খ ঘোষের কবিতা-অকবিতা প্রসঙ্গ যেখানে পড়েছি, মনে হয়েছে, প্রতিমার (বা ইমেজের) প্রবলতা, অনিবার্যতাকে তিনি কবিতা বলেন। মনে হয়েছে, তাঁর কাছে তথ্যের বিবৃতি অকবিতা, অভিজ্ঞতার মূর্তির নাম কবিতা। "অবজেক্টের রক্ত-মাংসের সাধনা যাকে বলা হয় 'জীবন', 'সমাজ' "—কোনো কবির অভিজ্ঞতায় কি এসব বাদ পড়ে ?

প্রবন্ধের যে-অংশের কথা আলোচনা করছি তার আরো কিছু শব্দ আমার অস্পষ্ট লাগছে। হয়ত বুদ্ধির দোষে। 'মিষ্টিসিজমের একটি সাধারণ অর্থ রহস্যময়তা'—এটা কোন্ অভিধানজাত ? অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বা আলোক সরকার প্রসঙ্গে মিষ্টিসিজমের উল্লেখ বুঝতে পারি। কিন্তু শঙ্খ ঘোষের নাম এই সূত্রেই বলবার তাগিদে লেখক 'মিষ্টিসিজম' শব্দের অপপ্রয়োগ করলেন, সন্দেহ হয়। কোনও কবিতার কনটেন্টে 'মিষ্টিসিজম' থাকতে পারে, কিন্তু ফর্ম হিসেবে তার সাধনা—ব্যাপারটা ধারণা করা শক্ত।

ভাষার বিবর্তন হয় জানি। কিন্তু 'ক্রমশুদ্ধি' জিনিসটা কী ? প্রবন্ধ-লেখক ছাড়া আর কারা ভাষার 'ক্রমশুদ্ধি'র কথা বলছেন বা 'ভাষার শুদ্ধির সাধনা' করছেন ? একটু দৃষ্টান্ত দিলে বুঝতে পারতুম।

সুতপা ভট্টাচার্য
কলকাতা-১৪

বানান : পরিচয়

'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন লেখার মধ্যে বানান-সামঞ্জস্যের জন্য আমরা উদ্যোগী হয়েছি। আগামী জানুয়ারি মাস থেকে যাতে এই বানানরীতি অনুসরণ করা যায়, সেজন্য লেখক-পাঠকবর্গের সহযোগিতা প্রার্থনা করি। আমরা বানান বিষয়ে মোটামুটি 'চলন্তিকা' ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি অনুসরণ করলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা স্পষ্টতর নির্দেশের পক্ষপাতী। সেজন্য নিচে একটি প্রাথমিক খশড়া মুদ্রিত হল। আমরা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শও গ্রহণ করছি। পরিচয়-এর পাঠকবর্গ যদি এ বিষয়ে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যে জানান তাহলে আমাদের সুবিধা হয়। লেখকদের প্রতি অনুরোধ, তাঁরা যেন ভবিষ্যতে গৃহীত এই বানানরীতি অনুসরণ করেন। স প

১. কোনো তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে বিকল্পে হ্রস্ব ই ও দীর্ঘ ঈ-র বিধান থাকলে আমরা সবসময়ে হ্রস্ব ই-কার বানানের পক্ষপাতী। যেমন পঞ্জি, পঞ্জী, পল্লি, পল্লী ; পরিবার, পরীবার ; পরিহার, পরীহার। উক্ত শব্দগুলির ক্ষেত্রে ই-কার বিধেয়।

২. কোনো তৎসম শব্দের একাধিক বানান প্রচলিত থাকলে যেটি সহজ আমরা সেটি গ্রহণ করব। যেমন ঊর্দ্ধ, ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ এই তিন বানানের মধ্যে আমরা শেষের বানানটিই অনুসরণ করব।

৩. কতকগুলি তৎসম শব্দের বিসর্গবর্জিত বানান বাঙলায় বিশেষ প্রচলিত। আমরা এ জাতীয় শব্দকে ব্যবহারিক স্বীকৃতি দিতে চাই। প্রথমতঃ, ক্রমশঃ, বিশেষতঃ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমরা প্রথমত, ক্রমশ, বিশেষত লেখার পক্ষপাতী।

৪. তেমনি অনেক তৎসম শব্দের হসন্তবর্জিত ব্যবহারও প্রচুর চোখে পড়ে। যেমন ভগবান (ভগবান্), শ্রীমান (শ্রীমান্), বয়স (বয়স্), আশিস (আশিস্), ষড়যন্ত্র (ষড়্‌যন্ত্র), সুহৃদ (সুহৃদ্) ইত্যাদি। আমাদের মনে হয় এই বানানগুলি বাঙলা ভাষায় স্থায়ী হয়ে গেছে।

৫. আমরা অতৎসম ও বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে 'ণ' ও 'ষ' সম্পূর্ণরূপে বর্জনের পক্ষপাতী। সেজন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানরীতির ১০ সংখ্যক নিয়মে আঁশ ✓ অংশু এবং আঁষ ✓ আমিষ-এর যে পার্থক্য আছে তা আমরা অনুসরণ না করে সর্বত্র 'শ' দিয়ে বানানের পক্ষপাতী। এক্ষেত্রে 'খ্রীষ্ট' এবং 'খ্রীষ্টান' ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৬. অতৎসম শব্দের বেলায় s-এর স্থানে স এবং sh-এর স্থানে শ-এর ব্যবহার বিধেয়। কিন্তু বাঙলা স-এর কোনো নির্দিষ্ট উচ্চারণ নেই এবং বহু

জায়গায় স-এর উচ্চারণ sh-এর মতো। সেজন্য বহুপ্রচলিত বানান হলে 'স' বানানই রাখতে হবে। যেমন সাবান (শাবান), সেজদা (শেজদা), সরু (শরু) ইত্যাদি।

৭. সমাস ও প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে যে জায়গায় বাঙলা নিয়ম প্রচলিত, আমরা ব্যবহারিক সুবিধার জন্য তাই গ্রহণ করব। যেমন যোগীগণ, প্রাণীগণ ইত্যাদি।

৮. ও-কার, ঊর্ধ কমার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানরীতির ৮ সংখ্যক নিয়ম অনুসরণ করব। উক্ত নিয়ম অনুসারে· 'সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্য অতিরিক্ত ও-কার বা ঊর্ধ-কমা যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয়। যদি অর্থগ্রহণে বাধা হয় তবে কয়েকটি শব্দে অন্ত্য অক্ষরে ও-কার এবং আদ্য বা মধ্য অক্ষরে ঊর্ধ-কমা বিকল্পে দেওয়া যাইতে পারে, যথা—কাল, কালো , ভাল, ভালো ; মত, মতো ; পড়ো, প'ড়ো (পড়ুয়া বা পতিত)।

এই সকল বানান বিধেয় এত, কত, তত, যত ; তো, হয়তো, কাল (সময়, কল্য), চাল (চাউল, ছাত, গতি), ডাল (দাইল, শাখা)।' এই প্রসঙ্গে 'পরিচয়'-এর বানানরীতি প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি কথা বলা দরকার :

ক বাঙলায় এ-কারের একাধিক উচ্চারণ আছে। যেমন—এক শব্দটি উচ্চারিত হয় অ্যাক-এর মতো। আমরা বিদেশী শব্দ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে অ্যা স্থলে এ রাখার পক্ষপাতী। সেজন্য অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান , কিন্তু গেল, দেখ (গ্যালো, দ্যাখো নয়)।

খ. অতীতবাচক ক্রিয়াপদের অন্তে ও-কার যথাসম্ভব বর্জনীয়। যেমন—খাইল, চলিল, বলিল ইত্যাদি।

৯. ঙ এবং ং-এর বিকল্প প্রয়োগ থাকলে ঙ দিয়ে লেখা বিধেয়। কেননা স্বরাশ্রিত পদ হলে ং বানান অসুবিধাজনক। যেমন বাঙলা, বাংলা ; কিন্তু বাঙালি—'বাং-আলি' অচল।

১০. প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসরণ করব। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, 'পরিচয়' পত্রিকার বিদেশী শব্দের বেলায় রোমান হরফ ব্যবহার যথাসম্ভব বর্জিত হবে। মূলানুগ অথবা প্রচলিত উচ্চারণ অনুযায়ী লিপ্যন্তর হবে।

সূচিপত্র

বর্ষ ৩৭ / সংখ্যা ১০-১২
মে-জুন-জুলাই '৬৮
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় '৭৫

নিয়মিত বিভাগ

সম্পাদক
সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭ থেকে প্রকাশিত। ফোন . ৩৪৬০০৩

ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে

বিষ্ণু দে

গোধূলি বিবর্ণ হল। অন্ধকার একটি প্রতীক্ষা,
নিদ্রায় ও বিনিদ্র প্রয়াসে, প্রহরে প্রহরে
অনাগত, সম্পূর্ণ দিনের।

অতএব চোখ খুলে ধূসর নেতিতে বিশ্ববীক্ষা
চর্চা করা। ধৈর্যভরে, যাতে উত্তীর্ণ বিবাদে
আরেক আনন্দ শুনি, অর্ধমৃত বিধ্বস্ত শহরে
দায় শুধি গ্লানির আকাশে দৈনন্দিনে মানবঋণের,
আনন্দেই, কিংবা তারই নামান্তরে, ঐতিহাসিক বিষাদে,
ট্রাজিক উল্লাসে তীব্র অথচ উদাস ভারতীয় সঙ্গীতের মতো।

•

গর্কি : জীবন-সাহিত্য

[১৮৬৮—১৯৩৬]

গোপাল হালদার

গর্কি যখন রুশিযায জন্মেন (১৮৬৮ খ্রীঃ) তখনো রুশিযায জাবেব স্বৈবতন্ত্র ইতিহাসের বিরুদ্ধে ঐবাবতেব মতো মূঢ ঔদ্ধত্যে দাঁড়িযে, আব গর্কি যখন মাবা গেলেন (১৯৩৬ খ্রীঃ) তখন ইতিহাসেব জোযাবে সোভিযেত সমাজ আপন পাল তুলে দুর্বাবগতি। রুশিয়াব এই রূপান্তবেব সাক্ষী গর্কি, কতকটা তাব সাবথিও।

গর্কির দেশ ও গর্কির কালঃ রুশিযাব যাত্রা আবস্ত হয দেকাব্রিস্তদের বিদ্রোহ (১৮২৫ খ্রীঃ) থেকে। তখনকাব অভিজাত বিদ্রোহীবা চেযেছিলেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। পেলেন কঠিন রাজদণ্ড, বেখে গেলেন শহীদেব ঐতিহ্য। অনেক দেরিতে ১৮৬১তে ভূমিদাসবা মুক্তি পেল। গণতান্ত্রিক শক্তি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের 'বৃহৎ সংস্কাব'-এও তাই তৃপ্ত হল না। 'ভূমিদাস'দেব মুক্তিতে তখন জমির মালিক হল জোতদাব, নতুন জমিদাব প্রভৃতি শোষকের দল, ভূমিতে দেখা দিল ক্রমে কৃষি-মজুব-খাটিযে মালিকানা-শোষণ (ক্যাপিটালিস্ট এ্যাগ্রিক্যালচব)। গর্কির বাল্যে ও যৌবনেই সেকেলে ব্যবসাযী গোষ্ঠী, সেকেলে ব্যবসায পদ্ধতি অবশ্য পচ ধবে লুপ্ত হচ্ছিল, নতুন বণিক-ধনিকেবাও কর্মতৎপবতায কলকাবখানার দিকে এগিযে এসেছিল। শতাব্দীব শেষ কোঠায বিদেশী পুঁজিপতির আধিপত্যও বৃদ্ধি পেল। অন্য দিকে ভূমিহীন কৃষকেরা সংখ্যায তখনো অগণিত, গ্রামেব গবীবেরাও অসংখ্য, সেখানে গ্লানিরও সীমা শেষ নেই। শহবে বন্দবেও জমছে ভবঘুরে বাউণ্ডুলের দল।

আর, এই বাধন-ছেঁড়া মানুষের সমাজের মধ্যে থেকে কলে-কারখানায় ক্রমেই দানা বেঁধে উঠল শতাব্দীর শেষ অঙ্কে প্রোলেতারীয় মজুরশ্রেণী। অভিজাত শাসকশ্রেণীর সঙ্গে অবশ্য তার পূর্বেই রাষ্ট্রে শাসনে-শোষণে অংশীদারত্ব পেয়েছিল উচ্চ-মধ্যবিত্তশ্রেণীর শিক্ষিতের একাংশ। শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই সেই সঙ্গে আবার নিম্ন-মধ্যবিত্ত শিক্ষিতশ্রেণী গণতান্ত্রিক ও শোষণ-বিরোধী চেতনায় পরিপুষ্ট হয়েছে। ভূমিদাস প্রথার অবসানে তাদের দল সংখ্যায় হয়েছে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর, আর দিনের পর দিন গণতান্ত্রিক বিদ্রোহচেতনায় উগ্র থেকে উগ্রতর। কিন্তু শাসকশক্তির কঠোর দমনে না আছে তাদের গণতান্ত্রিক পথে বিকাশের সুস্থ অবকাশ, আর ব্যাহত আক্রোশে না পারে তারা কোনো সংগঠনে ও কার্যক্রমে মনঃস্থির করতে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত মধ্যজীবীরা হয় স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক, নয় দিগভ্রান্ত বিদ্রোহী। উদারনীতিক গণতন্ত্রীদের প্রভাব রুশিয়ায় কোনো সময়েই বিস্তৃত হতে পারে নি। বরং বিদ্রোহকামী বুদ্ধিজীবীরাই পেয়েছে সে প্রাধান্য। কেউবা তারা কখনো নিহিলিস্ট-ভাবনায় উন্মার্গ হল। কেউ বা হল নারোদনিক অর্থাৎ জনবাদী। বাকুনিনের নৈরাজ্যবাদী চেতনায় নারোদনিকদেরও কেউবা গ্রামের কিংবা বিলুপ্ত কৃষক-জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ব্যাহত কিংবা বিলুপ্ত হয়ে গেল। কেউবা সন্ত্রাসবাদী কর্মে জারকে হত্যা করে, রাজপুরুষদের হত্যার চক্রান্তেই পাক খেতে লাগল, আর দলে দলে প্রাণদণ্ডিত হল। এরই মধ্যে রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে মার্কসের লেখা (১৮৭২ খ্রীঃ), প্লেখানভ-এর মতো মার্কসবাদীদেরও উদ্ভব হয়েছে। দেখা দিয়েছে শ্রমিকদের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিপ্লবীর দল। তাদের শ্রমিক-পন্থী মতবাদকে অগ্রাহ্য করে সোশ্যাল রিভল্যুশনারি দল বিস্তার লাভ করে কৃষক-বিপ্লবের লক্ষ্য নিয়ে, কৃষক-সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন নিয়ে, আর স্বাতন্ত্র্যকামী ব্যক্তি-সত্তার দাবি নিয়ে। গর্কিও এঁদের ব্যক্তিসত্তার বিশেষ দাবিতে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু কৃষক বিদ্রোহ অপেক্ষা শ্রমিক বিদ্রোহেই ছিল তাঁর আস্থা। কার্যত সোশ্যাল রিভল্যুশনারিদের বিদ্রোহ গিয়ে ঠেকেছিল প্রায়ই সেই সন্ত্রাসবাদের পাকচক্রে। শতাব্দীর শেষ দিকে মার্কসবাদী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা যেমন দল বাঁধল (১৮৯৮ খ্রীঃ), সোশ্যাল রিভল্যুশনারিও তেমনি গোষ্ঠীবদ্ধ হল। তারপর (১৯০৩ খ্রীঃ) সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা বলশেভিক ও মেনশেভিক দুই শাখায় ভাগ হয়ে গেল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে এল

রুশ শ্রমিকের অভ্যুত্থান—দেশের সকল বিদ্রোহবাদীরাই তাতে যোগ দেন—গর্কিও বাদ যান নি। কিন্তু বিদ্রোহ বিস্তৃত হতে পারল না, দমিত হয়ে গেল। আর চলল তখন তার প্রতিক্রিয়া—একদিকে বিদ্রোহীদের মধ্যে অবসাদ, অবিশ্বাস, নিরাশা, অন্যদিকে স্বৈরতন্ত্রের কঠিন একটানা দমন-নীতি। এভাবেই রুশিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪ খ্রীঃ) মধ্যে এগিয়ে যায়। আর যুদ্ধের সংঘাতে জারতন্ত্রের ভাঙা শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ চূরমার হয়ে পড়ে (ফেব্রুয়ারি, ১৯১৭ খ্রীঃ)। আট মাসের মধ্যেই লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলে (৭ নভেম্বর, ১৯১৭ খ্রীঃ)। সোভিয়েত রাশিয়ার জন্ম হল। সর্বনাশা গৃহযুদ্ধ, বহিঃশত্রুদের আক্রমণ, দুর্ভিক্ষ (১৯১৭—১৯২১) এসব পেরিয়ে লেনিনের নেতৃত্বে পুনর্গঠনের প্রারম্ভ, সোভিয়েত সংঘের প্রতিষ্ঠা, আর শেষে স্তালিনের নেতৃত্বে পঞ্চবার্ষিক সংকল্পের সঙ্গে (১৯২৯ খ্রীঃ থেকে) সোভিয়েত সমাজের জয়যাত্রা—তা আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বাধিক বিস্ময়!

রুশিয়ার এই সামাজিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয় ও বিদ্রোহ এবং বিপ্লব ও অভ্যুদয় গর্কি পূর্বাপর দেখেছেন। পড়ন্ত ব্যবসায়ী, উঠন্ত ব্যবসায়ী, ছিন্নমূল কর্মকুণ্ঠ ভবঘুরে মানুষ, স্বার্থপর অকর্মণ্য বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধিজীবী বিপ্লবী কর্মী, গ্রাম্য স্ত্রী-পুরুষের কদর্য আচরণ, জীবন, সংকল্পনিষ্ঠ নতুন শ্রমিক—এ সবের সঙ্গে নিজের জীবনেই তাঁর পরিচয় ঘটেছে। বিরাট রুশিয়ায় জনসমাজের জীবনে জীবন যোগ করেই গর্কি আপনার সত্তারও সন্ধান পান। কঠিন ছিল গর্কির ব্যক্তি-জীবনের সেই পরিবেশ, কঠিনতর মন্থন-পরিক্লিন্ন সমুদ্র থেকে অন্তর-লক্ষ্মীর উদ্ধার।

জীবনকথা ঃ ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ মার্চ, নিঝ্‌নি নভ্‌গরদ-এ গর্কির জন্ম—তাঁর আসল নাম আলেক্‌সেই ম্যাক্‌সিমোভিচ্‌ পেশকভ্‌। আলেকসেই থেকে ডাক নাম 'আলোয়াশা', 'গর্কি' তাঁর সাহিত্যিক নাম—অর্থ 'তিক্ত'। প্রথম লেখা থেকে ওই নামেই সাহিত্যে তাঁর পরিচয়,—নিঝ্‌নি নভ্‌গরদ শহরেরও ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাই নাম হয়েছে গর্কি। ২৪ বৎসর বয়সে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আলেক্‌সেই ম্যাক্‌সিমোভিচ্‌ পেশকভ্‌-এর প্রথম গল্প তিফলিস্‌ (ৎবিলিসি) শহরের 'কর্সাক' ('কাভকাস্‌') নামের সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। পাণ্ডুলিপিতে লেখকের নাম নেই, সম্পাদক নাম জানতে চাইলেন।

বিশেষ না ভেবেই আলেক্‌সেই পেশকভ্ নাম বসিয়ে দিলেন 'ম্যাক্‌সিম্ গর্কি'— "চরম তিক্ত" বা চরম ক্ষুব্ধ। না-ভেবে বসানো নামটা লেখকের না হোক লেখকের অভিজ্ঞতারই পরিচায়ক আর সে অভিজ্ঞতা বাস্তব জীবনেরই অনুভূতি-সঞ্জাত। রুশিয়ার ও নিজের জীবনের যে তিক্ততা ও যে বিক্ষোভ গর্কি আপনার মধ্যে বহন করে উদিত হলেন তা অপরিমেয় ও অকৃত্রিম। গর্কির ত্রিখণ্ডের আত্মজীবনকথায় তিনি এই জীবনের প্রথম বিশ বৎসরের স্মৃতি অপূর্ব শিল্পে রূপায়িত করেছেন। 'শৈশব' (১৮৬৮—৮০), 'শিক্ষানবিশী' (১৮৮০—৮৪) ও 'আমার বিশ্ববিদ্যালয়' (১৮৮৪—৮৮) এই তিন খণ্ডের জীবন মূলত সত্য , বাস্তবকে সত্য করে তোলা হয়েছে শিল্পের পদ্ধতিতে—মূল কথাকে অপরিবর্তিত রেখে।

মা-বাপ হারানো—বাড়ি খেদানো ঃ তিন বৎসর বয়সে পিতৃহীন আলেক্‌সেই আস্ত্রাখান থেকে মায়ের সঙ্গে ফিরে আসে মাতামহ ও মাতামহীর গৃহে নিঝ্‌নি নভ্‌গরদে। পিতা ম্যাক্‌সিম্ সাভেতিয়েভিচ্ পেশকভ্ আস্ত্রাখানে ছিলেন এক ছুতোর মিস্ত্রির সাক্‌রেদ কারিগর। আলেক্‌সেইর থেকেই কলেরায় তিনি আক্রান্ত হন , পুত্র বাঁচল, পিতা রক্ষা পেলেন না। গর্কির অবশ্য পিতৃস্মৃতি সামান্যই মনে ছিল। অন্য কোনো তিন বৎসরের শিশুর পক্ষে তা একেবারেই মনে থাকবার কথা নয়। 'শৈশব' (দেৎস্‌ৎভো, ডিসেম্বর, ১৯১৩ খ্রীঃ প্রকাশিত) খণ্ডে প্রথম অধ্যায়েই পিতার একটি চিত্রছায়া তবু নিপুণ হস্তে গর্কি সুরক্ষিত করেছেন। দীর্ঘদেহ, শান্ত, স্নেহশীল এক পুরুষ মৃত্যুতে শয়ান। তার পরে সমাধির দৃশ্য—বাদলা দিন, সমাধিক্ষেত্রের একটা নির্জন কোণ, শবাধার, তার ঢাকনির উপরে দুটি ব্যাঙ—দিদিমার হাত ধরে শিশু আলিয়োশা। মা ভাবভারা অনুপস্থিত। কারণ শৈশবের কাহিনীতে ঠিক পূর্বেই গর্কি বর্ণনা করেছেন—স্বামীর মৃত্যুর পরে শোকাকুল মাতার দ্বিতীয় পুত্রের প্রসব-যন্ত্রণায় অধীরতা, শিশু আলিয়োশার চোখে তাও তার দেখা। তবে সে শিশু-ভ্রাতা আসলে জন্মেছিল সমাধির আগে নয়, সমাধি-সংকারের পরের দিন। এইটুকু পিতৃপরিচয়ই আলিয়োশার স্মৃতিতে সঞ্চিত ছিল। মায়ের সঙ্গে অবশ্য তার পরিচয় এর চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী। প্রথমেই শুনি— "সাধারণতঃ তিনি (মা) ছিলেন কঠিন স্বভাবের মেয়ে, বেশি কথায় সময় নষ্ট করবেন না। পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি সুপুষ্ট যেন এক ঘোটকী , দেহ শক্ত আর

বাহু সবল।" দ্বিতীয় শিশুকে মা অচিরেই হারান, কিন্তু আলিয়োশাকে স্নেহ-আদর বিশেষ করতেন না, সে-ই তো তাঁর স্বামীর মৃত্যুর কারণ, দুর্ভাগ্যের মূল। ভারভারা অবশ্য ৫ বৎসর পরে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে চলে যান, গর্কি থাকে মাতামহ-মাতামহীর কাছে। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামী য়েভগেনী ম্যাক্সিমোভ্‌ও জুয়ায় মদে সব উড়িয়ে দেয়। ভারভারা তাই পিতৃগৃহেই ফিরে আসেন যক্ষ্মারোগ নিয়ে আর আলিয়োশার ১১ বৎসর বয়সেই মারা যান—ছেলের মনে বিশেষ কোনো স্নেহের স্মৃতি তিনি রেখে যান নি।

৩ বৎসর থেকে এই ১১ বৎসর পর্যন্ত গর্কির এই 'শৈশব' মাতামহ কাসারিনের গৃহে অবাঞ্ছিত আশ্রিতের জীবন—এক নিঃসীম বিভীষিকার জীবন। মানব-জীবনের পক্ষে এই বয়সই 'চেতনা-প্রত্যূষ', অথচ জঘন্য পীড়নে ও বিভীষিকায় আলিয়োশার সে জীবন ভারাক্রান্ত। কলহ, গালাগালি ও মারামারি সে বাড়িতে লেগেই আছে। পুরুষেরা স্ত্রীদের মারছে—বুড়ো ভাসিলি কাসারিন দিদিমা আকুলিনাকেও বাদ দেয় না। আর শিশু আলিয়োশার উপরে সেই মাতামহ ও মামারা যে পারে সেই চালায় চাবুক। বুড়ো কাশারিন যেন এই শিশুর জাতশত্রু। তবে কাউকেই সে ছাড়ে না। তবু সে গৃহে গর্কির জীবন যে সম্পূর্ণ রাহুগ্রাসে পড়েনি তার কারণ দুটি—গর্কির সবল শক্ত দেহ ও প্রাণশক্তি, আর মাতামহী আকুলিনার সর্বংসহা স্নেহ ও মমতা, সবল জীবনবোধ, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রচুর সহজ সুস্থ মানবতা। শিশুর প্রাণ এই স্নেহেই আপনাকে পোষণ করবার সুযোগ পেয়েছে। 'শৈশব'-এর পাতায় তাই আকুলিনার যে চিত্র ফুটে রয়েছে তাতে তিনিও চিরস্মরণীয়া হয়ে আছেন। আর ক্ষুব্ধ, বিদ্রোহী গর্কির চেতনার মধ্যে তিনি মানুষের প্রতি বিশ্বাসের ও নারীর প্রতি মমতার অম্লান রেখাটিকে জ্বালিয়ে রেখে গিয়েছেন, তাও অনুভব করা যায়। অথচ আকুলিনা অসামান্যা কোনো মহতী রমণী নন, বরং সুখ-দুঃখ, গতানুগতিক ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার-ধারণা নিয়ে মমতায়-মানবতায় স্বাভাবিক একটি জীবন্ত দিদিমা—এইমাত্র। আলিয়োশাকে যে স্বামী-পুত্রদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতে পারতেন, এমনও নয়। তাঁর কাছ থেকে শিশু শুনেছিল পুরনো কথা, রুশিয়ার লোকাচার ও লোককথার আস্বাদও পেয়েছিল। সে বাড়িতেই আরেকটা হতভাগ্য লোকও ছিল তার উৎস: 'আচ্ছা'। মাস পাঁচ-সাতের বেশি ইস্কুলে

আলিযোশার পড়া হযনি—ধর্মকাহিনী পড়বার মতো শুধু অক্ষরজ্ঞানই হয়েছিল।

মাতামহ কাসারিন তখন ব্যবসাযে প্রায দেউলে হতে চলেছে। মায়েব মৃত্যুর পবে আর উপায বইল না—তাকে খেটে খেতে হবে—আলিযোশা তখন ১০ বৎসর পেরিয়েছে। সে জুতোব দোকানের, কখনো স্টিমাবের থালা-বাসন মাজার চাকর, পটুযাব সাকরেদ, ছেঁড়া-কাপড় কুড়ানিযা বা পাখি ধরা। তবে বেশিটা সমযই যায সম্পর্কিত মামা সের্গেইদেব বাড়িতে। ভালেন্তিন সের্গেই বাড়ি-ঘরেব নকশা তৈবি করে, মোটামুটি স্বচ্ছল, আলিযোশা তাদের বাড়ি খাটবে, কাজ শিখবে, পাবে খোবাকি। ১৮৮০ থেকে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই চার বৎসব সেই শিক্ষানবিশীব বৎসব—আব তাব কথাই সংক্ষিপ্তভাবে গর্কির 'আমার শিক্ষানবিশী'তে (ভ্‌ ল্যু দাখ, প্রকাশ—১৯১৬ খ্রীঃ) আছে। সের্গেইদেব এ বাড়িতে তাব অবস্থা ছিল আরও দুর্বিষহ—বাড়ির সকল বকমের খাটুনিব কাজ আলিযোশার—নকশা আঁকা শিক্ষাই শুধু বাদ। মারধোর, গালমন্দ, অপমান-পীড়নেব থেকেও বেশি অসহ্য ওদের ঘুণধরা কুড়েমি, ছোটলোকি, আর বাড়ির লোকজনেব কুৎসিত আলোচনা। আলিযোশা তাই পালাল—পালাবার জন্যে সে তার 'শৈশব'-এও ছটফট করত। পালিয়ে গিযে প্রথম কাজ নেয 'দোবরি' নামে ভোলগায এক স্টিমারে—থালাবাসন ধোযার কাজ। দুদিকে ভোলগার দৃশ্য—মাঝে মাঝে গঞ্জ, আবাব গ্রাম অরণ্য মাঠ, এখানেই রাঁধুনি-বাবুর্চির এক-বাক্স বই তার হাতে পড়ে—দিনের ফাঁকে ফাঁকে তীরেব দৃশ্য দেখা, আর বাত জেগে বই পড়া—নির্ঝবেব স্বপ্নভঙ্গের আয়োজন হয। হান্স অ্যাণ্ডার্সনেব রূপকথা থেকেই সে শুরু কবেছিল প্রথম। নানা অদ্ভুত আগাছাব জগৎ মাড়িযে গগল, নেক্রাসভ থেকে স্কট, ডিকেন্স, দুমার জগতে গিযে পৌছল। নেশা লাগল—যে নেশা আর ছাড়বে না। জাহাজের কাজ হাবিয়ে আলিযোশা নিলে পাখি-ধরাব কাজ—বনে-বনে রাতে-বেরাতে ঘুরে-ঘুবে পাখি ধরাও তার একটা নেশা। আর দেখছে কত রকমের মানুষ। তারপরে ঐ নকশাদাবেব বাড়িতে কাজ করতে করতেও দরজির বউ, সামবিক অফিসারের বিধবা স্ত্রী, এখানে ওখানে যার কাছে পায় গোগ্রাসে গিলে চলে বই। বালজাক, ফ্লোবের, স্তাঁদাল এদিকে; আর ওদিকে রুশ লেখক-কবি পুশকিন্। আলিয়োশা পড়াব নেশায মেতে

ঠিক করলে সে পডবে। কাজানে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকবে। বয়স তখন ১৫।

আরম্ভ হল নতুন পর্ব—১৮৮৪ থেকে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ। এ পর্বের কথাই গর্কির 'আমার বিশ্ববিদ্যালয়'-এ সংক্ষেপে দু-অধ্যায়ে আছে, অন্যত্রও ছাডা ছাডা ভাবে তখনকার নানা অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। কাজানে গেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে পডা হল না। সে বকম অবস্থা কই, ব্যবস্থা কোথায? জুটল অন্য রকমের বিশ্ববিদ্যালয়—নদীপাডেব গঞ্জ গুদামে, মাটির নিচের অন্ধকূপে,—যত বাউণ্ডুলে, ভবঘুরে, ভিখিরি, জাহাজের খালাসী, মাতাল, চোর, পকেটমার, দাগী আসামী, স্ত্রী-পুরুষ—আর তাব মধ্যে ছাত্র ও বিপ্লবী কর্মীও। গুপ্তচক্রের পুঁথি পডা বিপ্লবী তাবা—অধিকাংশই তারা স্বপ্নেই শুধু জনতাকে দেখেছে রঙিন চোখে। তবু তাদের মধ্যে পাওয়া গেল দুটি খাঁটি মানুষ—রোমাসের মতো স্থির দৃষ্টি বিপ্লবী, আন্দ্রেই দেরেংকভ-এর মতো বিপ্লবীদের পোষক, মুদিখানার ও রুটিখানার মালিক বিপ্লবী। দেরেংকভের রুটিব কাবখানাতেই কাজ করত আলিযোশা। তিন বছরে একটা জায়গায় এবার সে পৌঁছে যাচ্ছিল। স্মৃতিতে সব জমছে, তবু কডচাও রাখছে, লিখতেও চেষ্টা করে। কিন্তু বিপ্লবীরা, বুদ্ধিজীবীরা এই আঁধিতেই ঘুরছে। আলিয়োশার চারদিকই নীরন্ধ্র, শূন্য। এমন সময় আবার পেল দিদিমা আকুলিনার দুঃখে দারিদ্র্যে অবহেলায মৃত্যুর সংবাদ। হতাশায় একটা পিস্তল কিনল আলিয়োশা—আত্মহত্যা কববে। নদীর পাডে গেল, আপনার বুকে গুলি করলে—কিন্তু মারা গেল না। সবল সুস্থ দেহ, দুর্বাব প্রাণশক্তি হাব মানল না গুলিতেও। শ্বাসযন্ত্র ফুটো হযে ভবিষ্যতেব যক্ষ্মারোগের জন্যে পথ তৈবি করে রাখল। আর ২০ বৎসরের আলিযোশার বাঁচবার সংকল্পও আরও দুর্জয় করে তুলল। হাসপাতাল থেকে বেরুলে রোমাস-এর সঙ্গে কাজান জেলার এক গ্রামে চলে গেল—কৃষকদের মধ্যে তারা বিপ্লবের কাজ করবে। এই আলিয়োশাব যথার্থ কৃষকজীবনের অভিজ্ঞতা—দেখল কী অশিক্ষা-কুশিক্ষা পুঞ্জিত সেখানে। মানুষের মন-বুদ্ধি ভণ্ডামিতে, নিষ্ঠুরতায়, অমানুষিকতায কেমন বিকৃত। দুই বন্ধুকে মেরে আগুনে পুডিয়ে মারতেও গ্রামের লোক চেষ্টা করেছিল। আলিয়োশা কৃষক গ্রাম ছাডল। ভোলগার ষ্টিমারে কাজ করে, লুকিয়ে পালিয়ে আস্ত্রাখান দিয়ে এসে গেল কাশপিয়ান সাগরের তীরে। এইখানেই এই তৃতীয় পর্বের শেষ।

রুশিয়ার পথে পথে ঃ 'বিশ্ববিদ্যালয' খণ্ড শেষ—কিন্তু গর্কিব কথা জীবন-কথা কি ফুরোল ? না, ঝড়ো পাখির গানই আবন্ত হতেও বাকি। ঝড়ের ডাকে সে বাসা-ছাড়া হয়ে উড়ে চলল আবার।

দূর নির্জন এক রেল-স্টেশনে সে হল পাহারাদার। রাত জেগে নিঃসঙ্গ পাহারা দেয়। একবার তুষার-ঝঞ্ঝায় মরতেই ছিল বাকি। বদলি হযে তারপর গেল এক স্টেশনে—বরিস্‌গ্লোস্ক-এ। লেখাপড়া জানা কর্মীও সেখানে আছে। কিন্তু কী চাই, কী দেশের অবস্থা, সে সবে ওই বুদ্ধিজীবীদের কোনো মাথাব্যথা নেই। সত্যই যারা ভাবে তারা আত্মহত্যা করে নিষ্কৃতি পায়—যে নিষ্কৃতি আলিযোশা আর চাইবে না।

তখন ২১ বছবে পা দিচ্ছে—জারতন্ত্রের নিয়মে এবার ফৌজের শিক্ষা নিতে সে বাধ্য। ভলগার তীর ধরে হেঁটে চলল আলিযোশা মস্কো হযে নিঝ্‌নি নভ্‌গরদ-এ। কাঁধে ঝুলি, ঝুলিভরা কড্‌চা আর লেখা কবিতা-কাহিনী। ফৌজেব বাছাইতে সে বাদ পডল—শ্বাসযন্ত্র তাব ফুটো, সে ফৌজে অযোগ্য। কাজ পেল এক চোলাইব কাবখানায, বাস দুই বিপ্লবী বন্ধুব সঙ্গে। তাদেব খোঁজে এসে পুলিশ তাদের না পেযে আলিযোশা পেশ্‌কভ্‌কে গ্রেফতার করলে (অক্টোবর, ১৮৮৯ খ্রীঃ)। নিঝ্‌নি নভ্‌গরদের জেলে কাটল দিন তিনেক। এই প্রথম গর্কি জারের পুলিশের হাতে পডল—যতদিন জার-রাজত্ব চলেছে (১৯১৭ খ্রীঃ) ততদিন সে কখনো স্বস্তি পায নি। নিঝ্‌নি নভ্‌গরদে এর আগেই অবশ্য লেখক ও সম্পাদক ভ্লাদিমিব কোবোলেংকোর কাছে আলিযোশা গিয়েছিল নিজের লেখা নিযে। তিনি সুলেখক, বিপ্লবীভাবের লোক, নতুন লেখকদেব বন্ধুও। লেখক-জীবনে গর্কিব প্রধান হিতৈষী উপদেষ্টা হবেন কোরোলেংকোই। এখন কিন্তু খুশি হলেও তিনি বুঝলেন—কাঁচা লেখা, ছাপার মতো নয। আলিয়োশা হতাশ হয়ে প্রায চুপ মেরে গেল। ঝোঁক তবু যায না—পডাব নেশায তা আরও বাড়ে, কিন্তু আত্মবিশ্বাসও আব পায না। অবশেষে চলল আবার নিঝ্‌নি নভ্‌গরদ থেকে পায়ে হেঁটে, রুশিয়াব পথে-পথে পদযাত্রী। মাঠে, বন্দরে, হোটেলে, গ্রামে দিন কাটিযে কাটিয়ে, রুশিয়ার আকাশ বাতাস মাটি মানুষ সকলের সঙ্গে হাড়ে-মাসে পরিচয় হতে থাকে। সমস্ত মধ্যরুশিয়া পেরিযে চলে ভলগার তীরে তীরে, দোন-এর

তীব ধবে, উক্রাইন পেরিয়ে যায় বেসাবেবিয়া পর্যন্ত। তারপব ফিবে কৃষ্ণসাগরেব উপকূল ধবে ওদেসা হয়ে, কার্চ প্রণালী দিয়ে, ককেশাসেব পার্বত্য অঞ্চলেব মধ্য দিযে—একেবাবে তিফলিস্ (ৎবিলিসি, জর্জিযা)। পথে যা জোটে খেযেছে, যা কাজ পেযেছে করেছে, যেখানে মাথা গুঁজবার ঠাঁই পায থেকেছে—কিন্তু দেখেছে। দেখেছে দোকানী-পশারী, মজুর, স্ত্রী-পুরুষ, বাউণ্ডুলে, ভবঘুরে। এক-একবার দুর্দান্ত স্বভাবের বশে পড়েছে নানা বিপদে। শৈশবে পেশকভ্ একবাব সৎপিতাকে দেখেছিল সন্তানসম্ভবা মাকে লাথি মারতে, অমনি ছুবি নিয়ে ঝাঁপিযে পড়েছিল সেই বাপকে খুন করতে। তাকে ধরে ফেলে তাব আগেই—বেদম মাব খেল সেজন্য আলিযোশা। উক্রাইনের এক গ্রামে এবাব দেখল—সমস্ত গ্রামের লোকে মিলে একটি মেযেমানুষকে তাডনা কবছে। মেয়েটি অসতী, তাই তাকে উলঙ্গ করে ঘোড়ার সঙ্গে গাড়িতে যুতে, স্বামী চাবুক মেবে সেই গাড়ি হাঁকাচ্ছে,—আর গ্রামের লোকেব পৈশাচিক উল্লাস ('ঘোডদৌডেব পবীক্ষা')। পেশকভ্-এর অসহ্য এ দৃশ্য—নারীর উপব অত্যাচাব। বাধা দিতে সে এগিযে গেল। অচেনা লোকটার স্পর্ধা কী। গ্রামশুদ্ধ সবাই ঝাঁপিযে পড়ল তাব উপর। মেবে লাশ করে ফেলে দিয়েছিল পথেব পাশের ঝোপে। পথে যেতে আবেক গ্রামের একজন লোক ঝোপেব মধ্যে দেখে সেই দেহ—হাসপাতালে নিয়ে তোলে লোকটাকে।—বুক দিয়ে এমনি দেশ দেখা, মানুষ দেখা—কার্চ প্রণালীতে একবার ডুবতে বসেছিল। জর্জিযায বরফের ঝড়ে মবতে মবতে বাঁচে। মাইকোপে দ্বিতীযবার তাকে পুলিশে গ্রেফতার কবে। "কি করছিল সে এখানে?" "আমি রুশিযাকে জানতে চাই।"—পাঠিযে দিল তারা জেলে। এমনি করে দেড বছর পথে-পথে রুশিয়াকে চিনতে-চিনতে গিযে পেশকভ্ তিফলিস্-এ পৌছেছিল। সেখানে আবার একবার পুলিশে ধরল। ছাড়া পেয়ে কাজ নিল সেখানকাব রেলেব আপিসে। শুনল—'কাভ্কাস্' কাগজের সম্পাদকও পোড-খাওযা এক বিপ্লবী রাজনৈতিক। তার কাছে পেশকভ্ গেল তার গল্প নিযে। সম্পাদক বসে বসে শুনতে লাগলেন তার মুখে নানা কাহিনী। দেখলেন অদ্ভুত লোকটার অভিজ্ঞতা, আর চমৎকার বলে গল্প। লিখে আনতে বললেন একটা গল্প; বেরুল 'মাকর চুদ্রা'—পেশকভ্ লেখকেব নাম লিখল—

'ম্যাকৃসিম গর্কি'।—সে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দেব ১২ সেপ্টেম্বর, পেশকভ্-এব-বয়স তখন ২৪ ছাড়িযে ২৫-এব মাঝপথে।

ঝড়ো পাখির গানঃ আলিযোশা ম্যাকৃসিমোভিচ্ পেশকভ্ 'গর্কি' নামেই পৃথিবীতে পবিচিত হতে আবন্ত করলে। সে-ও এক অসাধ্য তপস্যা—ঝড়ের গানও শিখতে হয ঝড়েব পাখিকে। লেখে, কাটে, আবাব লেখে, বাতে তার ঘবে বাতি নেবে না—পড়ে লেখে আব লেখে—অন্তত আবও ৫।৬ বছর এই তাব সাধনা। লেখাতেই দিন চলে—লেখাই জীবিকা। সামারায সংবাদপত্রের কাজও পেযেছেন। বিযে কবেছেন, ছেলেও হল (ম্যাকৃসিম, জন্ম, ১৮৯৭ খ্রীঃ)। নিঝ্নি নভ্গরদে, কাজানে, সামারাব নানা সাহিত্যপত্রে তার গল্প ছাপা হয, আর সামাবাব কাগজে ছাপা হয নবৃশা—ব্যাঙ্গের কশাঘাত তা শাসনবিভাগের উপব। নাম হচ্ছে। সামাবা থেকে গর্কি এলেন নিঝ্নি নভ্গবদেব কাগজে। কিন্তু বোঝা গেল—যক্ষ্মাও যেন ধবেছে (১৮৯৬ খ্রীঃ)। হাওযা বদলাতে দক্ষিণে গেলেন ক্রাইমিযায। খবচ জোগাবার জন্য দুই বিপ্লবী বন্ধু মিলে গর্কিব গল্পগুলোর সংকলন বের কবলে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। দুই খণ্ডেব এই 'রেখাচিত্র ও কথাকাহিনী' ('ওচাব্কি ই কীশ্কাজি')—তাতে ছিল 'চেল্কাশ্', 'বাজপাখির গান', 'ভেলায', 'মাকব চুদ্রা' 'ওবনলোভ্ দম্পতি', 'কোনোভ্লোভ্', 'মল্ভা', 'একদিন যারা মানুষ ছিল', 'বুড়ি ইজেবগিল' প্রভৃতি বিখ্যাত গল্প। এক বৎসব পরে তৃতীয আরেক খণ্ডও বেরুল। তার আগেই, এক বৎসবেব মধ্যে, নতুন সংস্করণ হল—গর্কিব গল্প নিযে সবাই পাগল। এতো গল্প নয, এ যে তাজা জীবন, পাতায পাতায জীবনের সাচ্চা ছাপ—আব গর্কির নিজেব অনুভূতি-চেতনায তা অদ্ভুত। কোথাও তাতে গর্কি পথ চলতে শুনছেন কাবও কথা, কোনো অদ্ভুত বেদে বা ছন্নছাড়া অজানা জাতের মানুষেব মুখে। কোথাও নিজেই বলছেন যত দেখেছেন—অনেকটা রূপকথা-উপকথাব ধাঁচে সাজিযে। হযতো তারই মধ্যে তা গর্কিবই অন্তবের একার্থেব সঙ্গে অন্যার্থের প্রশ্ন ও মীমাংসা।—নিজের থেকে বেশি মানুষেব আব কে? নিজেব শক্তিতে এগিযে চলা, বাঁচা, তাই তো জীবন। কি হবে যত নিষ্কর্মা দুর্বলদের জন্যে ভেবে? বেদেব মতো মুক্ত জীবনই জীবন—এক গর্কি তাই বলে—উদ্দাম বুড়ো মাকার চুদ্রাব

মুখ দিয়ে। মাকার তাদের বেদে জাতের রাদা ও লোইকো জবারের প্রেম ও সে প্রেমের গল্প শোনায়—মেয়েদের ভালোবেসেছ কি মরেছ—হাবাবে স্বাধীন মুক্ত জীবন। রাদাকে লোই ভালোবাসল, কিন্তু সইতে পারল না রাদার কাজে পৌরুষের অপমান। ছুরিকাঘাতে তাকে রাদাকে মারল জবর, জবরকে মারল বাদার বাপ দোনেলো। এই তো প্রেমের দশা। মাকার জানায়—কি শেখাবে তুমি মানুষকে? সংসারে চালাক লোকেরা যা পায় তাই লুটে পুটে খায়, অন্যদের ভাগ্যে কিছুই জোটে না—প্রত্যেকেই নিজের জীবন দিয়ে শিখবে এই কথা। মাকার চুদ্রার অভিজ্ঞতা জোর যার মুলুক তার,—এই কি? বুড়ি ইজেরগিল-ও কি তাই বলে? বুড়ি বেসারেবিয়ার এক অবজ্ঞাত জাতের বুড়ি, কুৎসিত কদাকার সকলের পরিত্যক্ত, নীতিধর্ম-ছাড়া, বলতে এখনো সংকোচ নেই বয়সের দিনে কত জনের সঙ্গে মাতা-মাতি করেছে। কিন্তু সেই বুড়ি শোনায় লরা ও দন্‌কোর কথা—লরা ঈগলের ছেলে, শিকারী পাখির বংশে তার জন্ম। মাতৃকুলের একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়ল, মেয়েটা তাকে চায় না, লরা তাকে খুন করলে। স্তেপের অন্তহীন প্রান্তরে এখনো ছায়া হয়ে ঘুরছে সেই লরা। এদিকে দন্‌কো ছিল নিজ কুলের নায়ক, নিজের হৃদপিণ্ড জ্বালিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তার লোকদের। এখনো বিজনে-বেঘোরে মানুষকে তেমনি করে হৃদপিণ্ড জ্বালিয়ে সে পথ দেখিয়ে নেয়, তারপর যখন তারা নিরাপদ জায়গায় পৌছায়, দন্‌কো মরে পড়ে যায়। এ গল্প তিন বৎসর পরে লেখা —১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। গর্কি বুঝছেন শক্তি তো চাই-ই, কিন্তু প্রাণের বাতি জ্বেলে পথ দেখাতে হয় মানুষকে, তাই তো শক্ত মানুষের কাজ। "জীবনে জীবন-যোগ", তাই তো সাহিত্যেরও মূল—তার ফুলও।

প্রথমে ঊনবিংশ শতাব্দীর রুশ লেখকরা দেখিয়েছেন রুশ উচ্চবর্গের উচ্চ-শিক্ষিতের নিষ্ফলতা—'অবান্তর মানুষ' তারা বাস্তব জগতে। শতাব্দীর শেষ পাদে গর্কি দেখেছেন নিম্নমধ্যবর্গে বিপ্লবী-অবিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের বাস্তব-বিমুখ অকর্মণ্যতা। সঙ্গে সঙ্গে দেখেছেন কাসাবিন-এর মতো সওদাগরদেরও অধোগতি। গ্রাম্য কৃষক জীবনের ইতরতা ও নিষ্ঠুরতা। বরং উদ্যোগী সওদাগর বণিকদেরই বুঝেছেন শ্রদ্ধা করা যায়; ছন্নছাড়া ভবঘুরেদের মধ্যেও আছে মূল মনুষ্যত্বের চমক। সেই বাউণ্ডুলেদেরই গর্কি দেখেন মমতার

চোখে—অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে। এ জগৎ তাঁর একান্ত চেনা, আর কারও নয়। সেই সঙ্গেই তবু অনুভব করেন এই অপচয়ের জীবনের মধ্যেও জীবনের মহৎ সম্ভাব্যতা। উদ্যোগে, কর্মে, সংগ্রামে জীবনকে রূপদান করাই মানুষের ধর্ম। এই তাঁর স্বপ্ন, রুশিয়ার সাধারণ মানুষকে চাই বিপ্লবের পথে তেমনি শক্তি ও সংকল্প দিয়ে গড়া। স্বপ্ন আর বাস্তব, রোমান্টিকতা আর রিয়ালিজম, একই সঙ্গে গর্কির গল্পে এরূপে মিশে আছে। ছন্নছাড়া মানুষের মুখ দেখতে দেখতে নিজের অনুভূতি ও আদর্শের আলোকেও সেই মুখকে তিনি ছেয়ে ফেলেন। মতবাদের আবরণে তা খোয়ালেও তাঁর খেদ নেই। মানুষ গড়তে হবে তাঁকে, তাই তো তাঁর কাজ, সে জন্যেই তো লেখা। গল্পের পর গল্পে এরূপে নানা জটিল মানুষকে চিনিয়ে দিতে দিতে আবার নিজের প্রশ্ন, নিজের সংশয়, নিজের স্বপ্নের কথাও গর্কি পেড়ে বসেন। এই ভাবেই আরম্ভ হল তাঁর সাহিত্য-জীবন, আর চললও এই ধারা বেয়ে।

গল্প লিখতে লিখতে হাত দেন উপন্যাসে, কবিতায়, নাটকে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্ভাগা পাবেলা'। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লিখলেন 'ফোমা গোর্দেয়েভ', তারপরই ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে 'ঝড়ো পাখির গান' ও 'তিনজন' (ত্রোয়ে)। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে নাটক 'নিচু মহলের কথা' (নাদ্‌নে), মস্কো আর্ট থিয়েটারে পেল মহা সাফল্য। এসবে অবস্থা স্বচ্ছল হলেও জীবনে দুর্যোগ কাটল না—জারের পুলিশ তাঁকে রেহাই দেয়নি। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কিছুদিন রুদ্ধ রইলেন তিফলিস্-এর দুর্গে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে আবার নিঝ্‌নি নভ্‌গরদের জেলে—কারণ, তাঁর 'ঝড়ো পাখির গান'ই তো ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ছাত্রবিক্ষোভের কারণ। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে গর্কিকে রুশ আকাদেমি সম্মানিত সদস্য পদ দিলে, কিন্তু স্বয়ং জার সে নির্বাচন নাকচ করে। অবশ্য প্রতিবাদে কোরোলেংকো ও চেকভও অ্যাকাদেমি থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে গর্কি স্বচক্ষে দেখলেন 'রক্তস্নাত রবিবার'-এ পিতর্সবুর্গে জনসাধারণের হত্যা, গর্কি প্রতিবাদ করলেন। তারপর ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে চুপ করে থাকেন নি। জার সরকারও তাঁকে গ্রেফতার করে আবদ্ধ করলেন কুখ্যাত 'পিতর-পল্' দুর্গে। মুক্তি পেলে লেনিনের পরামর্শে ভগ্নস্বাস্থ্য গর্কি আমেরিকায় চললেন। বিপ্লবের জন্য টাকা তোলা ছিল উদ্দেশ্য। সেখানে হার্স্ট-গোষ্ঠীর কাগজ-ওয়ালাদের জেহাদে অতিষ্ঠ হলেন—রুশ লেখকটা দুর্নীতিপরায়ণ, তার সঙ্গিনী

সুন্দরী রমণীটি (অভিনেত্রী মারিয়া ফিওদরোভনা আন্দ্রীভা) তার স্ত্রী নয়। নানা বিড়ম্বনা সয়ে ফিরে এসে ইতালির কাপ্রি দ্বীপে গর্কি বাসা বাঁধেন। এখানে বসেই রাখতেন রুশিয়ার ও দেশ-বিদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ। এখানেই বিপ্লব (১৯১৭ খ্রীঃ) পর্যন্ত প্রায় বরাবর ছিলেন, আর বিপ্লবের পরেও সোভিয়েত সরকারের আমলে স্বাস্থ্য খারাপ হলে প্রায়ই ফিরে যেতেন আবার কাপ্রিতে। তবে তখন তিনি রুশিয়ায় লেনিন-স্তালিনের সম্মানিত সুহৃৎ—মতের বহু পার্থক্য সত্ত্বেও সাহিত্য-সংস্কৃতির ব্যাপারে সোভিয়েতের প্রধান উপদেষ্টা। অবশ্য বিপ্লবের আগেই তিনি লেনিনের কথামতো কাপ্রিতে বিপ্লবী কর্মীদের শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন (১৯০৯ খ্রীঃ)। লেনিনও এসে কাপ্রিতে গর্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। মতের অমিল থাকলেও মনের মিল ছিল দুজনার বরাবর অটুট —বিপ্লবের আগে ও বিপ্লবের পরেও।

সোভিয়েতের সহযাত্রী : গর্কির অনেক গল্প, নাটক, উপন্যাস বিপ্লবের পূর্বেই বেরিয়েছে—১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে শুরু করেছিলেন 'মা' (মাৎ), ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ এপ্রিল তার শেষ খণ্ড ও 'জ্ঞান'-সংকলনে বেরুল ('জ্নানী' বা 'জ্ঞান' গর্কিদের সমবায় প্রকাশালয় ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত, এখান থেকেই প্রথম গর্কির সম্পাদনায় ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বেরোয় সাহিত্যপত্র 'জীবন' বা 'ঝিঝ্ন্'), তারপর 'স্বীকারোক্তি' (ইস্পোভেদ্), ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে উপন্যাস 'মাৎভেই কোঝেমিয়াকিন-এর জীবন কথা', ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে 'একটি মানুষের জন্ম' (রোঝাদেনী চেলোভেক) প্রভৃতি গল্পের সংকলন, আর 'রুশিয়ার পথে পথে' (পো রুশি)—আর 'শৈশব' প্রভৃতি সেই পূর্বতন জীবনের অভিজ্ঞতার অপূর্ব কাহিনী। এ সবই বিপ্লবের পূর্বেই লেখা।

সোভিয়েত আমলে গোর্কির দায়িত্ব ও কর্তব্যভার নানাদিকে বেড়ে গেল। একদিকে তিনি গণবিপ্লবের প্রধান লেখক, নানামতের লেখকদের প্রধান রক্ষাকর্তা সেই দুর্যোগ-দুর্ভিক্ষের দিনে; অথচ, তিনি বলশেভিকদের অনেক কাজের বিরোধী, নিজে তো রাজনীতিতে 'সোশ্যাল রিভল্যুশনারি' দলেরই বেশি সমর্থক—তাদের মতো কৃষকদের নিয়ে স্বপ্ন রচনা না করলেও তিনি ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও শক্তিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব-বিকাশেই বিশ্বাসী। আদর্শবাদেরও ঝোঁক গর্কির ছিল। লেনিন তাতে আপত্তিও করতেন। কিন্তু লেনিনের

সৌহার্দ্যই তাঁকে সোভিয়েতের বন্ধু করে তোলে, গল্প, উপন্যাস, নাটক, বিশেষ করে প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় সোভিয়েতকে রক্ষা করতে সব সময়েই তিনি অগ্রণী। স্তালিন তাঁকে আরও নিকটতর করে তোলেন। গর্কিই হন ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের 'প্রথম সোভিয়েত লেখক সম্মেলন'-এর সভাপতি, তাতেই 'সমাজতন্ত্রী বাস্তবতা'র নীতি ব্যাখ্যাত ও প্রণীত হয়। স্তালিনের থেকে গর্কির সে নীতি প্রণয়নে কম হাত ছিল না। রুশ সাহিত্যে এখনো তা সর্বগ্রাহ্য মূল নীতি, আর সেখানকার প্রবন্ধই গর্কিরও প্রায় শেষ প্রবন্ধ। ভগ্নস্বাস্থ্য গর্কি শোকাহত হয়েছিলেন একমাত্র পুত্র ম্যাক্‌সিম্-এর মৃত্যুতে (১৯৩৩ খ্রীঃ), জ্বলন্ত জীবন-দীপ আস্তে আস্তে নিবে গেল ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ জুন।

এই সোভিয়েত কালের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়েও প্রবন্ধ-বক্তৃতা ও গর্কির অনেক। গর্কির পরিণত মতামতের স্বাক্ষর হিসাবে তার গুরুত্ব যথেষ্ট। গর্কির এ আমলের সৃষ্টি-প্রয়াস কিন্তু তেমনি কতকটা এ সময়কার প্রচারের ঝোঁকে অনেক স্থলে প্রভাবিত—তবু তাও উল্লেখযোগ্য। এ সময়েই প্রকাশিত হয় তাঁর আত্মজীবনমূলক কথাসমূহ, তলস্তয়, চেখভ. লেনিন প্রভৃতির অতুলনীয় 'স্মৃতিচিত্র', 'ডায়েরির কড়চা' এবং অন্য বই ব্যতীত দুখানা প্রধান বড় উপন্যাস 'আর্তমানোর কারবার' (১৯২৬ খ্রীঃ) ও 'ক্লিম্ সম্‌গিনের জীবন কথা' ১৯২৭-৩৬ খ্রীঃ), প্রবন্ধের সংকলনে 'বিপ্লব ও সংস্কৃতি' (১৯১৭ খ্রীঃ), 'বুদ্ধিজীবী ও বিপ্লব' (১৯২২ খ্রীঃ)। 'পাতি বুর্জোয়া মনোভাব' (১৯২৯ খ্রীঃ), 'নিজের লেখার কথা', আর অন্তত লেখক সম্মেলনের প্রবন্ধ 'সোভিয়েত সাহিত্য' (১৯৩৬ খ্রীঃ)—এ সবের নাম না করলেই নয়—পরিচয়ও গ্রহণ করা উচিত।

জীবনদৃষ্টি ঃ গর্কির গল্প, উপন্যাস, নাটক সকলের শিকড় কঠিন বাস্তবে, জীবন থেকেই তা গর্কি গ্রহণ করেছেন, গ্রহণ করতে পেরেছেন বলেই সে বাস্তব তাঁর অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছে। রুশিয়ার মাঠ-ঘাট নদী-বন গ্রাম-শহর, তার সাধারণ মানুষ ও লক্ষ্মীছাড়া ঘরছাড়া মানুষদের আর কোনো রুশ সাহিত্যিক যদি দেখে থাকেন তবে তিনি লেস্‌কভ্—গর্কি তাঁর প্রচুর প্রশংসা করতেন। গর্কির দিনে গর্কিও রুশিয়াকে দেখেছেন সাদা চোখে, কোনো মোহ মনে না রেখে। তাই তিনি মোটেই গ্রাম্য জীবনকে স্বপ্নের রঙ মাখিয়ে দেখেন নি, রুশিয়ার তখনকার সে জীবন তো গুয়োরের নোংরা বাথান। তা দিয়ে গর্কি আত্মছলনা করতে চাননি তাঁর দিনের বুদ্ধিজীবীদের

মতো। বুদ্ধিজীবীদেরও তিনি দেখেছেন মোহহীন চোখে—বাস্তববোধে তারা প্রায়ই হয় অক্ষম নয় অনিচ্ছুক, কর্মশক্তিতে পঙ্গু, হয় কল্পনায় নয় তুচ্ছ লোভ-ঈর্ষায় আচ্ছন্ন—তারাও তাই 'অবান্তর মানুষ'। পুরনো ব্যবসায়ীদের তিনি দেখেছেন আরও কঠিন দৃষ্টিতে—কুসংস্কারে তারা বাঁধা, না আছে বাঁচবার শক্তি না কোনো মর্যাদাবোধ, শক্তের ভক্ত নরমের যম। তার তুলনায় বরং নতুন ব্যবসায়ীরাও গ্রাহ্য—স্বার্থপর, দুর্দান্ত, মদে-মেয়েমানুষে কোনো সংকোচ নেই, কিন্তু শক্তিমান সবল সাহসে বাস্তবকে গ্রহণ করে। এই সবলতা, এই সাহস, এই বাস্তব-চেতনা, গর্কির মনে তাই তো মানুষের প্রার্থনীয়। গর্কি দেখেছেন রুশিয়ার জীবনে এই শক্তিরই অভাব—সেই সম্ভাবনাই নিংড়ে নিঃশেষ করে ফেলছে জারতন্ত্র, জারতন্ত্রের পরিপুষ্ট ধর্ম, আচার-নিয়ম, মিথ্যার ভার। তবু কি সম্ভাবনা একেবারে লোপ পায়? না, লোপ পায় না,—সম্ভাবনা ব্যর্থ হয়, তবু একেবারে লুপ্ত হয় না। এমন যে বাউণ্ডুলে, মাতাল, বেশ্যা, চোর, জুয়াচোর—যারা আর মানুষ নেই, তারাও একদিন মানুষ ছিল, আর তারাও আবার মানুষ হয়ে ওঠে এক-একটা মুহূর্তে—মুহূর্তেকের জন্যে তারাও মানুষ। মানুষই তাদের হতে হবে—সেই সম্ভাবনাকেই করতে হবে সম্ভব। "মানুষে বিশ্বাস হাবানো পাপ"—বিশ্বাস রাখাই কি সহজ? ইচ্ছা হয়—থুতু ফেলি তার মুখে, ইচ্ছে হয় খুন করি তাকে। ইচ্ছে হয় নিজের হতাশায় শেষে নিজেকেই চুকিয়ে দিয়ে চুকোই এই জ্বালা। কিন্তু সে ইচ্ছাতে সবলতা কোথায়, সাহস কোথায়, জীবনকে গ্রহণ করার সংকল্প কোথায়? তার সেই দুর্বলতা, সেই পঙ্গুতা, সেই বুদ্ধির আত্মপ্রতারণা। মানুষের তা পরিচয় নয়। তাই, মানুষে বিশ্বাস হারানো যায় না—বরং যত দেখি সেই যারা একদিন মানুষ ছিল তাদের, ততই বুঝি মানুষ অমানুষ হয়ে যায় না। ততই বুঝি মানুষ মানুষই। "মানুষ—কী মহৎ ব্যঞ্জনা এই শব্দটাতে।"—গর্কির বুক থেকে তার জীবনবোধ চীৎকার করে জানায়।

রুশিয়ার মানুষও তো তাই—তার থেকেই এ সত্য গর্কির উপলব্ধিগত। অথচ সে যে মানুষ নয়, 'একদিন মানুষ ছিল' মাত্র, তাও গর্কি তেমনি কঠিন মর্মবেদনায় চীৎকার করে না জানিয়ে ছাড়বেন না। আর শুধু জানানো নয়—তাকে মানুষ করে গড়তেও গর্কি তাঁর সমস্ত শক্তিই নিয়োজিত করবেন—লেখায়, শিক্ষায়, বক্তৃতায়, বিপ্লবী প্রয়াসে। নিজের হৃদপিণ্ড জ্বেলে গর্কিও তাঁর রুশিয়ার মানুষকে পথ দেখিয়ে যান।

মার্কস এবং সাহিত্য

জুয়েরগেন কুজঝিন্স্কি

মার্কসের সাহিত্য সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির কথা চিন্তা করলে আমরা তাঁর অপরূপ অবদানের জন্য বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই। সম্পূর্ণ নূতন ও স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে বিশ্বসাহিত্যকে তিনিই সর্বপ্রথম বিচার করেছিলেন। এই উজ্জ্বল ও নতুন চিন্তাধারার ভিত্তি হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। প্রথম যুগের গ্রীক দার্শনিকদের রচনাকাল থেকে শুরু করে হাজার হাজার বছর ধরে এই চিন্তাধারা ধীরে ধীরে দানা পাকিয়ে উঠছিল। থেলস্ এবং হেরাক্লিটাসের জীবনকাল থেকে এই পর্বের সূচনা আর এর বিস্তৃতি ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত, যখন তরুণ গিজো ও মিগনেৎ, থিয়ের ও থিয়েরির মতো প্রতিভাবান ফরাসী ঐতিহাসিকেরা আবির্ভূত হয়ে শ্রেণীসংগ্রামই যে একটি শ্রেণীর সর্বাপেক্ষা অবিস্মরণীয় হাতিয়ার সে কথা ঘোষণা করেছিলেন। মার্কস ও এঙ্গেলসই সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সঠিক সংজ্ঞা নির্ণয় করলেন এবং এর ফলস্বরূপ এতদিনের আংশিক সত্য-দৃষ্টির বদলে, বাস্তবতা সম্পর্কিত ভাসা ভাসা ধারণার পরিবর্তে আমরা এক সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক সত্যের জগতের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালাম। বিজ্ঞানের দিক থেকেও তাঁদের অবদান এই কারণে অসীম গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তাঁরা সর্বদাই এই আপ্ত বাক্যটি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন· আধপেটা খেয়েও মানুষ কষ্টে-স্বষ্টে বাঁচতে পারে, কিন্তু, অর্ধ-সত্য কেবল দ্রুত ধ্বংসকেই ডেকে নিয়ে আসে।

আড়াই হাজার বছর ধরে ঐতিহাসিক বিবর্তনের পদ্ধতি চলল, এবং মানব-সমাজ ক্রমশ বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির স্তর পার হয়ে সামাজিক বাস্তবতাকে সামগ্রিক ভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার করতে শিখল। সামাজিক বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার আরও একটি উপায় আছে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে সেই উপায়ের পার্থক্যও রয়েছে। তা হল বাস্তবতার শিল্পগত উপলব্ধি। এই পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক দ্রুত উন্নতি করেছে।

প্লেটো অথবা এ্যারিস্টটল কিংবা হেরোডোটাস অথবা থুকিদিদিস অপেক্ষা এস্কাইলাস, সোফোক্লিস এবং ইউরিপিদিসের সাহিত্যে সামাজিক সমস্যাগুলি কতখানি গভীর এবং পরিণতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? বেকনের মতো চিন্তাশীল ব্যক্তির রচনা অপেক্ষা শেকস্‌পীয়রের রচনায় সামাজিক চেতনা কতখানি গভীরতর? এবং সার্ভেন্তিস সম্পর্কেও কি একই কথা বলা চলে? মাঝারি ধরনের সমাজ-বিজ্ঞানী হিসেবে স্পেনে আমরা কার নাম করব? গ্যেটের পরে একজন বস্তুবাদী জার্মান সমাজ-বিজ্ঞানীর নাম করতে গিয়েও আমরা একই জাতীয় অসুবিধের সম্মুখীন হই। অবশ্য যদি আমরা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উপর ভিত্তি করে চিন্তা করি, তাহলে অবশ্যই গ্যেটের সমানধর্মী হিসেবে মহান হেগেলের নাম করা চলে। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর যুগে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দেখি বৈজ্ঞানিক বাস্তবতাবোধ ক্রমশই শিল্পচেতনাকে যথার্থ ও গভীর করে তুলছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে, এখনও আমরা বাস্তবতা সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগত ধারণার পার্থক্য সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্ব উপস্থাপিত করতে পারিনি। অবশ্য, এদের পার্থক্য বুঝতেও আমাদের তেমন কোন অসুবিধে নেই।

সরাসরি সমস্যাটার বিচার না করে এটাকে মোটামুটি বোঝবার জন্য মোজার্টের উদাহরণ নেওয়া যাক। মোজার্ট তাঁর চিঠিতে এবং সঙ্গীতে সমসাময়িক পরিবেশ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, অনেকের মতে তা হল সেই যুগের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। দুটো ধারণার গভীরতার মধ্যে কি বিপুল পার্থক্য। বিস্তৃত আলোচনার জন্য বলজাককে নির্দিষ্ট উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক। এঙ্গেলস বলজাকের লেখা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে, তাঁর লেখা হচ্ছে "ফরাসী সমাজের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, যার থেকে আমি বিস্তৃত অর্থনৈতিক জ্ঞান অর্জন করেছি (উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ফরাসী

বিপ্লবের পর ব্যক্তিগত এবং যৌথ সম্পত্তিগুলি নতুন করে কি ভাবে বণ্টন করা হয়েছে তা এর মাধ্যমেই জানতে পেরেছি) এই জ্ঞান পেশাদারী ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ এবং পরিসংখ্যানবিদদের সমগ্র রচনা পাঠ করেও অর্জন করা সম্ভব ছিল না।"

বলজাক তাঁর রচনায় সমাজের এমন একটি জীবন্ত ও বাস্তব চিত্র উপস্থিত করেছিলেন যে তাঁর সাহায্যে বিজ্ঞানী এঙ্গেলস অনেক কিছু শিখেছিলেন—সে যুগের তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের অপেক্ষা এঙ্গেলস এর থেকে শিখেছিলেন অনেক বেশি—সমাজের বিবর্তন সম্পর্কে ব্যাপক এবং খুঁটিনাটি ধারণা তাঁর ক্রমশই জন্মাচ্ছিল।

তাহলে কি বলজাক একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষক হওয়ার জন্য একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হিসেবেও বিবেচিত হবেন না? "নিঃসন্দেহে হবেন না"—এই হচ্ছে এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর। স্বয়ং এঙ্গেলসও এই মত পোষণ করতেন। তিনি উপরোক্ত মন্তব্যের পরই বলেছিলেন, "এটা নিশ্চিত যে বলজাক রাজনীতির ক্ষেত্রে ঐতিহ্যানুরাগী। তাঁর মহৎ রচনার মধ্যে ধ্বংসোন্মুখ প্রাচীন সমাজের জন্য স্থায়ীভাবে শোক প্রকাশ করা হয়েছে। যে শ্রেণীর ধ্বংস অনিবার্য, তাঁর সমস্ত সহানুভূতি সেই দিকে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, যে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর সর্বাপেক্ষা বেশি সহানুভূতি ছিল—তাদের চরিত্র চিত্রণের সময়ই তাঁর ব্যঙ্গ এবং শ্লেষ তীক্ষ্ণ ও তিক্ততর হয়ে উঠত। আর, ক্লয়ত্রে সেণ্ট মেরির গণতন্ত্রী বীরবৃন্দের (যাঁরা ১৮৩০ থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি ছিলেন), বলজাক ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, তাঁদের মহৎ চরিত্রে পরিণত করেছেন। যদিও রাজনীতির দিক থেকে এঁরা ছিলেন বলজাকের তীব্রতম প্রতিপক্ষ।"

যদি আমরা বলজাকের সাহিত্যের কথা ভুলে যাই এবং কেবল তাঁর সামাজিক অবস্থা ও ব্যক্তিগত বুদ্ধিমত্তার বিচার করি, তাহলে তাঁকে অবশ্যই একজন প্রতিক্রিয়াশীল, সামন্ততান্ত্রিক উপাধি ও ধনতান্ত্রিক সম্পদের প্রতি লালায়িত লেখক হিসেবেই মনে হবে। কিভাবে এরকম একজন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী, সাধারণ বুদ্ধিবিশিষ্ট স্বেচ্ছাচারী মানুষ, মার্কস ও এঙ্গেলস-এর মতো মহৎ প্রতিভাদ্বয়কে বাস্তবতা সম্পর্কে ব্যাপক ও বিস্তৃত শিক্ষা দিতে

পারেন? কিভাবেই বা একজন গতানুগতিক চিন্তাশক্তির অধিকারী এঙ্গেলস-এর মতো মহৎ চিন্তাশীলকে এই জাতীয় মন্তব্য প্রকাশে বাধ্য করতে পারেন? "তাছাড়া, বলজাক ছাড়া অন্য যে কারোর লেখাই আমি পড়ি না কেন, আমি মনে মনে ঐ চমৎকার বৃদ্ধটির প্রতিই দুর্বল হয়ে পড়ি। তাঁর রচনার ভিতর ভলাবেল, কাপোফিগ্যু, লুইব্ল্যাঁ এবং তুত্তি কোযান্তির সমস্ত বই অপেক্ষা ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ পর্যন্ত ফরাসীদেশের ইতিহাস উজ্জ্বলতর ভাবে প্রকাশিত। কি প্রচণ্ড সাহসিকতা। শিল্পকলার মধ্যে কি অপূর্ব বৈপ্লবিক দ্বন্দ্ব।" (লরা লাফার্গের কাছে ১৮৮৩ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে লেখা চিঠি)

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মার্গারেট হার্কনেসকে লেখা এক চিঠিতে এঙ্গেলস নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, "বলজাক তাঁর শ্রেণী-সহানুভূতি ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তিনি তাঁর প্রিয় অভিজাত সম্প্রদায়ের অবলুপ্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন ও তারা যে ভালো ব্যবহারের যোগ্য পাত্র নয় একথা ঘোষণা করেছিলেন এবং সেই পরিবেশে ভবিষ্যতের প্রকৃত মানুষদের তিনি চিনতে পেরেছিলেন—আমার কাছে এই হচ্ছে বস্তুবাদের বৃহত্তম জয়লাভ এবং বৃদ্ধ বলজাকের চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য।"

সুতরাং বলজাক তাঁর সীমাবদ্ধ বোধশক্তির মধ্যেও বাস্তবতার শিল্পগত রূপায়ণে সার্থক হয়েছিলেন। বলজাক সম্বন্ধে এঙ্গেলস অন্তত দুবার বলেছেন: "তিনি দেখেছিলেন", তিনি তাঁর প্রিয় অভিজাতদের পতন মেনে নিতে পারেন নি, কিন্তু তিনি তা "দেখেছিলেন"। তিনি ভবিষ্যতের মানুষদের স্বরূপ জানতেন না, কিন্তু, তিনি তাদের ঠিক "লক্ষ্য করেছিলেন"। তিনি কেবল উপলব্ধির দ্বারা কাজ করেন নি বা চালিত হন নি, তিনি শিল্পীর দৃষ্টির দ্বারা চালিত হয়েছিলেন—তিনি "দেখেছিলেন"।

স্বাভাবিকভাবেই "দেখা" শব্দটির দ্বারা বুদ্ধি, অনুভূতি ও কার্যকলাপ—ইত্যাদি মানসিক ও অনুভূতিগত পদ্ধতিসমূহই বোঝায়। এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই। সুতরাং, কবিদের অপরূপ শিল্পপ্রতিভা সম্পর্কে যে জনপ্রিয় প্রচলিত ধারণা রয়েছে—যে তাঁরা পার্থিব ব্যাপারে অনভিজ্ঞ এবং বিমূঢ়—সেই ধারণার সঙ্গে বিজ্ঞান এবং বোধশক্তির কোনো সম্পর্ক নেই।

তার মানে এই নয় যে কবিদের প্রচণ্ড বুদ্ধি থাকতে পাবে না বা তাঁবা স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ হতে পাবেন না। গ্যেটে, হাইনে অথবা ব্রেখ্‌ট—এঁরাই তাব প্রকৃষ্ট উদাহবণ।

কিন্তু, এঁদেরও শিল্পগত প্রতিভা বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে আচ্ছন্ন কবে ফেলেছে। সেইজন্যই এঁদেব আমবা কেবল 'শিল্পী' বলে থাকি। কিন্তু, তাহলে, যে মার্কসেব লেখায অপরূপ শিল্পনৈপুণ্যেব উদাহবণ পাওয়া যায, ভাষাব অপূর্ব কারুকার্য লক্ষ্য কবা যায, তাঁকে শিল্পী না বলে বৈজ্ঞানিক বলা হয কেন?

প্রায, ত্রিশ বছব আগে আমি সমসামযিক কালেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত গিলবার্ট মাবেব সঙ্গে কথা বলেছিলাম। আমাব এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিল জার্মান দেশত্যাগীদেব ফ্যাসী-বিবোধী সংগ্রামকে আর্থিক সাহায্যেব জন্য তাঁকে অনুবোধ জানানো। কিছুক্ষণেব মধ্যে আমবা ইউবিপিদিস সম্পর্কে আলোচনা আবম্ভ কবলাম। আলোচনাব শেষে ইংলণ্ডেব এই প্রখ্যাত উদাবনীতিবিদ বললেন—"তোমবা মার্কসবাদীবা গ্রীক-ট্র্যাজেডিব ভিতব বড্ড বেশি মানে খুঁজে বেড়াও। ইস্কাইলাস, সোফোক্লিস, ইউবিপিদিস তাঁদেব পবিবেশ সম্পর্কে এত বেশি জানতেন না।"

সেই সমযে আমি ভেবেছিলাম মাবে ঠিকই বলেছেন। বর্তমানে, ব্যাপাবটা আমি এইভাবে দেখি। আমি যেবকমভাবে বুঝেছিলাম, মহান গ্রীক নাট্যকাববা তাঁদেব পবিবেশ সম্পর্কে সেভাবে অভিজ্ঞ ছিলেন না—মাবে এই পর্যন্ত ঠিকই বলেছিলেন। কিন্তু, মার্কসবাদী হিসেবে তাঁদেব গ্রন্থেব ভিতব থেকে লেখকদেব অজ্ঞাত অর্থ খুঁজে বাব কবা আমাব দাযিত্ব। কাবণ সেই সমযেই তাঁদেব গ্রন্থে আমি যা পেযেছিলাম, আজকেও যা পডছি—তাব দ্বাবা এই সিদ্ধান্তেই পৌছনো সম্ভবপব যে ঐ সমস্ত লেখকবা "দেখেছিলেন" এবং ফলে শিল্পগত বাস্তবতাব মহৎ পবিণতি তাঁদেব বচনায প্রতিধ্বনিত হযেছে।

সুতবাং ব্যাপাবটা এইভাবে বলা যায—আমবা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য কবেছি যে পৃথিবী সম্পর্কে শিল্পগত ধাবণা বৈজ্ঞানিক ধারণাব থেকে অনেক অগ্রবর্তী। ইতিহাসেব দিকে পিছন ফিবে যতই তাকাই, ততই দেখা যাবে যে বৈজ্ঞানিক ধাবণাব উপব শিল্পগত দৃষ্টিভঙ্গির জযলাভই

বাব বাব ঘোষিত হযেছে। গ্রীকদেব শিল্পগত যোগ্যতাব সঙ্গে বিজ্ঞান-ভিত্তিক সামাজিক বাস্তবতাবোধেব পার্থক্যেব কথা অনেকেই বলে থাকেন। আব এই পার্থক্য কি বিপুল। বলজাক এবং রিকার্ডোব মধ্যেকাব পার্থক্যও এব চেযে বেশি নয়।

মার্কসের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ধাবণা এবং শিল্পগত বোধেব সমন্বয ঘটেছে। অনেকেব মতে বিজ্ঞান নিযে মাতামাতি কবলে শিল্পেব মান ক্ষুণ্ণ হয। এভাবে তুলনা কবাটা ঠিক কিনা তাও বীতিমতো সন্দেহেব বিষয। কাবণ শেষপর্যন্ত প্রশ্নটা হল বাস্তবতাকে উপলব্ধি কবাব অসমপদ্ধতিগুলো বিচাব করা। প্রতি ক্ষেত্রেই বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলে। উদাহবণ দিযে বলা যায যে শলোকভেব 'ডন' সিবিজে সোভিযেত বাশিযাব বিপ্লবকালীন গৃহযুদ্ধেব যে বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে, কোনো বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপেব মধ্যেই তা এবকম গভীব ও ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয নি।

এটাও এখন পর্যন্ত স্থির হয নি বাস্তবতা সম্পর্কিত এই দুটি ধাবণাব মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ—এবং বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ পর্যন্ত কোনটি টি঳কবে। সুতবাং, দুটিকে বা কোনো একটিকে এখনো বাদ দেওযা সম্ভব নয। আমাদেব কাছে দুটিই প্রযোজনীয, দুটিবই সামাজিক প্রযোজনীযতা বযেছে।

এই দুটি ভাবধাবাই পবস্পবেব সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হযে ক্রমশই উন্নত হযে উঠতে পাবে। বলজাক সম্পর্কিত আলোচনায মার্কস এবং এঙ্গেলস কতবাবই না বলেছেন, "হ্যাঁ, তাহলে এটাই এই। অথবা এতক্ষণে এই ঘটনা আমার কাছে পরিষ্কাব হল।" এটাও ঠিক যে ব্রেখ্‌টও মার্কস ও এঙ্গেলসেব কাছ থেকে চবিত্রগুলিকে যথাযথভাবে উপস্থাপিত কবাব ব্যাপাবে উপদেশ চেযেছিলেন। অর্থাৎ কবি-সত্তাকে এইভাবে বারবাব বৈজ্ঞানিক ভিত্তিব উপব প্রতিষ্ঠিত কবা হযেছিল।

অনুবাদ : বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

মার্কসের চোখে ভারতীয় ইতিহাস

সুশোভন সরকার

ভাবতবর্ষ সম্বন্ধে মার্কসেব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতস্তত আলোচনা ও সমালোচনা সহ প্রাযই যথেষ্ট মতামত প্রকাশ কবা হযে থাকে। তথাপি ভাবতীয ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁব ধাবণাব মূল্যাযন, তাঁব লিপিবদ্ধকৃত উক্তিগুলিকে ভিত্তি কবে একটা সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক সন্ধান প্রায চোখেই পড়ে না। মার্কসবাদেব প্রতিষ্ঠাতাব ১৫০তম জন্মোৎসবে এমন একটি ব্যাখ্যা-মূলক বচনা আমাদেব কৃত্য হিসাবে তাঁব স্মৃতিতর্পণেব অঙ্গরূপে গণ্য হবে। বর্তমান প্রবন্ধ সেই লক্ষ্যে এমনি এক প্রচেষ্টা মাত্র।

ভাবত ইতিহাস সম্বন্ধে মার্কস কোনো ধাবাবাহিক বচনা বেখে যান নি, তা তাঁব মৌল সর্বাগ্রগণ্য কাজও ছিল না। জনসাধাবণেব দৃষ্টি-আকর্ষণকাবী সমসামযিক কতকগুলো ভারতীয সমস্যার পর্যবেক্ষণ তিনি লিপিবদ্ধ করে বাখেন অথবা তাঁব সাধাবণ যুক্তিব সপক্ষে উদাহবণ দিতে ভাবতেব অতীত ও বর্তমানেব অবস্থা থেকে তিনি উপাদান সংগ্রহ কবেছিলেন। কোনো গোঁডামিতেই সুতবাং বিষয সম্বন্ধে এইসব তাৎক্ষণিক ধাবণাকে পরিপূর্ণ মতামত বলে ধবে নেয়া চলে না। কিন্তু কোনো অসাধাবণ মনীষীব খাপছাডা মন্তব্যও সেগুলিব গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও পবিণত বোধেব জন্য সাবধানী বিবেচনা দাবি করে। দাযিত্ববান গবেষক, বিশেষ কবে সৎ মার্কসীয পণ্ডিতদেব, বর্তমানে লভ্য অপেক্ষাকৃত পূর্ণতব জ্ঞান নিয়ে বিষযের গভীরে প্রবেশ কবা প্রযোজন; মার্কসেব সম্ভাব্য সিদ্ধান্তগুলিব প্রতিষ্ঠা বা বিশ্লেষণ কবা দবকাব, প্রযোজন বোধে এমনকি সংশোধনেরও দবকাব হতে পারে।

গভীর মূল্যের দিক থেকে মার্কসের মতামত পথ-প্রদর্শক হতে পারে, যেগুলোকে স্পষ্ট করা প্রযোজন—এক শ্রেষ্ঠ মনীষীর কল্পনা থেকে উদ্ভূত অনুমানগুলি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে অনুসরণ করা যেতে পারে। এ-সবের জন্যে সর্বাগ্রে দরকার, মার্কস সত্যিই কী বলেছিলেন সে বিষয়ে একটা পরিষ্কার জ্ঞান। এ-কালে তা সবচেয়ে বেশি দরকার, কেননা লোকে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় পড়াশোনা না-করে বা বিতর্কে অংশ নেয় অপ্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি লাগিয়ে।

ভারত-ইতিহাস সম্বন্ধে মার্কসের মতামতকে সহজেই পাঁচভাগে ভাগ করা যায়: প্রাচীন ভারতীয় সমাজের প্রকৃতি, ভারত ইতিহাসের সাধারণ কাঠামো ও কাল-পরম্পরা, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভূমিকা, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের প্রকৃতি এবং ভারতে বৃটিশ শাসনের ফলাফল।

দুই

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুনের ভারত-বিষয়ে এক চিঠিতে মার্কস লিখেছিলেন যে ভারত ইতিহাসের প্রথম দিকের ঘন ঘন আলোড়ন "তার গাত্রাবরণ ভেদ করতে পারে নি।" সমস্ত দোলাচলের তলে ছিল "কিছু বিশেষ লক্ষণযুক্ত এক সমাজ-অবস্থা—তথাকথিত গ্রাম্য ব্যবস্থায়।" প্রমাণ হিসাবে তিনি ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী 'কমনস রিপোর্ট-এর' প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করেন এবং জি. ক্যামবেলের 'আধুনিক ভারত' (১৮৫২ খ্রীঃ) থেকে উদ্ধৃতি দেন। তিনি বলেন "এশিয়ায় অবিস্মরণীয় কাল থেকে সরকারের সাধারণত তিনটি বিভাগ বর্তমান ছিল: কোষাগার বা রাজস্ব অর্থাৎ অভ্যন্তর লুণ্ঠন বিভাগ, যুদ্ধ অর্থাৎ বহির্দেশ লুণ্ঠন বিভাগ এবং পরিশেষে পূর্ত বা পাবলিক ওয়ার্কসের বিভাগ"। শেষেরটি 'আবহাওয়া ও ভৌগোলিক অবস্থার' জন্য প্রয়োজনীয় ছিল এবং তা 'কৃত্রিম জলসেচ-ব্যবস্থা'কে জরুরি করে তুলেছিল। নিচু মানের সভ্যতা ও প্রাচ্যের বিশাল ভূখণ্ড "জলের সামবায়িক ও মাপা" খরচে বাধ্য করেছিল, "কেন্দ্রীভূত সরকারী ক্ষমতার হস্তক্ষেপ" মাঝে মাঝে কাজে ব্যর্থ হলেও, তাকেই বারে বারে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে হত। বৃটিশ যুগ পর্যন্ত চলে আসে ঐ প্রাচীন সমাজ-কাঠামো—সেই সব 'ইউনিট' বা গ্রাম-সমবায়গুলি, যেগুলি নির্ভরশীল ছিল "গৃহ-শিল্পের উপর—হস্তচালিত তাঁত,

সুতাকাটা ও কৃষির সেই অদ্ভুত সমাবেশ যা তাদের আত্মনির্ভরতার শক্তি জুগিয়েছিল।" বৃটিশ এই ভারতীয় সমাজেরই অবসান ঘটায়।

এই সাদাসিধে সসম্ভ্রম সমাজ সম্বন্ধে মার্কসের মনে কোনো দুর্বলতা ছিল না। "এই সব শান্ত সবল গ্রামগোষ্ঠী যতই নিরীহ মনে হোক, প্রাচ্য স্বৈরাচারের তারাই ভিত্তি হয়ে এসেছে, চিরকাল তারাই যথাসম্ভব ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে মানবমনকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে বানিয়েছে কুসংস্কারের অবাধ ক্রীড়নক, তাকে করেছে চিরাচরিত নিয়মের ক্রীতদাস।" ফলশ্রুতি হিসাবে একে তাঁর মনে হয় "অসম্মানজনক, অচল, উদ্ভিদ প্রতিম জীবন—যা জাতিভেদ ও দাসত্বের দ্বারা বিষাক্ত।" "হিন্দুস্তানের স্বর্ণযুগের কথা যাঁরা বলেন আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই।"

পরিবর্তনহীন প্রাচীন ভারতের অর্থনীতি ব্যবস্থার এই আলোচনা অপ্রয়োজনীয়ভাবে সরলীকরণ বলে সমালোচিত হয়েছে। কিন্তু কোনো ঐতিহাসিক সাধারণীকরণে, উদাহরণত ইওরোপীয় ইতিহাসেও, পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ সর্বদাই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ উন্মুক্ত করে—যেগুলো দূর বিস্তারী দৃষ্টির নিকট অবহেলিত। প্রধান দ্রষ্টব্য হল, এই সাধারণীকরণ মূলত ভুল কিনা, যদি তা ভুল হয় তাহলে দেখতে হবে তার বদলে কোন্ সাধারণ সূত্র অপেক্ষাকৃত ভালো। নাগরিক জীবনের কেবলমাত্র উপস্থিতি বা কৃষিজ সমাজের ঘনবদ্ধ জীবনের সামান্য অবকাশরূপে বেশ কিছুটা বাণিজ্য প্রাচীন ভারতের গ্রাম-সমাজের কৃষিকার্যের প্রভাবগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করার পক্ষে যথেষ্ট নয়—যে-চিত্র মার্কসের কল্পনার চেয়েও বেশি জটিল এবং স্বল্পস্থায়ী। মার্কসের একশো বছর পরেও প্রাচীন ভারতের সম্ভাব্য সমাজ-বিবর্তনের বাস্তব সময়-বিভাগ পূর্ণতর আলোকে এখনো করা হয় নি।

বোঝাই যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় সমাজের মূল্যায়নে ভারতের মতামত খুবই বিক্ষুব্ধ হয়। তথাপি মার্কস নিজেই ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ জুলাই-এর চিঠিতে লিখেছিলেন "শান্ত মহত্ত্ব" ও "সাহস" সেই দেশের মানুষের আছে, যাকে তিনি "আমাদের ভাষা ও ধর্মের জন্মভূমি' বলে উল্লেখ করেছিলেন। মার্কসকে ন্যায় বিচার দিলে আমাদের মনে রাখতে হবে নির্বাধ সমাজ-বিপ্লবের একনিষ্ঠ প্রবক্তারূপে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কথা, স্মরণ রাখতে হবে এমন কি প্রথম দিকে 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো'তে তাঁর নিজের ইওরোপের

উদ্ধত বুর্জোয়া সভ্যতার উপর বা বারেবারে ভারতে বৃটিশ শাসনের উপর তাঁর নির্মম আক্রমণের কথা। মার্কসের প্রায় সমসাময়িক কোনো কোনো 'ভারতীয় পাশ্চাত্ত্য'দের ভিতর শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তি ঐতিহ্যাশ্রয়ী দেশীয় জীবন সম্বন্ধে অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

সবশেষে, 'এশিয়াটিক সোসাইটি' (ভারতও তার অংশ) সম্পর্কে মার্কসের যে ধারণা তা কোনক্রমেই তাঁর বুর্জোয়া সমাজের ধারনার মত প্রতিষ্ঠিত নয়। শেষ পর্যন্ত কোনো নিশ্চিত তত্ত্বে না পৌঁছেও তিনি ভারত-বিষয়ে পত্রগুচ্ছ রচনার পরে বহু বছর ধরে খোলা মন নিয়ে ব্যাপারটার মর্ম উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন। সবল লোকের এ-সব কথা মনে থাকে না। সম্প্রতি একখানা বাঙলা পত্রিকায় 'মার্কসবাদী' গবেষনা প্রবন্ধে এ-কথা পড়ে কৌতুকবোধ করেছি যে, যেহেতু মার্কস 'ঘোষণা' করেছিলেন যে ভারতে একটা এশিয়াটিক সোসাইটি রয়েছে, যা বৃটিশরা জয় করেছিল, তাই এখানে সামন্ততান্ত্রিকতা থাকতে পারে না, অতএব সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বিপ্লবও এখানে অবান্তর।

বস্তুতপক্ষে, ১৮৫৭—৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ও সম্প্রতি প্রকাশিত সাধারণত 'ফরমেন' নামে কথিত 'প্রাক-ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো সমূহ' গ্রন্থে, পরিণত মার্কস কর্তৃক যে ঐতিহাসিক রেখাচিত্র দেয়া হয়েছে, তা ইতিহাসের অন্ধ সময় বিভাগের পক্ষে মারাত্মক। এশিয়াটিক বা ওরিয়েণ্টাল (প্রাচীন ভারতীয় সহ) সমাজ প্রাক-ইতিহাসের মৌল আদিম সাম্যাবস্থা থেকে একটা সম্ভাব্য বলে মনে হয়, যা ঐতিহাসিক বিবর্তনকে বাধা দিয়েছিল (কিন্তু সম্পূর্ণ বাদ দেয় নি)। 'ফরমেন'-এ এশিয়াটিক সোসাইটিকে বিশেষভাবে ভূ-সম্পত্তি না থাকার জন্য বা ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের চিঠিতে কেন্দ্রীভূত পাবলিক ওয়ার্কস এবং সেচ-ব্যবস্থার জন্য চিহ্নিত করা হয় নি। এ-সময়ে জোর দেয়া হয়েছে, সেই কারিগরি ও কৃষির 'স্বনির্ভর ঐক্যের উপর'—যা প্রাচ্য গ্রামগুলিতে অর্থনৈতিক বিবর্তনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। সাধারণ নিয়ম হিসাবে এশীয় বর্বরতার পরিবর্তে এখন একথা স্বীকৃত হল যে কর্তৃত্ব আকারে 'বেশি অত্যাচারী বা বেশি গণতান্ত্রিক' হতে পারে। উপর থেকে চাপানো 'সর্বময় ঐক্যের' ভিতর গ্রাম সম্প্রদায়গুলি এসে থাকতে পারে যা তখন 'উচ্চতর বা একমাত্র অধিকর্তা ছিল, সত্যিকারের সম্প্রদায়গুলি কেবলমাত্র বংশানুক্রমিক ভোগদখলকারী ছিল—

অতএব প্রাচ্য-অত্যাচার মানে আইনগত ভাবেই সম্পত্তি না থাকায় এসে দাঁড়াচ্ছে।' 'সেচ-ব্যবস্থা, যোগাযোগ পদ্ধতি প্রভৃতি উচ্চতর ঐক্যের কাজ বলে প্রতীয়মান হবে।' এ-রকম সমাজে স্বভাবতই সহরের অস্তিত্ব ছিল, অবশ্য 'বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্র' বা 'রাজকীয় আস্তানা' হিসাবে।

'ক্রিটিক্ অফ্ পলিটিক্যাল্ ইকনমি'র° (১৮৫৯) মূল্যবান ভূমিকায় এ-কথারই জের টানা হয়েছে। 'সাধারণভাবে এশীয়, প্রাচীন, সামন্ততান্ত্রিক ও আধুনিক বুর্জোয়া উৎপাদন রীতিকে সমাজের অর্থনীতি সংগঠনের প্রগতিশীল যুগ বলে চিহ্নিত করা যায়', যে বোধ 'ক্যাপিটালে'ও (১৮৬৭) সঞ্চারিত। এখানে 'প্রগতি' বলতে স্বভাবতই 'ব্যাপক অর্থে' কেবল সাধারণ সামাজিক আবরণ উন্মোচন বোঝায়, প্রতি ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে সমরেখায় 'লাফ' বোঝায় না।

"এশিয়াটিক সোসাইটি"র ধারণাকে মার্কস কখনোই অস্বীকার করেন নি। যদিও পরে তিনি তাকে সমাজ-বিন্যাসের 'আর্কেইক্ টাইপ'-এ নামিয়ে আনেন। সমাজ-গঠনের পরিবর্তনধারা হিসাবে ইতিহাসকে জনগ্রাহ্যতায় প্রতিষ্ঠা করতে সরলীকরণের প্রয়োজন, তাই 'ফরমেনে'র জটিল আলোচনাকে গৌণ করা দরকার। তাই মর্গানের অনুসরণে এঙ্গেলস তাঁর 'ওরিজিনে' (১৮৮৪) প্রাক্-ইতিহাসকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন এবং এ-কাল পর্যন্ত সভ্যতাকে আলোচনা করেছেন, শোষণের তিন যুগান্তর রূপে—দাস যুগ, ভূমিদাস প্রথা ও মজুরী-শ্রম। মাত্র তিন শ্রেণীর সমাজের ধারণা ১৮৪৮-র 'ইস্তাহার' এবং ১৮৪৫—৪৬-র 'জার্মান আইডোলজি'র সরলতায় প্রত্যাবর্তন। কিন্তু সৎ ছাত্রের ভুলে গেলে চলবে না '১৮৫৭—৫৮ সালের ফরমেনে'র জটিল বিশ্লেষণ বা ১৮৫৯ সালের 'ক্রিটিকে'র 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র মডেল যা ঐতিহাসিক বিবর্তনের সামগ্রিক চেহারা প্রদর্শন করেছিল।

ঘটনার ফলশ্রুতি এই যে, মার্কস 'এসিয়াটিক সোসাইটি'র ভক্ত ছিলেন না তবে তার তত্ত্ব আরও গবেষণাসাপেক্ষ করে রেখে গেলেন। আজ গবেষকগণ পূর্ণতর জ্ঞান নিয়ে, তার বিস্তার, প্রকৃতি ও কালসীমার সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে পারেন। তাঁরা এর সঙ্গে জড়িত, কোন দাস উৎপাদন-ব্যবস্থা যদি ভারতে থাকে, বা ভারতীয় সামন্তবাদের উত্থান বা ঐ ধরণের প্রশ্ন বা আরো অনেক কিছু নিয়ে কাজ করতে পারেন। মার্কসের ধারণা এই অর্থে

অত্যন্ত মূল্যবান যে প্রাচ্যের বিশেষ অবস্থার প্রতি তা দৃষ্টিবদ্ধ করে এবং কিছুটা হেগেলীয় ধাঁচের সমগ্র বিশ্বের সমবৈখিক ঐতিহাসিক বিবর্তনের সরল তত্ত্বকে একেবারে ভেঙে দেয়।

ইতিহাসে বিশেষ সমাজ গঠন চিহ্নিতকরণের অনিশ্চয়তা 'ক্রিটিকে'র ভূমিকায় বাহুল্য বর্জিত ভাবে যা লেখা আছে, মার্কস তা থেকে কখনো বিচ্যুত হন নি: ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল তত্ত্বকে নাকচ করে দেয় না, ব্যক্তিগত ইচ্ছা-মুক্ত অপরিহার্য উৎপাদন-সম্পর্ক, উৎপাদন শক্তি-সমূহের বিশেষ কতকগুলো ঐতিহাসিক স্তরের বিকাশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, একটা বিশেষ সময়ে নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক গঠনযুক্ত উৎপাদন শক্তি ও সম্পর্ক সহ সমাজের অস্তিত্ব, সে সময়ের আদর্শগত উন্নত স্তরের তার উপর নির্ভরতা, যা এখন 'শৃঙ্খলে' পরিণত হয়েছে সেই অচল উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে গতিশীল উৎপাদন শক্তির বিকাশের কালে সুনিশ্চিত সংঘাত, এর ফলে অল্প-বিস্তর দ্রুত সমাজ-পরিবর্তনের সমাজ-বিপ্লবের যুগ। মার্কসের এই ক্রান্ত-দৃষ্টি, সমাজ-বিজ্ঞানে পথ-নির্ণয়ী আলোর মতো আজো পর্যন্ত অব্যর্থ উদ্দীপন-শক্তি হয়ে আছে।

তিন

মার্কস নিজের কাজের জন্য ভারত-ইতিহাসের উপর অনেকগুলো কালানুক্রমিক 'নোট' তৈরী করেছিলেন, যেগুলোকে তিনি কখনো সংশোধন বা প্রকাশ করেন নি। এই 'নোট' তাঁর ঐতিহাসিক বিবেকের সাক্ষ্য দেয়, কেননা কালানুক্রমিকতাইতো হল ইতিহাসের লৌহ কাঠামো। তাঁর 'নোটে' সমসাময়িক প্রতিষ্ঠিত দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি 'এলফিনস্টোন' ও 'সিওয়েলে'র বর্ণনার উপর তিনি প্রচুর নির্ভর করেছিলেন।

এখানে সবচেয়ে সাংঘাতিক হল আমাদের ইতিহাসের সমগ্র হিন্দু যুগকে বাদ দিয়ে যাওয়া, যদিও মার্কসের সময়কার ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সে আলোচনা করেছেন। স্পষ্টত তাঁকে প্রাক্-যুগের সন্তোষজনক আলোচনার প্রতিবন্ধক হিসাবে একটা নিশ্চিত কালানুক্রমিক কাঠামোর অভাব বোধ করতে হয়েছে, যাকে তিনি নিখাদভাবে সমাজ-রাজনীতি বিকাশের মৌলভূমি হিসাবে চেয়েছিলেন। এল্‌ফিনস্টোনের প্রামাণিক ইতিহাসে হিন্দু-ইতিহাস সম্বন্ধে অল্প কথাই আছে।

মার্কস প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের একটা তর্কাতীত তারিখ উল্লেখ

কবেছেন, খৃষ্ট জন্মের ৩২৭ বছব আগে আলেকজাণ্ডাব কর্তৃক ভাবত-আক্রমণেব সময। এ-কথাও বলা যায যে ভাবতে প্রাক-মুসলমান অন্যান্য আক্রমণ বিষযে এল্‌ফিন্‌স্টোন্‌ও বিশেষ কিছু জানতেন না।

'নোট্‌' ও অন্যান্য স্থান থেকে নিযে প্রাচীন ভাবতেব সমাজ-জীবন সম্বন্ধে দু'এক কথা বলা যেতে পাবে।

পুবোহিতকুল ভাবতে 'সবচেযে শক্তিশালী রাজনৈতিক শ্রেণী' ছিল। হিন্দুস্থান 'ইতালি ও আযর্লাণ্ডেব মতো বিলাস ও দুঃখেব এক অদ্ভুত সংমিশ্রন' যেখানে ইন্দ্রিয-চেতনা ও আত্মপীডনেব ধর্ম প্রাচীন ঐতিহ্যানুসাবী।

মুসলমান-যুগেব কালৌচিত্য নিশ্চিত ও তর্কাতীত, মার্কসেব 'নোট' আদি মুসলমান অভিযান থেকে আমাদেব নিযে যায উত্থান-পতনময সাম্রাজ্যেব বিজয কাহিনীব ভিতব দিযে মাঝে মাঝে মুসলমান আইন, জমি-ব্যবস্থা ও সামন্ততান্ত্রিক আযোজন সম্বন্ধে মন্তব্য কবতে কবতে। 'নোটে'ব বৃহদংশ বৃটিশ বিজয, বিস্তাব এবং শোষণ নিযে, যা ছিল মার্কসেব মূল অনুসন্ধানেব বিষয।

বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত হলেও মার্কসেব বহু মন্তব্য সত্যিই মর্মভেদী। অন্ধকূপ হল 'ইংবেজ ভণ্ড'দেব তৈবী একটা 'মিথ্যা কেলেঙ্কাবী।' মুনবো পাটনার বিদ্রোহীদেব 'করুণাঘন অভিযানে'ব তোপেব মুখে উডিযে দিলেন।' কোম্পানীব চাকববা সম্পদ জমিযেছিল 'লজ্জাজনক অত্যাচাব ও অপহবণেব ব্যবস্থা অনুসারে।' চিবস্থাযী বন্দোবস্তে বাযতবা 'একেবাবে জমিদাবেব দযাব উপব টিঁকে ছিল'। বাযতওযাবি ব্যবস্থা আসলে 'প্রত্যেক জেলাব উপব কালেক্টাবেব সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব'। ওযেলেস্‌লির 'ফোর্ট উইলিযম কলেজ' 'আইন ও ধর্মবিষযে দেশীয লোকের আলোচনা-গৃহ'। অন্যান্য উল্লেখ কবা বিষযেব ভিতব চোযাব, তীতু মীর, এবং সাঁওতাল 'গেবিলা'দের জনপ্রিয বিদ্রোহেব কথা আছে। 'সতী' প্রথা অবলুপ্তিব মতো মঙ্গল জনক কাজ, প্রথম মেডিক্যাল কলেজ, সংবাদপত্রেব স্বাধীনতা দান, সেচখাল ব্যবস্থা, রেলওযে, ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ এবং ইউবোপ পর্যন্ত সবাসবি জাহাজ চলাচল ব্যবস্থাব মত উল্লেখযোগ্য পবিবর্তন তিনি উল্লেখ কবেছেন।

চার

বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিযা কোম্পানিব ভূমিকা সম্বন্ধে মার্কসেব দৃষ্টিভঙ্গি গভীব ঐতিহাসিক তত্ত্বদৃষ্টিব কাবণে সবিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি মূলত

কোম্পানির রাজত্বের ইতিহাস, তার সাধারণ চেহারা, ভারতের জনসাধারণকে দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে শোষণ এবং ভারত থেকে মুনাফা আহরণ ব্যাখ্যা করেছেন।

তিনি ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুনের একখানা চিঠিতে কোম্পানির ইতিহাসের সারমর্ম বলেছিলেন। ঐতিহাসিক কোম্পানি প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছিল ১৭০২ খৃষ্টাব্দে, প্রথম স্তরের রাজকীয় মঞ্জুরীর বদলে পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রতিযোগী কোম্পানিগুলি এক হয়ে গিয়ে একচেটিয়া ব্যবসার অনুমোদন লাভ করে। পার্লামেণ্ট জনসাধারণকে যেমন ভোটদানে বঞ্চিত করেছিল তেমনি কোম্পানি, অসুবিধাভোগী জনসাধারণকেও ভারতের বাণিজ্য থেকে বাদ দিয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের উপর জয়ের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখাও শুরু হয়েছিল। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ, ব্যবসায়ী আঞ্চলিক সংস্থাগুলোকে সামরিক-শক্তি সংগঠনে রূপান্তরিত করেছিল। স্বভাবতই ইংরেজ-মন্ত্রী ও শাসকশ্রেণী এখন লাভের বেশি অংশ দাবি করল। মিল যেমন দেখিয়েছিলেন 'পীটের ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট', সোজা পথে না গিয়ে জালিয়াতি করে মন্ত্রীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল প্রত্যক্ষ পার্লামেণ্টীয় কমিশনারদের বদলে 'রাজকীয়' ক্ষমতার সহায়তায়। শতাব্দীর বিজয়-সংগ্রামের পরে ইঙ্গ-ভারতীয় সাম্রাজ্য দৃঢ়-ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হল ১৮৪৯ সাল নাগাদ।

অর্থনৈতিকভাবে কোম্পানি ভারতে মূল্যবান 'বুলিয়ন' রপ্তানীর প্রয়োজনে শুরু হয়েছিল, যাকে 'মান্' (১৬২১) সমর্থন করেছিলেন এই ভিত্তিতে যে, এর ফলে ভারতীয়গণ কর্তৃক আমদানি আরো বেশি 'বুলিয়ন' পুনর্রপ্তানির ব্যবস্থা করে চূড়ান্ত দেয়-র ভারসাম্যকে উৎসাহজনক করবে। কালে, বৃটিশ উৎপাদকগণ, ভারত থেকে আমদানির হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য চাপ দেয়, যা পোলেক্সফেনের (১৬৭৯) আলোচনা থেকে বোঝা যাবে। ১৭০০ খৃষ্টাব্দের পরে 'স্টেটুট্' তাই ইংলণ্ডে সিল্ক ও কেলিকো আমদানি কমিয়ে আনে। উনবিংশ শতকের প্রথম থেকে কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসা, প্রস্তুতকারকদের সুবিধা দিতে ক্রমান্বয়ে বিচূর্ণ করার ব্যবস্থা হয় (১৮১৩ ও ৩৩-এর চার্টার এ্যাক্টস্)। ভারত তখন তাই ইংরেজি মালের প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য রপ্তানিকারক দেশ থেকে আমদানিকারক দেশে রূপান্তরিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন মনে হল বৃটিশ উৎপাদন তার শীর্ষদেশের কাছাকাছি আসছে তখন ইংরেজ শাসকগণ ভারতের উৎপাদনশক্তির বিকাশের কথা

স্ভাবতে শুরু করল অবশ্যই এই মনোভাব নিয়ে যাতে বৃটিশ পুঁজি অধিকতর লাভবান হয়।

কোম্পানির রাজত্বের সাধারণ প্রকৃতির—মার্কসের আঁটোসাঁটো চরিত্রায়ণ, সমানভাবেই অনুধাবনীয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুনের চিঠির একটা অনুচ্ছেদে তাঁর সমস্ত বক্তব্যের মূল সুরের উল্লেখ মেলে 'ইউরোপীয় স্বেচ্ছাচারের মূল, এশীয় স্বৈরতন্ত্রের উপর প্রোথিত হয়েছিল, যেটা আবার রাফেলের জাভার উপর বর্ণনার 'ওলন্দাজদের অনুকরণ' মডেলের মতো। সমস্ত ব্যবস্থাটার আসল কথা 'লাভের কথা ভেবে উৎসাহিত হওয়া'। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের এর চেয়ে সঠিক সংক্ষিপ্তসার প্রায় ভাবাই যায় না।

১৮৫৭-র ২৮শে আগস্ট মার্কসের চিঠিতে, কোম্পানির রাজত্বে জনসাধারণের উপর শোষণের অন্তত একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তব বর্ণনা আছে, যা আমাদের ইতিহাস-গ্রন্থে মেলে না। তিনি ঐ বিষয়ের উপর "ব্লু-বুক' থেকে (১৮৫৬-৫৭) সাক্ষ্য সংগ্রহ করেন (পরবর্তীকালে 'Capital'-এ ব্যবহৃত ইংরেজ শ্রমিকদের উপর শোষণের সরকারী রিপোর্টের কথা মনে পড়িয়ে দেয়) এবং যথাবিহিত অভিযোগ করেন: 'ভাবতে বৃটিশ শাসকগণ ভারতীয় জনগণের উপর এত দয়ার্দ্র ও নিষ্কলঙ্ক পরোপকারী নয়, যা পৃথিবী তাদের সম্বন্ধে মনে করবে বলে বিশ্বাস করে।'

'মাদ্রাজ টর্চার কমিশন' (১৮৫৫) করের জন্য অত্যাচারের সাধারণ অস্তিত্ব স্বীকার করেছিল। বছরের পর বছর বহু লোক অত্যাচারের মুখোমুখি হত, গুরুতর কোন অপরাধ নয়, কেবল টাকা না মেটানোর জন্যে। কমিশন 'সংশোধনের অসুবিধা', 'কোন বিত্তবান রেভেনিউ অফিসারের সঙ্গে দরিদ্র রায়তের লড়াই করার অক্ষমতা' লক্ষ্য করেছিল। 'সাধারণের অর্থ আদায়ের সময় বল-প্রয়োগের প্রতিকারের কোন আইনসঙ্গত শাস্তির বিধান ছিল না'। এমনকি ডালহৌসিও স্বীকার করেছেন যে 'নিচুশ্রেণীর কর্মচারীদের দ্বারা কোন না কোন ভাবে যে অত্যাচার প্রত্যেক বৃটিশ প্রদেশে চালু রয়েছে, তা আর সন্দেহের বিষয় নয়' (সেপ্টেম্বর ১৮৫৫)। কেবলমাত্র অধঃস্তনেরাই নয়। ডালহৌসি বলেছেন যে ডেপুটি কমিশনার ব্রেরেটন 'বহু দারুণ অন্যায়, খেয়াল-খুশিমতো কারানিক্ষেপ ও নিষ্ঠুর অত্যাচারে' দায়িত্বভাগী হয়েছেন। লুধিয়ানা সম্বন্ধে চীফ কমিশনার লরেন্স রিপোর্ট করেছিলেন যে "বহুলোক কারাগারে

নিক্ষিপ্ত হয়েছিল—সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে তাদের সেখানে আটকে রাখা হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ-পরোয়ানা না দেখিয়েই।”

‘মাদ্রাজ নেটিভ এসোসিয়েশন’ ১৮৫৬-র জানুয়ারিতে অভিযোগ করে যে “তাদের উর্ধতন অফিসারদের অধঃস্তন হিন্দু-অফিসারদের কাজকর্মের সঙ্গে কতদূর পরিচয় ছিলে’ সে-বিষয়ে কোন অনুসন্ধান হয়নি। তাই সমস্ত অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য স্বয়ং তহশিলদারের কাছেই পাঠানো হয়েছিল, তা না হলে সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করা হয়েছিল। একখানা কানাড-অভিযোগ-পত্রে দেখা যায় যে কোম্পানি ‘সবরকমের পরিকল্পনা ভেঁজেছে আমাদের কাছ থেকে অর্থ নিংড়ে নেয়ার জন্যে।’ কালেক্টার ও তাদের অধঃস্তনেরা “যে-কোন রকমে পদোন্নতির আশায় জনসাধারণের মঙ্গল ও স্বার্থের প্রতি অবহেলা দেখায়।”

একটা অভিযোগ এতদূর পর্যন্ত ছিল যে, অর্থদানে অক্ষমদের পিঠে পাথর বেঁধে দিয়ে রোদের মধ্যে সারাদিন জ্বলন্ত বালির উপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। এই অত্যাচারের পুনরাবৃত্তি তিনমাস পর্যন্ত চলেছিল। কালেক্টার অভিযোগ শুনতে অস্বীকার করেন এবং সম্প্রত্তি ক্রোক করা হয়। আবার যখন কোন সৈন্যদল যেতো তখন রসদ জবরদস্তি করে নেওয়া হত। কেউ দাম চাইলে তার উপরে অত্যাচার চলতো।

ভারতবর্ষ থেকে প্রাপ্ত মুনাফাকে মার্কস মূলত “ব্যক্তিগত বৃটিশ প্রজার লাভ” বলে চিহ্নিত করেছেন (১৮৫৭’র ২১শে সেপ্টেম্বরের চিঠি)।

প্রথমত, কোম্পানির ৩০০০ অংশীদার বাৎসরিক ৬৩০,০০০ পাউণ্ড লভ্যাংশ পেত। দ্বিতীয়ত, ভারতে প্রায় ১০,০০০ পৃষ্ঠপোষক ছিল—প্রশাসনিক কর্মচারী, করণিক, চিকিৎসক, সামরিক ও নৌকর্মচারী—যারা বৃটেন থেকে ভারতে এসেছিল লাভের জন্য। তৃতীয়ত, ভারত থেকে পেনসন ও সুদ বাবদ দেওয়া হত বৎসরে দেড় থেকে দু’ কোটি ডলার। চতুর্থত, ভারত থেকে সঞ্চিত টাকা ফিরিয়ে আনা হত। পঞ্চমত, ভারতে প্রায় ৬০০০ ইউরোপীয়, বাণিজ্য ও ফাটকা থেকে বিরাট মুনাফা লুটত।

এখানে শ্রেণী-শাসনের চরিত্র উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েছিল, কেননা বৃটিশ জনসাধারণের অনেকে যারা ভারত-খাতের (মূলত সামরিক) অধিকাংশ ব্যয় বহন করত তারা প্রত্যক্ষভাবে সাম্রাজ্যভোগের অংশীদার ছিল না। জনহিতকর

কাজের জন্য ভারতীয়দের জন্য করের কোন অংশই ফিরে পাওয়া যেত না এবং কোথাও আমরা শাসকশ্রেণীর নিজেদেরই এতখানি ব্যয়বহুল ব্যবস্থা লক্ষ্য করিনি—(১৮৫৮'র ২৯শে জুনের চিঠি)।

পাঁচ

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহ সম্বন্ধে মার্কসের মতামত সমসাময়িক ভারতের ইতিহাসে একটা নিজস্ব দান বলে চিহ্নিত। ঐ অভ্যুত্থান মূলত সামরিক বিদ্রোহ ও দেশীয় মানুষের অত্যাচারে বিকৃত, কিন্তু বৃটিশ শৌর্য দ্বারা পরাজিত —এই প্রতিষ্ঠিত গোঁড়া ধারণার সঙ্গে সে মতামতের ছিল সাংঘাতিক বিরোধ। এটা সকৌতুকে লক্ষণীয় যে আধুনিক গবেষণা অবশেষে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণের চারিপাশেই ঘুরছে।

মার্কস মূলত বিদ্রোহের সাধারণ ধর্ম নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। আলোচনা করেছেন যে-সব উৎপীড়ন ঘটেছিল তাই নিয়ে এবং সামরিক লড়ায়ের পরিচালনা নিয়ে। তিনি এঙ্গেল্‌স-কর্তৃক সঠিকভাবেই সমর্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা আরো বেশি উল্লেখ্য এই কারণে যে ঠিক ঘটনার সময়ে বা তার কিছু পরে "নিউ-ইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউনে" পত্রাকারে তাঁরা তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছিলেন।

মার্কসই প্রায় প্রথম যিনি বিদ্রোহের সত্যিকারের চরিত্র বুঝতে পেরেছেন। ১৮৫৭-র ৩০শে জুন তিনি-ঘটনা বিশ্লেষণে বলেন যে, সিপাইদের প্রাথমিক অর্থে অভ্যুত্থান তাদের প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী "ভারতীয় জনগণের জন্য এই সর্বপ্রথম একটা সাধারণ প্রতিরোধ কেন্দ্র" গড়ে উঠেছে বলেই সংঘটিত হয়। ২৮শে জুলাই ১৮৫৭, তিনি আগের দিন ডিসরেলির মন্তব্য অনুমোদন করে বলেন—'এই গোলমাল ঠিক সেনাবাহিনীর নয়, একে জাতীয় বিদ্রোহই বলা উচিত।' ১৮৫৭'র ৩০শে জুলাই তিনি জোর দিয়ে বলেন যে 'জন বুল' যাকে সৈনিকদের মধ্যে অসন্তোষ বলেছেন 'আসলে তা জাতীয় বিদ্রোহ'।

এ-সিদ্ধান্তের পক্ষে চিঠিগুলিতে অসংখ্য যুক্তি আছে। ১৮৫৭'র ৩০শে জুনে মার্কস লিখছেন 'মুসলমান ও হিন্দুরা তাদের উভয়ের মনিবের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, বিদ্রোহ শুধু কতকগুলো এলাকায় সীমাবদ্ধ নেই, বিশাল

এশীয় জাতির অংশ হিসাবে একটা সাধারণ অসন্তোষের সঙ্গে এ-বিদ্রোহ মিশে আছে।'

তিনি তথাকথিত শান্ত জায়গাগুলো সম্বন্ধে বলেছেন যে 'সেগুলো অদ্ভুত রকমের শান্ত' (জুলাই ৩১, ১৮৫৭), কেননা সেখানেও অস্থিরতার লক্ষণ বর্তমান ছিল। তিনি দেখিয়ে দেন (১৮৫৭, আগস্ট ১৪): 'হিন্দুদের বিতৃষ্ণা এমনকি সহানুভূতি দুই অর্থেই বৃটিশ শাসন সমান অর্থহীন। কেননা, "সরবরাহ এবং পরিবহণের জন্য ইংরেজদের যে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়—সৈন্য-সমাবেশের মন্থরতার যা মূল কারণ, তা চাষীদের ভালো ধারণার সাক্ষ্য দেয় না।' মার্কস ঠিকই দেখেছিলেন (সেপ্টেম্বর ১৫, ১৮৫৭). 'বৃটিশের থানাগুলো বিপ্লব-সমুদ্রের মধ্যে বিচ্ছিন্ন প্রস্তরস্তূপের মতো।'

আধুনিক ঐতিহাসিকদের পূর্বসূরী মার্কস গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিলেন যে "যাই হোক, "ফরাসী রাজতন্ত্রের উপর প্রথম আঘাত চাষীদের কাছ থেকে নয়, সম্ভ্রান্তদের মধ্যে থেকেই এসেছিল।" এবং ভারতের বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল "অপমানিত রায়তদের" দ্বারা নয়, সিপাইদের নিকট থেকে, বৃটিশ যাদের "পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া পিঠ চাপড়ানিতে মাথায় তুলে রেখেছিল (সেপ্টেম্বর ৪, ১৮৫৭)।" সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে মার্কস সিন্ধিয়ার রাজপুত্রের মতো ব্যক্তির ভূমিকাকে নিন্দা করেছেন এবং ১৮৫৮'র ১৭ই সেপ্টেম্বর এঙ্গেলস দেখিয়েছিলেন যে মূল আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে কেমনভাবে জমিদারেরা বৃটিশের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল।

উঁচুমহলের এই কাজের বিপরীতে মার্কস অযোধ্যায় (মে ১৮, ১৮৫৮) সাধারণ লোকের ভূমিকার কথা বলেছেন: 'বিদ্রোহী ঐক্য থেকে যে প্রতিরোধ শুরু হয়েছিল তা সহর ও প্রদেশের জনগণের সহযোগিতা পেয়েছিল।' ১৮৫৮'র মে'র শেষে এঙ্গেল্‌স্‌ আরো বলেন 'নিরস্ত্র জনসাধারণ ইংরেজকে সহযোগিতা বা সংবাদ-সরবরাহ করেনি'। এবং 'অযোধ্যাকে দখল করার চেষ্টা বিজয়ীর সপক্ষে বিশেষ কোন ভালোবাসার সঞ্চার করেনি। খৃষ্টান অনুপ্রবেশকারীদের উপর ঘৃণা আগের চেয়ে এখন তীব্রতর।" আর, 'এই দ্বিতীয় বিজয়ও জনসাধারণের উপর ইংরেজের প্রভাব বাড়াতে পারেনি' (ঐ)।

বিদ্রোহের সময় মার্কস অত্যাচারের প্রশ্নে উত্তেজনার ভিতর, একজন প্রকৃত ঐতিহাসিকের মতো কাণ্ডজ্ঞানপূর্ণ সামঞ্জস্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। একদিকে তিনি ভারতীয়দের উত্তেজিত করা দেখেছেন, অন্যদিকে ভারতীয়রা নিষ্ঠুর ব্যবহার করলেও, এ-ব্যাপারে ইংরেজদের হাতও যে একেবারে ধোয়া-মোছা ছিল না তাও লক্ষ্য করেছেন।

খুব সোজাসুজি তিনি ব্যাপারটা এইভাবে রাখেন (আগস্ট ২৮, ১৮৫৭): 'বিদেশী বিজয়ীরা, যারা প্রজার উপর এত অত্যাচার করছে জনগণ কর্তৃক তাদের সরানোর চেষ্টা বেঠিক হবে কিনা।' এবং "এটাও কি আশ্চর্য যে বিদ্রোহী হিন্দুগণ দোষী সাব্যস্ত হবে,—বিদ্রোহ ও সংঘাতের উত্তেজনায় তারা যে তথাকথিত অপরাধ ও নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছে তার জন্যে?" ১৮৫৭'র ৪ঠা সেপ্টেম্বর তিনি বলেন "সিপাইদের আচরণ যত কুখ্যাতই হোক, এটা ভারতের উপর ইংলণ্ডের আচরণেরই জমাট প্রতিফলন। মানব-ইতিহাসে প্রতিশোধ কাজটা তো থেকেই গেছে।'

এখনকার মতো, মার্কস তখন জানতেন না যে বৃটিশ উৎপীড়ন অন্তত তখনই শুরু হয়েছে, যেদিন সে প্রথম অপমানিত হয়।' তথাপি, তিনি খুব কূটনৈতিকভাবে মন্তব্য করেন যে (৪ঠা সেপ্টেম্বর '৫৭) "এটা মনে করা ভুল হবে যে সব নিষ্ঠুরতা সিপাইদের দিক থেকেই শুরু হয়েছিল। বৃটিশ অফিসারদের চিঠিগুলো ঘৃণার দুর্গন্ধযুক্ত—"যে কোন নিগারকে দেখলে হয় বাঁধবে নয় গুলি করবে।" গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, বারাণসীর একজন অফিসারের মতে 'ইউরোপের সৈন্যরা নেটিভদের মুখোমুখি হলে পশুতে পরিণত হয়।' নেটিভদের অত্যাচার বেদনাদায়ক সন্দেহ নেই, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে তার উপরে রং চড়ান হয়েছে।"

সিপাইদের অত্যাচারের সমধর্মী ঘটনা হিসাবে মার্কস (সেপ্টেম্বর ৪, ১৮৫৭) প্রথম চীন যুদ্ধের আদিপর্বের উল্লেখ করেন, যখন ইংরেজরা 'শুধু মজা করার জন্য নৃশংস কাজ করত,' যা চীনের প্রাদেশিক রাজ্যপাল লিপিবদ্ধ করেনি, করেছে বৃটিশ অফিসাররাই। অন্যান্য সব কিছুর মতোই নিষ্ঠুরতারও একটা আপাত চাকচিক্য আছে যে।'

১৮৫৮-র ৮ই মে এঙ্গেল্‌স্ লিখছেন যে "বৃটিশ সৈন্যদের মতো এত পাশবিকতা ইউরোপ বা আমেরিকায় কোন সৈন্য বাহিনীতে নেই। ক্রমান্বয়ে

বারটা দিন ও রাত ধরে লক্ষ্ণৌতে কোন বৃটিশ সৈন্যদল ছিল না—ছিল শৃঙ্খলাহীন, মত্ত, পশুর দল—সিপাইদের তুলনায় যারা অনেক বেশি শৃঙ্খলাহীন, ভয়ানক ও লোভী। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ-এ লুণ্ঠন বৃটিশ সামরিক বাহিনীর এক অনপনেয় কলঙ্ক হয়ে থাকবে।"

মার্কস দেখেছিলেন (মে ১৪, ১৮৫৮) যে 'অযোধ্যা প্রদেশের জমির মালিকানা সত্ত্ব বৃটিশ সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল' পোল্যাণ্ডে রাশিয়ানদের (১৮৩১ খৃঃ) ও লম্বার্ডিতে অষ্ট্রিয়ানদের (১৮৪৯) এবং ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে লুই বোনাপার্টের জবর দখলের বিরুদ্ধে বৃটিশ ঘৃণার এ যে যোগ্য টিকাটিপ্পনী—তাতে সন্দেহ নেই। ক্যানিং-এর কাজের ফল, এলেনবরোর ভাষায় 'একটা গোটা জাতির উত্তরাধিকার' দখলের নামান্তর, এবং 'শুধু সন্ধি (১৮০১-এর) ভঙ্গ নয়' 'জাতীয় নীতির সব আদর্শ' ভঙ্গও বটে। মার্কস আরো বলেন যে 'ভারতের জনগণ এখন এ-সবের প্রতিশোধ নিতে শুরু করেছে।'

১৮৫৮'র ৪ঠা জুন এঙ্গেল্‌স্, 'টাইম্‌সে' রাসেলের রিপোর্টকে স্মরণ করে লেখেন যে লক্ষ্ণৌ লুণ্ঠনের পরে বহু সাধারণ সৈনিকের 'হাজার হাজার পাউণ্ড' লাভ হয়েছে এবং কোন কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী 'প্রকৃতপক্ষে তাঁদের আখের গুছিয়ে নিয়েছেন।' ১৮৫৮'র ১৭ই সেপ্টেম্বর তিনি বলেন যে 'বৃটিশ সৈন্যদলের নৃশংসতা দেশীয় লোকদের নামে অত্যাচারের রংচড়ান মিথ্যা রিপোর্ট দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।'

আমরা জানি মার্কস 'মিলিটারি' ব্যাপারে কিছুটা উৎসাহী ছিলেন এবং এঙ্গেল্‌স্ কিছুটা বেশিই। তাই ভারতীয় বিদ্রোহে, সৈন্যদলের লড়ায়ের উপর তাঁদের মন্তব্য এমন কিছু আশ্চর্যেরও নয়।

যুদ্ধাভিযানে বৃটিশদের আচরণ নিয়ে, যতখানি প্রশংসা প্রচার করা হয়েছে সে-ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন অবিশ্বাসী। ১৮৫৭'র ২১ জুলাই মার্কস লিখেছিলেন যে দিল্লীর চারিপাশে বৃটিশ সমাবেশ হচ্ছিল অত্যন্ত মন্থর, যার কারণ প্রকৃতির উপরে চাপান হয়েছিল 'যখন পরম একটা অজেয় বাধা' যা কিন্তু স্যার চার্লস নেপিয়ারের সময় মনে হয়নি।' ১৮৫৭'র ২৯শে সেপ্টেম্বর তিনি আবার ইংরেজ সৈন্যদলের ভুল সম্বন্ধে মন্তব্য করেন—তাদের ঐক্যবদ্ধ হবার অক্ষমতা এবং হাতের কাছের সৈন্যদলকে অপ্রয়োজনে ছড়িয়ে যেতে দেয়া।

এঙ্গেল্‌স্ ছিলেন আরো নির্মম। তিনি ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে

মন্তব্য করেন যে "আত্মপ্রশংসায় ইংরেজরা ফরাসীদেরও হার মানায়।" কিন্তু দিল্লীতে তাদের সাহস-প্রদর্শন 'এমন কিছু অ-সাধারণ নয়।'

ভারতীয় বিদ্রোহীদের উপর সর্বৈব সহানুভূতি সত্ত্বেও মার্কস এবং এঙ্গেল্‌স্ সমস্ত ব্যাপারে আমাদের অযোগ্যতা লক্ষ্য না করে পারেন নি। ১৮৫৭-এর ৩০শে অক্টোবর মার্কস লেখেন দিল্লীর 'বিদ্রোহী তাঁবুর' আভ্যন্তরীণ মোগল বণিক ও সিপাইদের মধ্যে, হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর বিরোধের কথা। এঙ্গেল্‌স্ ১৮৫৩'র ৮ই মে ভারতীয় দুর্বলতা, "মিলিটারি ইনজিনিয়ারিং-এ তাদের অজ্ঞানতা ও সামগ্রিক শৃঙ্খলাহীনতা'র দিকে অঙ্গুলি সংকেত করেন। ১৮৫৮'র ৬ই জুলাই তিনি যুক্তি দেন যে "অভ্যুত্থানের ভাগ্য নির্ভর করছে তার বিস্তারের উপর।" এবং ১৮৫৮'র ১৭ই সেপ্টেম্বর বলেন যে বিদ্রোহীরা শত্রুপক্ষকে নাজেহাল করার জন্যে একটা সক্রিয় গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনায় এবং গ্রীষ্ম বর্ষায় শক্তি পুনর্গঠনের যে সুযোগ পেয়েছিল তা সদ্‌ব্যবহারে ব্যর্থ হয়েছে। ইতিপূর্বে এঙ্গেল্‌স্ মার্কসকে লিখেছিলেন যে "সিপাইরা দিল্লীর দুর্গের চারিপাশ নিশ্চয়ই খুব বাজে ভাবে প্রতিরোধ করেছে" (১৮৫৭'র ২৯শে অক্টোবর) এবং "আমরা একবারও ভারতে কোন বিদ্রোহী সেনাদলের কথা শুনলাম না যারা কোন স্বীকৃত দলপতি দ্বারা ঠিকমতো গঠিত হয়েছে" (৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৫৭)।

ছয়

ভারতে বৃটিশ শাসনের ফলাফল সম্বন্ধে মার্কসের সিদ্ধান্ত ১৮৫৩-র ১০ই জুন এবং ১৮৫৩'র ২২শে জুলাই-এর দুটি বিখ্যাত চিঠিতে ভারত সম্পর্কে তাঁর মতামতের সব থেকে পরিচিত অংশ রয়েছে—এতবেশি পরিচিত যে সে-দুটি বিকৃত ভাবে ব্যবহৃত হয়ে তাঁর সামগ্রিক দৃষ্টির ক্ষেত্র অপরিষ্কার করে দিয়েছে। তাঁর অন্যান্য মন্তব্যের মতই ঐগুলি এখন আর গোঁড়া ও নিরঙ্কুশ শেষ কথা নয় এবং অধিকতর পড়াশোনা বা আলোচনার পথ তা রুদ্ধ করে দেয় না। অবশ্য সেগুলি অত্যন্ত ইঙ্গিতগর্ভ এবং ভারতীয় ইতিহাসের কোন সৎ ছাত্র সেগুলি কখনোই অবহেলা করতে পারে না।

তিনি বলেছেন যে 'ভারতীয় সমাজের গোটা কাঠামোটাই ইংলণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে' 'এখনো পর্যন্ত পুনর্গঠনের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।' আক্ষরিক

অর্থে বিচ্ছিন্নভাবে এই মতামতকে নেয়া যায় না, কেননা অন্যত্র মার্কস নিজেই এই সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

মার্কস ঠিকই দেখিয়েছিলেন যে ভারতে আগের অত্যাচারগুলো 'চামড়া ভেদ করে গভীরে ঢুকতে পারেনি।' 'সমগ্র হিন্দুস্থান আগে যে দারিদ্র সহ্য করেছে তা থেকে হিন্দুস্থানের উপর বৃটিশের চাপিয়ে দেওয়া দারিদ্র মূলত পৃথক এবং প্রচণ্ড রকমের ভয়াবহ।' সেচ ও কৃষিব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করা ছাড়াও 'এই বৃটিশ অনুপ্রবেশকারীরাই ভারতের হস্তচালিত তাঁত ভেঙ্গেছে ও চরকা নষ্ট করে দিয়েছে এবং তুলোর জন্মস্থানকে তুলো দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে।—বৃটিশ বাষ্প ও বিজ্ঞান,—কৃষিকার্য ও শিল্পের সংযুক্ত ব্যবস্থাটি ছিন্নমূল করে দিয়েছে।' এইভাবে বৃটিশ 'অর্ধ-বর্বর ও অর্ধসভ্য গ্রাম্য ব্যবস্থার গৃহশিল্প তাঁত ও কৃষিব্যবস্থার ঐক্যগত অর্থনৈতিক ভিত্তিকে ভেঙ্গে দিয়ে, সত্যিকথা বলতে কি এশিয়ায় প্রথম-শ্রুত মহত্তম সমাজ-বিপ্লব ঘটাল।' ব্যাপক ও গভীর গবেষণার আলোকে একে যতই অতিসরলীকৃত বলে মনে হোক, এর পিছনকার মর্মসত্যকে অস্বীকার করা মুস্কিল।

এবং কেউ এ-কথাকে অস্বীকার করতে পারে না যে 'ইংলণ্ড জঘন্যতম লাভের দ্বারা প্রণোদিত হয়েছিল', কিন্তু তা সত্বেও 'সে ইতিহাসের অচেতন হাতিয়ার' হয়ে এসেছিল।

পূর্ব-ইঙ্গিতমতো মার্কস যে বলেছিলেন 'পুনর্গঠনের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না' তা তিনি নিজেই সংশোধন করেন যখন বলেন যে ইংলণ্ডের ইতিহাসের 'অচেতন' কাজ হল দ্বিগুণ ধ্বংসাত্মক (পুরোনো সমাজকে ছিন্নমূল করা) এবং গঠনমূলক (ভারতে আধুনিক সমাজের বস্তুবাদী ভিত্তি তৈরি করা)।

ধ্বংসের ভূমিকার বিপক্ষে মার্কসের আক্রমণ সত্যিই প্রচণ্ড। তিনি বলেছিলেন যে 'বুর্জোয়া সভ্যতার বিরাট ভণ্ডামো এবং সহজাত বর্বরতা আমাদের সামনে ঘোমটা খুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে—যেখানে তার ভদ্র চেহারা, সেই নিজের দেশ থেকে রূপ বদলেছে উপনিবেশের মধ্যে—যেখানে সে নগ্ন।' এমনি-ভাবে ভারতে কৃষি-বিপ্লব শুরু হল সম্পত্তির রক্ষাকর্তাদের দ্বারা, জাতীয় ঋণের রক্ষকগণ রাজন্য-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করলেন, শ্রেষ্ঠ ধর্ম-প্রবক্তাগণ মুনাফা লুঠলেন মন্দিরের পাপ-পঙ্ক থেকে।

তথাপি বুর্জোযা শিল্প ও বাণিজ্য 'ভু-বিন্যায' বিপ্লবেব মতো, নতুন পৃথিবীব উপযোগী বাস্তব অবস্থা তৈবি কবে। ভাবতেও তাই ঘটবে। সামাজিক বিপ্লবকে "বুর্জোযা যুগের ফলগুলি—পৃথিবীব বাজাব ও আধুনিক উৎপাদন-শক্তিকে জয় কবতে হবে।" এ-সবই অনস্বীকার্য এবং ঋষি-বাক্যেব মতো।

জাতীয় আন্দোলনেব আগেই, মধ্য-উনবিংশ শতকে যে পুনবভ্যুত্থান দেখা যাচ্ছিল, মার্কস তাব সর্তাবলীব উল্লেখ কবে গিযেছিলেনঃ বাজ-নৈতিক ঐক্য (টেলিগ্রাফেব ফলে যা স্থাযী হযেছে), অনুশীলিত ভাবতীয় সৈন্যদল (আত্মমুক্তিব সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত), বাষ্পীয যোগাযোগ, নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তি (জমিদাবী ও বাযতওযাবি, স্বাধীন সংবাদপত্র, 'একটা নতুন শ্রেণী' (অনিচ্ছা ও শৈথিল্যেব সঙ্গে কলকাতায ইউবোপীয বিজ্ঞানেব আদর্শে শিক্ষিত)।

মার্কস ভাবতে রেলওযে স্থাপনেব যুগান্তকাবী ফলাফলও লক্ষ্য কবে-ছিলেন। বেলওযে সম্ভাবনা তৈবি কবে,—উৎপাদনেব সু-বণ্টনেব, বেলপথেব দুপাশে সেচেব ব্যবস্থা (পুকুব সংস্কাব কবে, পাশাপাশি জলপথ হয), সৈনিকের মালখানায ব্যয সংকোচ, সৈন্যবাহিনীব সক্রিয গতি, এখনো পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলোব মধ্যে সংযোগ, বর্ণ-বৈষম্যের কড়াকড়ি হ্রাস, অবিলম্বে বেলওযেব যন্ত্র-প্রভৃতিব অভাব মেটানোব জন্য শিল্প-কাবখানা তৈবি, অন্যান্য শিল্পেও সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র ব্যবহাবেব বিস্তার, ভাবতীয ইন্জিনিযাব ও শ্রমিকদেব মধ্যে যে বুদ্ধি-শক্তি সঞ্চিত রয়েছে তাব উদ্বোধন। নবোত্থানেব শক্তি এবং বেলওযে বিস্তাব জনিত সম্ভাবনা—এই দুটি তালিকার মধ্যে নতুন কিছু যোগ করা সত্যিই কঠিন।

অবশ্যই ইংবেজ বুর্জোযাগণ বিপুল সংখ্যক মানুষেব সমাজ ব্যবস্থাব মুক্তি বা বস্তুগত পরিবর্তন কোনটাই ঘটাবে না—, কিন্তু যা কবতে তাবা ভুলবে না তা হল উভযেব পক্ষে প্রযোজনীয় বস্তুগত পূর্ব-সর্ত। এবং মার্কস আবও বললেন, অসংগত ভাবে নযঃ "কখনো কি বুর্জোয়াবা এব চেযে বেশি কিছু কবেছে? তারা কি কখনো কোন উন্নতি কবেছে ব্যক্তি ও জনতাকে বক্ত ও নোংবা, কষ্ট ও অধঃপাতের মধ্যে দিযে না নিযে গিযে?" ভাষাব অলঙ্কাব-গুলো বাদ দেযা গেলেও সিদ্ধান্তকে ঠিক ফেলে দেযা যায না।

তাছাডা এ কথা বলেও মার্কস খুব ভুল কবেন নি যে 'সমাজের নতুন

উপকরণগুলি তাদেব মধ্যে বৃটিশরা যেমন ভাবে ছড়িযে দেবে ভাবতবাসী তেমনিভাবে তার ফলগ্রহণ কববে না', যতদিন না পর্যন্ত বৃটেনে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতায আসে কিংবা ভাবতীযগণই 'এমন শক্তিশালী হয যাতে ইংবেজদেব জোযাল একেবারে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে।' তিনি অবশ্য আত্মবিশ্বাসেব সঙ্গে তাকিযেছিলেন ভবিষ্যতেব দিকে আমাদের বিশাল ও কৌতুহলোদ্দীপক দেশের যত দেরীতেই হোক পুনর্জাগরণ দেখাব জন্য"। যদি তা আদৌ এসে থাকে, তাহলে তা তাঁব অনুমানের কিছু আগেই এসেছে।

অনুবাদ : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

---

* পি. সি. যোশী সম্পাদিত মার্কস স্মাবক গ্রন্থে প্রকাশিতব্য ইংরাজি প্রবন্ধের অনুবাদ।

মার্কসবাদ ও বিজ্ঞান

শঙ্কর চক্রবর্তী

প্লেখানভ তাঁর "ফাণ্ডামেণ্টাল প্রবলেমস অফ মার্কসিজম' গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখেছিলেন যে—"মার্কসবাদ হল একটি সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক ব্যবস্থা"। মার্কস অবশ্য তাঁর দর্শনকে প্রধানত একটি পদ্ধতি বলেই গণ্য করেছিলেন। যদিও মার্কসবাদের মধ্যে তত্ত্ব একটি অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার, মার্কস কিন্তু তত্ত্বের ওপর প্রয়োগের প্রাধান্যকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ফয়েরবাখের ওপর লেখা দ্বিতীয় থিসিসের মধ্যে মার্কসের নিজের ভাষাতেই আমরা এর প্রতিফলন দেখতে পাই—"নৈর্ব্যক্তিক সত্য মানুষের চিন্তার একটি উপাদান কিনা এই যে প্রশ্নটি—তা তাত্ত্বিক নয়, একটি প্রয়োগগত প্রশ্ন। প্রয়োগ থেকে বিচ্ছিন্ন চিন্তার বাস্তবতা অথবা অবাস্তবতার যে তর্ক, তা পুরোপুরিই একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ কূটতর্কের প্রশ্ন।"

মার্কসের পূর্বোল্লিখিত উক্তির মধ্যে আমরা তাঁর চিন্তাধারার এমন একটি সক্রিয় চরিত্রের পরিচয় পাচ্ছি, যার বলিষ্ঠতম প্রয়োগ ঘটতে দেখা যায় সেই সংগঠিত চিন্তার মধ্যে যাকে আমরা বলি বিজ্ঞান—প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞান, দুয়ের ক্ষেত্রেই এ কথাটা খাটে। সারা পৃথিবী জুড়ে বিজ্ঞানীরা মার্কসবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন এইজন্যে যে, সামাজিক জীবনের মতো বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন বিকাশের ফলে যে আলোড়ন জেগে উঠছিল, তার মধ্যে শৃঙ্খলা বিধানের কাজে মার্কসবাদকে পথ প্রদর্শকরূপে তাঁরা ব্যবহার করতে পারছিলেন। এ ব্যাপারটা সম্ভব হতে পেরেছিল আরো

এই কারণের জন্যে যে মার্কসবাদ প্রকৃতির বিরাট বিপুল শক্তিকে মানুষের আয়ত্তে আনবার কাজেও পথ নির্দেশ করতে পেরেছে। মার্কসবাদ একটি বিজ্ঞান বলেই অন্যান্য বিজ্ঞানের সমস্যার ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ করা যাচ্ছিল। এ হল মানবসমাজ ও তার বিকাশের বিজ্ঞান। কতকগুলো বিমূর্ত নয়, বরং মূর্ত মানবসমাজের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ওপরে এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। মার্কসবাদ এই সমস্ত সমাজের অন্তর্লীন চালিকাশক্তিগুলি বিশ্লেষণ করে এবং তাদের বিকাশের নিয়মগুলোকে আবিষ্কার করার পর খুঁটিয়ে বিচার করে। এইসব সমাজ ভবিষ্যতে কোন পথে চলবে এবং সমাজের মধ্যে যে ক্রিয়াশীল শক্তি বা শ্রেণী শক্তিগুলো রয়েছে, তারা কিভাবে সমাজের বিকাশকে প্রভাবিত এবং পরিচালিত করতে পারে, তার নির্দেশও মার্কসবাদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। মার্কসবাদ হল এমন একটি বিজ্ঞান, যার বক্তব্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর দ্বারা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

মার্কস এটা পুরোপুরিভাবেই অনুধাবন করেছিলেন যে বিজ্ঞান মানুষের মনের এক স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি নয়। বিজ্ঞানের ধারণা ও তত্ত্বগুলো, অন্য সব ধারণার মতোই তাদের সমকালীন সামাজিক এবং শিল্পগত শক্তি এবং পরিবেশের দ্বারা সৃষ্ট।

বিজ্ঞানের বিকাশের ফলে যে বৈপ্লবিক সামাজিক ধারণার সৃষ্টি হচ্ছিল, সামন্তবাদ এবং পুঁজিবাদের পরবর্তী যুগের শাসকশ্রেণীকে তা ভীতিগ্রস্ত করে তুলেছিল। কোপার্নিকাসের বিশ্বধারণা এবং গ্যালিলিওর বৈজ্ঞানিক মতামতের ওপরে রোমান ক্যাথলিক চার্চের কুখ্যাত আক্রমণের কথা আমরা জানি। চার্চ মানবদেহবিদ্যা ও শারীরবিদ্যার বিকাশ এবং আধুনিক ভেষজ বিজ্ঞানের উদ্ভবের পথে বাধার সৃষ্টি করেছিল এবং বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ধারণার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছিল।

বিজ্ঞানের ওপরে চার্চ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে আক্রমণ চালিয়েছিল, তা অনেক বেশি উগ্র চেহারা নিয়েছিল দর্শনের ক্ষেত্রে। বিশপ বার্কলে যে আধুনিক ভাববাদকে উপস্থাপিত করেছিলেন, তা বিজ্ঞানের বিকাশের বিরুদ্ধে ধর্মের জবাবরূপে বিশ্বের নৈর্ব্যক্তিক সত্তা সম্পর্কেই তর্ক তুলে বসেছিল।

বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুত্থানের দ্বারা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক বিকাশ ঘটলেও, ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রগতি একটি যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা আবদ্ধ

হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর বৃহৎ আবিষ্কারগুলো পুরনো যান্ত্রিক ধারণাগুলোর উচ্ছেদ ঘটাল। এই উচ্ছেদের কাজও প্রধানত ঘটেছিল বিখ্যাত মাইকেলসন মর্লে পরীক্ষা এবং তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কার—এই দুটি ঘটনার দ্বারা। প্রথম পরীক্ষাটি আলোর গতিবেগের অপরিবর্তনীয়তাকে প্রদর্শিত করে ও আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের বনিয়াদ তৈরির কাজে সাহায্য করে এবং ঈথারের কল্পিত ও অসম্পূর্ণ ধারণাটিকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে। তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কার, যা মৌলিক পদার্থের রূপান্তরের ঘটনাটি প্রকাশ করেছিল, তাই শেষপর্যন্ত পদার্থের ভর ও শক্তির পারস্পরিক রূপান্তরের আবিষ্কারটি ঘটিয়ে বসে—আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের যা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

দুই

মার্কসবাদের কাছ থেকে যে দর্শনটি আমরা পেয়েছি, তা হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দর্শন। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পদ্ধতির সঙ্গে এই দর্শনের পরিপূর্ণ সঙ্গতি রয়েছে এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সচেতন বিকাশের ব্যাপারেও এ বিপুলভাবে সাহায্য করে থাকে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ প্রধানত হল পরিবর্তনের দর্শন। মানুষের চিন্তাজগতে এই দর্শন যে একটি নতুন দিগন্তকে উন্মুক্ত করে দিচ্ছে তাই নয়, কিভাবে কাজ করতে হবে, তারও পথনির্দেশ এর কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। ফয়েরবাখের ওপর আর একটি থিসিসে মার্কস এই কথাটাই বলেছেন "দার্শনিকেরা জাগতিক ব্যাপারগুলোর বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন মাত্র, আসল কথাটা হল, এদের পরিবর্তন করতে হবে।" দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদরূপী মার্কসীয় দর্শনের কতকগুলো মূলসূত্র হল এই জড়ই হচ্ছে প্রধান এবং সমগ্র নৈর্ব্যক্তিক সত্তার বনিয়াদ স্বরূপ, জড় ও গতি হল অভিন্ন, প্রতীত ব্যাপারগুলো (ফেনোমেনা) বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করে না ররং পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্তভাবে এবং নির্ভরশীল অবস্থায় বিরাজ করে, বিপরীতধর্মী সত্তার পারস্পরিক অনুপ্রবেশ এবং সংঘাতের মধ্য দিয়েই বিকাশের ধারা এগিয়ে চলে, বিপরীতধর্মী সত্তার ঐক্য হচ্ছে আপেক্ষিক, ররং সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী সত্তার সংঘাতই হল এক পরম (অ্যাবসলিউট) ব্যাপার, বিপরীতধর্মী সত্তার এই যে সংঘাত, তাই হল সমগ্র বিকাশের প্রাণবস্তু স্বরূপ এবং পরিমাণগত পরিবর্তন

থেকে গুণগত পবিবর্তনে রূপান্তবের মধ্য দিযে এই বিকাশের ধারা এগিযে চলে।

এঙ্গেলস তাঁব 'লুদভিগ ফযেববাখ' গ্রন্থে তিনটি বড আবিষ্কারের উল্লেখ করেছেন, যেগুলি যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির নিগডটাকে ভেঙ্গে ফেলে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদরূপী মার্কসীয় দর্শনেব জমিটাকে তৈবি কবে দিযেছিল। প্রথমটি হল, শক্তিব রূপান্তব এবং নিত্যতার আবিষ্কাব। দ্বিতীযটি হল, সমগ্র প্রাণীদেহেব গঠনেব ভিতস্বরূপ জীবকোষেব আবিষ্কাব এবং তৃতীযটি ছিল ডাবউইনেব বিবর্তনরূপী তত্ত্বের আবিষ্কাব।

জডবস্তুব পবমাণুরা যে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি বস্তুকণাব দ্বাবা গঠিত এবং জডবস্তুব ভবকে যে বিকীবণ বা শক্তিতে রূপান্তবিত কবা যায এবং শক্তিকেও ভবে রূপান্তবিত কবা যায, ভাববাদী এবং অস্তিত্ববাদী (পজিটিভিস্ট) দার্শনিকেবা এই আবিষ্কারগুলোকে সাক্ষ্য হিসেবে বেখে বললেন যে "জডেব অন্তর্ধান ঘটেছে।"

লেনিন তাঁব ১৯০৮ সালে প্রকাশিত 'মেটিরিযালিজম অ্যাণ্ড এম্পিবিও-ক্রিটিসিজম' গ্রন্থের এক জাযগায এর দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী জবাবটা এইভাবে দিযেছেন: "জডেব অন্তর্ধান ঘটেছে, বিদ্যুৎ জডেব স্থান গ্রহণ করেছে ইত্যাদি কথাগুলো, যা বহু লোককেই বিপথগামী কবছে, তাব আসল অর্থটা হল এই যে 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান জডজগতেব ঐক্যের দিকেই পথনির্দেশ কবছে'। 'জডেব অন্তর্ধান ঘটছে'—এব অর্থ হল এই যে জডকে এ-পর্যন্ত যে সীমার মধ্যে আমবা জেনেছি তাব অন্তর্ধান ঘটেছে এবং আমাদের জ্ঞান আবো গভীরে প্রবেশ কবছে, জডের সেইসব ধর্মাবলীব অন্তর্ধান ঘটছে, আগে যারা পবম, অপবিবর্তনীয এবং প্রধান (দুর্ভেদ্যতা, জাড্য, ভব ইত্যাদি) বলে মনে হয়েছিল এবং এখন যাবা আপেক্ষিক এবং জডেব কযেকটি অবস্থাব বৈশিষ্ট্য বলেই প্রতিভাত হচ্ছে।" (পৃষ্ঠা ২৬৭)

এঙ্গেলস ১৮৭৮ সালে তাঁব 'এ্যান্টি-ডুবিং' গ্রন্থে লিখেছিলেন: "গতি হল জডেব অস্তিত্বেবই একটি অবস্থা। গতিকে বাদ দিযে কখনো জড ছিল না, কখনো হতে পারে না"—জড এবং শক্তিব পাবস্পবিক রূপান্তব যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূলসূত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তা এই বক্তব্যেব মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে।

প্লাংকের কোয়াণ্টাম থিওরি বা শক্তিকণাবাদ তত্ত্ব, যার বক্তব্য ছিল এই যে, কোনো বিকীরিত শক্তি অবিচ্ছিন্নভাবে বা অবিরতভাবে নির্গত হয় না, তা নির্গত হয় বিচ্ছিন্ন শক্তিকণা বা কোয়াণ্টার আকারে। এই তত্ত্বের আলোকে বিকীরণের অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের বর্ণালী ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছিল। কোয়াণ্টাম তত্ত্বের মধ্যেও ডায়ালেকটিকসের সমর্থন পাওয়া যায়।

কোয়াণ্টাম মেকানিকস বা কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার অনিশ্চয়তা সম্পর্কটিকে (আনসারটেনটি প্রিন্সিপল) ভাববাদী চিন্তার সমর্থকেরা তাঁদের হাতে সবচেয়ে জোরালো হাতিয়াররূপে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন। এই সম্পর্কটির বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যে কোনো একটি বস্তুকণা, যেমন একটি ইলেকট্রনের অবস্থান এবং ভরবেগ (মোমেণ্টাম) কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে একই সঙ্গে পরম নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব, কারণ ইলেকট্রনটির অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্যে যে আলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা ইলেকট্রনটির গতির মধ্যে পরিবর্তনকে সূচীত করে তুলছে।

ভাববাদীরা অনিশ্চয়তা সম্পর্কটিকে সব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রযোগ করবার চেষ্টা করলেন। তাঁরা বললেন, এই সম্পর্কটি প্রমাণ করছে যে প্রকৃতির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক বলে কোনো কিছু নেই, সমগ্র প্রকৃতিই হচ্ছে অজ্ঞেয় এবং জড়ের মূল গঠনপ্রকৃতিই ফেথ্‌, বা বিশ্বাসের জন্যে জায়গা তৈরি করে দিচ্ছে।

জে. বি. এস. হলডেন তাঁর 'দি মার্কসিস্ট অ্যাণ্ড দি সায়েন্সেস' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে এই অনিশ্চয়তা-সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ: "জড়ের সম্পর্কে এমন কোনো বিশেষ ধোঁয়াটে ভাব নেই যা আমাদের ইচ্ছেমতো নির্ভুলভাবে একে পর্যবেক্ষণের কাজে কোনো বাধার সৃষ্টি করছে · আমরা জানি না, একটি বস্তুকণার ফটোগ্রাফ নিতে গিয়ে তার বেগ কতখানি পরিবর্তিত হয়েছে, যে কোনো একটি বস্তুর পর্যবেক্ষণের ব্যাপারটা এমন একটি জাগতিক ব্যাপার, যা পর্যবেক্ষমান বস্তুটিকেও প্রভাবিত করে। এ থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে এমন কোনো দ্রষ্টা নেই, যারা কিনা শুধুই দ্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করে বসেই থাকেন এবং বিশ্বের ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে কোনো অংশগ্রহণ করেন না। এ হচ্ছে মার্কসবাদের একটি অতি

সাধারণ সূত্র। মার্কস বরাবর এটাই নির্দেশ করেছেন যে সমাজের দ্রষ্টা বা পর্যবেক্ষকেরাও সেই সমাজের সক্রিয় সদস্য, তাঁরা হয় উৎপাদক আর তা না হলে কোনো উৎপাদন করেন না। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি পার্থক্য দেখা যাবে। মোদ্দা কথাটা হল, এই বিশ্বের বাইরে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব।" (জর্জ অ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইন, লণ্ডন, পৃষ্ঠা ৮-৭৯)

অনিশ্চয়তা-সম্পর্ক প্রকৃতির রাজ্যে কার্যকরণ-সম্পর্ক এবং নিয়মকে বাতিল করে দিচ্ছে না। এই সম্পর্ক শুধু এটাই দেখিয়ে দিচ্ছে যে বস্তুকণা বা মানুষের এক বিরাট দলের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বস্তুকণা বা ব্যক্তিমানুষ সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট ভবিষ্যদবাণী করা যায় না। কিন্তু ঘটনাবলীর সমষ্টির যে নিয়ম তা ঠিকই থাকছে। একটি ইলেকট্রনের 'স্বাধীন ইচ্ছা' বলে কোনো ব্যাপার নেই।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব দেশ-কালের ক্রমানুসারিতার (স্পেস-টাইম কনটিনিউয়াম) ঐক্যকে প্রতিপাদন করেছিল এবং গতিশীল জড়ের বেগের ওপর এর মাত্রা ও আয়তনের যে নির্ভরতা, তাকেও দেখিয়েছিল। ভাববাদীদের মধ্যে অনেকে একে ভুলভাবে ব্যাখ্যা দিলেন যে এর দ্বারা নাকি দেশ এবং কালের নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবতা অপ্রমাণিত হচ্ছে। লেনিন তাঁর 'মেটিরিয়ালিজম অ্যাণ্ড এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম' গ্রন্থে দেশ ও কালের নৈর্ব্যক্তিক সত্তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে অনেক আগেই লিখেছিলেন যে "নৈর্ব্যক্তিক সত্তার, অর্থাৎ আমাদের মনের বাইরে স্বাধীনভাবে গতিশীল জড়ের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে, বস্তুবাদকে দেশ এবং কালের নৈর্ব্যক্তিক সত্তাকেও নিশ্চিতভাবেই মেনে নিতে হবে, এটা বিশেষ করে কাণ্টের মতের বিরুদ্ধেই যাবে, যা এই প্রসঙ্গে ভাববাদের পক্ষ অবলম্বন করছে এবং দেশ ও কালকে নৈর্ব্যক্তিক সত্তারূপে নয় বরং মানুষের চিন্তার রূপ হিসেবে গণ্য করছে" (পৃষ্ঠা ১৭৬)।

একটি পদ্ধতিরূপে, দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সব সময়েই একজন বৈজ্ঞানিককে তাঁর সমস্যাবলী খানিকটা তলিয়ে বোঝবার কাজে সাহায্য করতে পারে। এঙ্গেলস তাঁর 'অ্যান্টি-ডুরিং' গ্রন্থে লিখছেন : "প্রকৃতি হচ্ছে ডায়ালেকটিকসের পরীক্ষাক্ষেত্র, এবং আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে এ-কথাটা বলতেই হবে যে তা এই পরীক্ষাকাজের জন্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং প্রতিদিনই ক্রমবর্ধমান

উপাদানকে সববরাহ করেছে এবং এভাবে প্রমাণিত করেছে যে সর্বশেষ বিশ্লেষণে প্রকৃতির প্রক্রিয়াটা হচ্ছে দ্বান্দ্বিক, আধ্যাত্মিক (মেটাফিজিকাল) নয়।”

তিন

মার্কস বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর সমসাময়িক কাল পর্যন্ত প্রত্যেকটি রাষ্ট্র বা সমাজের মধ্যে যে বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলো তৈরি হয়েছে তারা পরম এবং চিরন্তন ভূমিকা নিয়ে দেখা দেয় নি। যে-সময়ে ওরা উদ্ভূত, সেই সময়কার শাসকশ্রেণীর ভাবাদর্শের সঙ্গে ওরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শাসকশ্রেণী সব সময়েই বিজ্ঞানের সমৃদ্ধিকে শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে তার নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাজে প্রয়োগ করেছে।

মার্কস জানতেন যে বিজ্ঞানের পূর্ণ সামাজিক ব্যবহার তখনই সম্ভব হবে যখন শ্রমশিল্পের দ্বারা যে শ্রেণীটির উদ্ভব হয়েছে, সেই প্রোলেটারিয়েট নিজেই উৎপাদনের ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, নিজের সমবায়ভিত্তিক শ্রমের দ্বারা যে কাজটি সে ইতিমধ্যেই চালিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমান শিল্পব্যবস্থার যে বিশেষ দিকটি মার্কসের নজরে পড়েছিল, তা হচ্ছে এই যে—দাম বা মূল্যের সামাজিক উৎপাদন—ফলপ্রসূভাবে কার্যকরী হতে পারবে না যদি-না যে মূল্য উৎপন্ন হল, তার সামাজিক ব্যবহারের কাজটাও একই সঙ্গে শুরু করা যায়। এই সামাজিক ব্যবহারের কাজটা একমাত্র যাঁরা সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন, তাঁরা হচ্ছেন শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীরা—যাঁরা বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হন এবং যাঁরাই আবার হলেন সেই ব্যবস্থার সবচেয়ে প্রধান চালিকাশক্তি।

বিজ্ঞান এবং যন্ত্রশিল্পের সমৃদ্ধি যত বেড়েছে, মানুষ যতই প্রকৃতির শক্তিকে নিজের করায়ত্ত করেছে, তত একদল মানুষ হয়েছে আরো বেশি নির্যাতিত। এই নির্যাতিত সর্বহারা শ্রেণীর মানুষেরা চিরদিন অত্যাচার মাথা পেতে সইবে না। উৎপাদিকাশক্তি এবং সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে এই যে দ্বন্দ্ব, একদিন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তার নিরসন হবে। সেই বিপ্লবের স্বপ্ন মার্কস দেখেছিলেন। পরবর্তীকালে পৃথিবীর ইতিহাসে মার্কসের সেই স্বপ্ন রূপায়িত হয়েছে।

এই আকাঙ্ক্ষার দেশে

রাম বসু

আদিত্য মণ্ডল, আমার এই আকাঙ্ক্ষার দেশ
পরিণত রোদে বীজ চায় বিপুল বিস্তার
আমার তৃষ্ণা ঘোচে পচা পাতা মাটি আর কাদার সুবাসে
আমার ক্ষতের বিশাল গোলাপ পুঞ্জ আর আহত ললাট আমার গৌরব।

মার্কস, তুমি আর নীটশে সময়ের ঝুঁটি ধরে টান দিলে এক সঙ্গে
এ তো আকস্মিক নয়, এ তো শুধু আকস্মিক নয়
তোমরা দুজনেই এক সঙ্গে দাবি করলে মাতাল মুকুটের
এ তো সেই এক সেই আদি প্রেম আর ঘৃণার সংগ্রাম
আমি ঘৃণা করি যেন ভালোবাসা শুদ্ধসত্ত্ব হয়।

একদিন প্রলয়ের ঝড়ে ডেকে উঠল দুর্দান্ত অশ্বটি
আহত গৌরব আর স্পন্দমান মানবিক বিভূতি তাকে ঘিরে
আমের বাগানে বাংলার সোনালি প্রান্তরে তোমার নাম ধ্বনিত
ধ্বনিত সেই সফেন ভৃঙ্গারে যেখানে অগ্নিবর্ণ পাখি তার দৃপ্ত ডানা ঝাড়ে
ধান আর গমের প্রান্তরে গলা জড়িয়ে বুক টান করে দাঁড়ায় বজ্র ও বিদ্যুৎ
মাটি খুলে দেয় সুগন্ধির ঝাঁপি-ওপছানো ফুলের দৃঢ় সাধুতায়
আমাদের বুকের মন্দির পূর্ণ হয় তোমার নামের কীর্তনে,
তোমার আগ্নেয় কোমলে।

যা কিছু মানবিক তাতেই আমার অধিকার
আমি গোপন করতে লজ্জা পাই মারাত্মক বিস্ফোরণই মানবিকতার পথ।

প্রেমে আর ক্রোধে অন্ধ চোখগুলির দিকে তোমার অতিকায় মাধুর্য
প্রসারিত
তোমার ললাটের রহস্যের চাঁদ নক্ষত্রের দ্রাঘিমার সীমা মুছে দেয়
পাহাড়ের দৃঢ় বল্লমগুলি তুলে নাও বাহুর নিবিড়ে
আলগা শিকড়ের ভোঁতা জটিলতার ওপারে আমার জন্যে
আলো দাও, মার্কস
আমাকে নিয়ে চলো নিহত পুষ্পে ও বিশ্বাসে
বসন্তে জেগে উঠুক স্নায়ুর উদ্যান
আলোয় আলোয় অন্ধ এই দেশে
এই আকাঙ্ক্ষার দেশে।

ইতিহাসের মূর্তি

শিবশম্ভু পাল

(কার্ল মার্কসের পঞ্চাশোত্তর জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে)

অন্ধকারের জবরদখল মাটি, মানে, আমরা
দেযালগুলো এগিযে এসে চেপে ধবে কামবা
ছিনিযে নিল আমাব হাত থেকে হীরের আংটি
পাইনা খুঁজে যত্ন কবে রাখা সে নীল খামটি।

উল্টোদিকে অনেক দূব হেঁটেছিলাম, হাঁটছি
চতুর্দিকে বক্তচোখেব নানাবকম নাৎসি।
চোখ ভেসেছে ভুলেব জলে আকাশ কালো বাষ্পে
ভেতর থেকে শুনছি তবু, 'ফিরে তোমরা আসবে।'

ফিরে আসব, তুমি বললে, ইতিহাসের মূর্তি
ফিরে আসব ঝর্ণাতলায, কলস্বরের ফুর্তি
উছলে ওঠে রক্তস্রোতে, দেয়ালগুলো চূর্ণ
দিগন্ত ঘুচিযে দেবে সকল অসম্পূর্ণ॥

হঠাৎ ঘনিয়ে তোলো তোলপাড়—উচ্চণ্ড অসুখ

অমিতাভ দাশগুপ্ত

(কার্ল মার্কস-কে নিবেদিত)

মাঝে মাঝে রুষ্ট হই।
মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করি।
পরক্ষণে হেটমুণ্ড
জিভ দিয়ে টেনে নিই মাতাল লম্পট মহাপ্রভুদের বমি।
যেহেতু নিজের কাছে প্রত্যেকেই দারুণ বিখ্যাত,
অনিচ্ছুক সময়ের কর্কশ, কৃপণ মুষ্টি থেকে
যে কোন প্রথায় খ্যাতি-অর্জনের প্রাণান্ত প্রয়াস
সবুট পায়ের চিহ্ন আঁকে চাটুকার গণ্ডদেশে।

তবু ধূর্ত জিগ্-জ্যাগ—চাতুর্যের গভীরে অসুখ
কখন ঘনিয়ে তোলো,
মাটির ভিতরে মাটি কেটে
হঠাৎ নিপুণ টানে জলের আশ্চর্য ছবি আঁকো,
গণ্ডারের পুরু ত্বক ফেটে
মাঝে মাঝে মানুষের রক্ত—আলোড়ন,
স্লোগানে ভরাট কণ্ঠ, দুই হাত আনন্দে নিশান,
নতজানু শীর্ণ উরু হঠকারী অশ্বিনীকুমার—
এই ভাবে
জিগ-জ্যাগ সুখী চাতুর্যের বুক ভেঙে
কখন ঘনিয়ে তোলো তোলপাড—উচ্চণ্ড অসুখ!

হে পূষণ

অমিয় ধর

জ্যোতিষ্মান হে পূষণ
আণবিক কম্পিত আবেগ।
জাগ্রত-সত্তায় তুমি,
হিরণ্ময়-চৈতন্যেব-বীজ।

বৌদ্র-হানো অন্ধকারে,
ঢেলে দাও ক্লোরোফিল,
বীজকম্প্র মৃত্তিকার বুকে।
পৃথিবীর দুই চোখে,
জেলে দাও, হে-পূষণ
হিরণ্ময় সবুজ-আশ্বিন।

ভয়

তরুণ সেন

শেষ ট্রামের ট্রলির মাথায় আগুন ফিনকি দিতে
লোকটা ভীষণ ভয় পেল
দূরে চৌমাথায় কেউ নেই দেখে খুশী হ'তে
হঠাৎ লাল চোখ বললে—থামো
চুলে আঙুল চালিয়ে ভাবতে ভাবতে
নিচে—অনেক নিচে অন্ধকার হাত বাড়িয়ে বললে—
"আগুনটা দেখি।"

বুড়ো হাক

নাম কাও

বুড়ো হাক খড়ে ফুঁ দিয়ে বাঁশের একটা চোঁচ ধরাল। কল্কেটা খুলে ঠেসে নিয়ে আমি তার দিকে হুঁকোটা বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু সে নিল না।

—'তুমি আগে খেয়ে নাও মাস্টার।' আমাকে বাঁশের চিলতেটা এগিয়ে দিয়ে সে বলল।

তারপর ধীরে সুস্থে সে একটা তামাকের বটুয়া বার করল। সেটা খুলে আঙুল দিয়ে একটা গুলি পাকাল। একটান দিয়ে আমি হুঁকোটা ঝেড়ে বুড়োর দুই পায়ের মধ্যে গুঁজে দিলাম। সে অলস ভঙ্গিতে গুলিটা তার মধ্যে পুরে নিল, ছাই ভাঙার জন্য চিলতেটায় হাল্কা চাপড় মেরে আবার সেটা ধরিয়ে ফেলল। বলল:

—'মাস্টার, কুকুরটাকে বোধহয় বেচেই দিচ্ছি।'

একগাল ধোঁয়া ছেড়ে আমি তার দিকে চোখ ফেরালাম। দা-কাটা তামাকে মদের মতো নেশা ধরায়। আমার চোখদুটোয় ইতিমধ্যেই তার ঘোর লেগেছে। ভদ্রতার খাতিরে তার দিকে তাকালাম, এমন ভাব দেখালাম যেন তার বক্তব্য মন দিয়ে শুনেছি। আসলে আমি মোটেই মন দিইনি। তার গপ্পো শুনিয়ে শুনিয়ে সে আমার কানের পোকা বার করে ছেড়েছে। তা ছাড়া, আমি তো জানি, সে বাতাসের সঙ্গে কথা বলে। তার কুকুর সে কোনদিন বেচবে না। আর যদিই বা বেচে, তাতে কী আসে যায়? এর জন্য সত্যি সত্যি হেদিয়ে মরার কী আছে?

একটা টান দিয়ে বুড়ো হুঁকোটা নামিয়ে রাখল। তারপব ধোঁয়া ছাড়ার জন্য দরজাব দিকে মুখ ফেবাল। মিঠে নেশা জমাতে হুঁকোর মতো আব কিছু নেই।

সন্তাব এই সামান্য মৌজটুকুকে তাবিফ কবতে বুড়ো নিঃশব্দে বসে বইল। আমিও একই বকম চুপচাপ বসে বইলাম। মনে মনে শুধু ভাবছি বইগুলোব কথা। সাইগনে যখন অসুখে পড়ি তখন আমাব প্রায় সবকিছুই বেচে দিয়েছিলাম। কিন্তু একখানা বই বেচাব কথা আমি মনেও কখনো স্থান দিইনি। গ্রামে যখন ফিবে আসি, তখন এক বাক্স বোঝাই শুধু বই-ই নিয়ে এসেছিলাম। আহা বে, আমার বইগুলো! প্রতিজ্ঞা কবেছিলাম, সারা জীবন ধরে আমি বইগুলো আগলে থাকবো। আমার ছাত্রজীবনেব, আমার উদ্দীপনাব, উচ্চাশাব সমস্ত স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখবো। পাতা খুললেই যেন চোখেব সামনে বিশ বছর বযসের আলো ঝলমল ছবিগুলো জীবন্ত হয়ে উঠতো কিন্তু লোকে বলে, জীবনে শুধু একবাবেব জন্যই দুঃখকষ্ট আসে না। একটা একটা করে আমার বাকি জিনিসপত্রগুলো বেচতে হয়েছিল। কয়েকখানা বইও বেচতে হয়েছিল। শেষপর্যন্ত মাত্র অবশিষ্ট ছিল পাঁচখানা। ঠিক কবেছিলাম, মরি আর বাঁচি, ও কখানাকে বাঁচাবোই। কিন্তু কিছুই তো হল না। একমাস আগে সেগুলোকে বেচে দিয়েছি। ছেলেটাব বাড়াবাড়ি ধবনের আমাশা হয়েছিল, আমাকে ওষুধ কিনতে হল · না। না, হাক বুড়ো। তুমি কি ভাবো, আমাদের যাই-ই থাক না কেন, তা ধবে রাখাব অধিকার আমাদের আছে?

বুড়ো হাকেব দিকে তাকিয়ে এই কথাই মনে মনে বলছিলাম। কিন্তু সে কী ভাবছে?

হঠাৎ সে বলে উঠল:

—'বুঝলে, মাস্টাব! এক বছব হয়ে গেল ছেলেটা কোন খবর দিল না।'

তা হলে সে তাব ছেলেব কথাই ভাবছিল। পাঁচ বছর আগে ছেলেটা রবার বাগানে চলে গেছে। আমি যখন গ্রামে আসি ঠিক সেই সময়ে তাব চুক্তিব মেয়াদ ফুবিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাব বাপ আমাকে যে চিঠিগুলো দেখিয়েছিল, তাব একখানা পরেই জানিয়েছিল, সে নতুন চুক্তি কবতে

চেয়েছে। বুড়ো হাক আমাকে আষাঢে গপ্পো ফেঁদে বোঝাবাব জন্য তৎপর হয়ে উঠল :

—'ছেলেটাই কুকুরটা কিনে রেখেছিল, তার বিযেব ভোজের জন্যে '

এই তো জীবনের নিয়ম। কখনো সফল হয় না, তবু মানুষের পরিকল্পনার অন্ত নেই। ওরা দুজনে খুব ভালবাসতো। মেযের বাপ মাও রাজী ছিল, কিন্তু খাঁকতি ছিল বেজায়· নগদ একশো পিযস্ত্র, সুপুবি আর মদের খরচ বাদে· সংক্ষেপে, বিয়েতে লাগবে দুশো পিয়স্ত্রব মতো। বুড়ো হাক এতো টাকা জোটাতে পারে নি। ছেলে বাগানটা বেচে দিতে চাপাচাপি কবেছিল। কিন্তু বুড়ো কিছুই কানে তোলেনি। বিযের জন্যে·বাগান বেচে কেউ কখনো দেখেছে? জমি একবার বেচে দিলে বৌ নিযে উঠতো কোথায? তারপর খুলে বলতে গেলে, বেচলেও তো তেমন বেশি কিছু পেতো না। বুড়ো অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মনে দাগা দিতে সাহস করে নি। তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। মাথা থেকে ওসব কিছু ঝেডে ফেলে আবও একটু অপেক্ষা করতে পীড়াপীড়ি করেছে।.. অন্য এমন কোন কন্যাপক্ষও তো মিলে যেতে পারে যাদের কম খাঁকতি হতে পারে। বলিস কী? গাঁয়ে কি মেযের অভাব? · ভগবান সহায়, ছেলেটা ছিল বুঝমন্ত, সে যুক্তি মেনে নিযেছিল, আর বেশি জেদাজেদি করে নি। কিন্তু তখন থেকেই ছেলেটা মনগোমড়া হয়ে গিয়েছিল। কেন, কীসের জন্য বুড়ো যে তা জানতো না তা নয। কিন্তু কী করা যাবে? সেই বছরেই অক্টোবর মাসে মেযেটার বিযে হয়ে গেল মোড়লের পেয়াদার ছেলের সঙ্গে, ওদের বেশ কিছু বিষয়সম্পত্তি আছে। এতে বুড়োব ছেলের মনে বড়ই লাগল। কয়েকদিন পর সে সদরে গিযে হাজির হল কুলিব আড়কাঠিতে। চাষের খাজনাব পরিচয-পত্র. ফেলে দিযে ববার বাগানের চুক্তি সই করল· ·

জলভরা চোখে বুড়ো আমাকে আরও বলে গেল। 'মাস্টার, চলে যাবার সময ও আমাকে তিনটে পিযস্ত্র্ দিযে গিযেছিল। আমাকে দিতে কত টাকা সে মাইনের আগাম নিয়েছিল তা জানিনে। বলতে কি তার কথাগুলো এখনো কানে বাজছে: 'বাবা, তোমাব হাত খরচেব জন্যে তিন পিযস্ত্র্ দিযে গেলাম। এখনও পর্যন্ত আমাকে তোমাব দবকাব হয় না, আমি শান্তিতেই যেতে পারবো। আমাদের জমিতে কাজ কবে, আরও দু চার

টাকা উপায় করতে মাঝেমধ্যে মুনিশ খেটে তুমি চালিযে নিতে পারবে। আমি কিন্তু কয়েক শো পিয়স্ত্র না-জমানো পর্যন্ত ফিরছি না। টাকা না থাকলে বড দুঃখ, এ গাঁয়ে কেউ ভাল চোখে দেখে না।' আমি শুধুই কেঁদেছিলাম। আর কী করতে পারি, বলো? ওরা ওর খাজনাব কাগজপত্র রেখে দিয়েছে, ফটো তুলে নিয়েছে, ওকে আগাম দিয়েছে। ও এখন ওদেব। ও আর আমার ছেলে নয়।

বেচাবী হাক বুড়ো। এতক্ষণে বুঝতে পাবলাম কেন সে তাব কুকুবটা বেচতে চায না। এই পশুটা তার পরম সান্ত্বনা। তার বৌ মরে গেছে, ছেলে বিদেশে, কোনো খবর দেয না। এ বয়সে এমন অবস্থায মন খাবাপ না-করে থাকা যায কি? দুর্ভাগ্যের মুহূর্তে একটা কুকুর একটা বন্ধুর কাজ কবে, সান্ত্বনা দেয। বুড়ো তার কুকুবকে ডাকে 'বাচ্চু ভাং', যেমন করে মা তার শিশুকে ডাকে। একটু সময় পেলেই তাব গায়ের আটালু বাছে, নযতো পুকুবে নিয়ে যায স্নান করাতে। বাটিতে কবে ভাত খাওযায, যেমন কবে বডলোকের বাডিতে খাওয়ায। সন্ধ্যার সময যখন-সে মদ খেতে বসে, কুকুবটা পাযেব কাছে বসে থাকে। মাঝেসাঝে তাকেও এক আঁজলা দেয। তারপর আদব মাখানো গলায ধমকাতে থাকে, তাকে প্রবাসী ছেলেব কথা শোনায যেন নিজের ছোট ছেলেকেই শোনাচ্ছে:

—'তাব কথা কি ভাবিস, বাচ্চু? কতদিন হযে গেল, আব খবর দেয না বোধহয তিন বছর হবে সে গেছে· তাবও বেশি। প্রায চার হবে। হ্যাঁ, অক্‌টোবরে চার বছব, বছরের শেষে ফিববে কিনা কে জানে? যদি ফিবে আসে, যদি বিয়ে করে, তোকে মারবে। সাবধান!'

মুখ তুলে কুকুরটা তাব দিকে তাকিয়ে থাকে, একটুও নডে না। বুড়ো তাব চোখেব মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে গলা চডায:

—'তোকে কাটবে! শুনছিস? তোর সব সারা হযে যাবে!'

প্রভু চটেছে বুঝতে পেরে আবার আদর কাডাবার জন্য প্রাণীটা লেজ নাডায, আব বুড়ো হাক আবও তর্জন করে:

—'ভাবি ফুর্তিতে আছিস? লেজ নাডাচ্ছিস? ও তোকে মাথায় বাডি দিযে মারবে, তবুও লেজ নাডাতে পারছিস? তোব আর কোনো আশা নেইরে!'

বিপদ বুঝতে পেরে কুকুবটা কেটে পড়ার-তাল খোঁজে। কিন্তু বুড়ো তাকে পাকড়াও করে। মাথাটা বুকে জড়িয়ে ধরে, পিঠ চাপড়ায়, গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়।

—'নাবে, না। তোকে কেউ কাটবে নাবে, বাচ্চু। ও খুব ভাল ছেলে। আমি তা হতেই দেব না তোকে আমার কাছে রেখে দেব।'

কুকুবটাকে ছেড়ে দিয়ে মদের বাটিটা ঠোঁটের কাছে তুলে নেয়। একটুক্ষণ কী যেন চিন্তা করে। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। অবশেষে বিড়বিড় কবে গুনতে সুরু কবে: তার ছেলেব বাগান থেকে যা আয় হয়েছে তাবই হিসাব করে।

ছেলেটা চলে যাবার পব বুড়ো আপন মনে বলতো: 'বাগান তো ছেলেব। বেঁচে থাকতে ওব মা খেটে খেটে মুখে বক্ত তুলেছে, ওটা কিনতে নিজে কত কষ্ট কবে থেকেছে। দাম পড়েছিল পঞ্চাশ পিয়স্ত্র, যখন জিনিসপত্তর এতো শস্তা ছিল তখনকার দিনেই অনেক টাকা মায়ের দিক থেকে কেনা বলেই বাগানটা ওবই। যখন ওটা বেচতে চাইল, আমি বাধা দিয়েছিলাম ওবই জন্যে, আমাব জন্যে নয়। মাথা গরম কবে ও গাঁ ছেড়ে চলে গেল, টাকাব অভাবে বৌ আনতে পাবল না। অনেক টাকা পয়সা না জমিয়ে কিছুতেই ও ফিববে না। আমি তো ওর বাগানে খাটি, ওব জন্যেই টাকা সবিয়ে বাখতে হবে, ফিবে আসবাব সময় যদি বেশি টাকা নাও থাকে, ওই টাকা ওর বিয়ের কাজে লাগবে। যদি খুব বড়লোকও হয়, ওটা ছোটখাটো পুঁজি হয়ে থাকতে পাববে।' আব যা সে ঠিক করেছিল, তাই আঁকড়ে বইল। পেট চালানোব জন্য সে অন্যের বাড়িতে মজুব খাটতে লাগল। বাগান থেকে যা আসে তা সে ছেলেব জন্য সবিয়ে রাখে। তার বিশ্বাস, ছেলেব আসাব আগেই বাগান থেকে একশো পিয়স্ত্র জমিয়ে ফেলবে

মাথাটা তুলে বুড়ো হাক আবও বলে চলল .

—'এখন অবশ্য আমাব হাতে একটা আধলাও নেই, মাস্টাব। একবার অসুখে পড়তেই এই অবস্থা। ভেবে দেখো তা হলে। দু মাস আঠাশ দিন, মাস্টার। দু মাস আঠাশ দিন এক আধলা কামাই নেই। তারপর আবাব ওষুধের দাম দিতে হবে, খেতে হবে তুমিই হিসেব করে দেখ।

বুড়ো হাক কোনোদিনই তার অবস্থা দাঁড় কবাতে পারেনি। একটু

পরিশ্রমসাধ্য কাজে সে অপটু। সুতোর অভাবে তাঁতিরা বেকাব বসে আছে। কাজ না থাকায় মেয়েরা হাল্কা কাজ নিয়ে কামড়াকামড়ি করে। বুড়োব কাজ মেলে না। সবকিছুব বাড়া, ঘূর্ণিঝড়ে তার সব চাষ নষ্ট কবে দিয়েছে, বাগান থেকে কিছুই পায়নি। চালেব দাম বেড়েই চলেছে। দৈনিক তিরিশ স্যু'ব চালে একটা বুড়ো আব একটা কুকুব পেট ভবেও খেতে পায় না

—'বুঝলে, মাস্টাব, বাচ্চু ভাংটা। ওটা খায় আমাব চেয়ে বেশি। কমপক্ষে দৈনিক পনরো থেকে কুড়ি স্যু। এমন চললে, ওকে খাইয়ে বাখাব টাকা কোথায় পাবো? যদি বোগা হয়ে যায়, তাহলে বিক্রি কবতে গেলে লোকসান হয়ে যাবে। এখন ও দিব্যি নাদুশ নুদুশ, যে কোনো দাম চাইলে মিলবে

সে থামল, জিভ দিয়ে টকাস কবে একটা শব্দ কবে বলল:

—'ওকে বেচতেই হবে। তাতে অনেক খর্চা বাঁচবে। ছেলেব তহবিলে হাত না দিয়ে একটা আধলাও আমাব আব খবচ কবার জো নেই। যদি বেশি নয়ছয় করি তো ওর সর্বনাশ কবে ফেলবো আমি। আমি এখন আব কোনো কাজের নই, মাস্টার।'

পরদিন বুড়ে হাক আমাব বাড়িতে দর্শন দিল। আমাকে দেখামাত্রই হাঁউমাঁউ কবে উঠল—'আমার বাচ্চুটাকে হারালাম মাস্টাব।'

—'ওটাকে বেচে দিলে?'

—'হ্যাঁ, ওবা এখুনি নিয়ে গেল।'

সে ব্যাপারটাকে সহজ কবে নেবার চেষ্টা কবল। কিন্তু তাব হাসিটাকে মনে হল একটা ভেংচি, দু'-চোখে জল। আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধবে তারই সঙ্গে কাঁদবো ভেবেছিলাম। আমাব শেষ পাঁচখানা বইয়ের জন্য আব তেমন দুঃখবোধ কবলাম না। তাব উপর বড়ই করুণা হল। যন্ত্রের মতো প্রশ্ন করলাম:

—'ও তা কবতে দিল?'

তার মুখের বেখাগুলো হঠাৎ কুঁকড়ে গেল। মাথাটা ঘাড়েব উপব ঝুঁকে পড়ল, শিশুব কান্নার মতো মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে বলে উঠল:

—'আমার নিকুচি কবি, মাস্টার। ও বুঝে উঠতে পারেনি। যখন শুনল

আমি ডাকছি, সঙ্গে সঙ্গে লেজ নাড়াতে নাড়াতে চলে এল। ওকে খেতে দিলাম। মুক্ ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, একেবারে ওব পেছনে; পেছনের পা দুটো ধবে এক ঝটকায় শূন্যে তুলে ফেলল। একটুক্ষণ পরেই জিয়েন চোখের নিমেষে বেঁধে ফেলল। ঠিক তখনই বেচাবা বুঝতে পারল তাব মরণ ঘনিযে এসেছে। জানই তো মাস্টার, ও ভাবি বুদ্ধিমান। কাতবাতে কাতরাতে আমার দিকে তাকিয়ে যেন আমাকে ধিক্কাব দিতে চাইল: 'ওরে, বুড়ো, তোব মন বলে কিছু নেই। তোব সঙ্গে এতদিন ঘব করলাম, আর তুই এই কাজ করলি'? দেখলে তো, কুকুবটা আমাকে এতো বিশ্বাস করতো, এই বযসে আমি তাব সঙ্গে মিথ্যাচাবণ কবলাম।'

আমি সান্ত্বনা দেবাব চেষ্টা কবলাম:

—'বিশ্বাস কবো, ও কিছুই বুঝতে পারেনি। আরে দূর, মানুষ কুকুর পোষে হয খাওযাব জন্যে, নযতো বেচাব জন্যে। ওকে যে মাববে, সে ওর ভাগ্য পাল্টাতে, পবজন্মে আর এক জীবন পেতেই তো সাহায্য করবে।'

বুড়ো হাক বিবসমুখে আমার কথায সায দিল:

—'ঠিক বলেছ, মাস্টাব। কুকুবেব জীবন সুন্দব নয। তাব নতুন জন্মের সুযোগ কবে দিলে, হয়ত পরের জন্মে মানুষ হযে জন্মাতেই সাহায্য করা হবে। তাহলে তো ওব কপালটা ভাল হযে যেতে পাবে· ধরো, এই যেমন ও আমাব মতো একটা মানুষেব জীবনকে জানতে তো পাববে।

বিষণ্ণ দৃষ্টিতে আমি ওর দিকে তাকালাম:

—'এই হচ্ছে আমাদেব সকলেব বিধিলিপি। তুমি কি ভাবো আমি বেশি সুখী?'

—'মানুষেব জীবনই যদি এমন হয, তাহলে কোন জন্তুর জীবন বেছে নেবো?'

সে এমন জোর কবে হেসে উঠল যে, খক খক করে কাশতে শুরু করল।·· তাব হাড জিবজিবে কাঁধে হাত বেখে মিষ্টি কবে বললাম:

—'সত্যিকাবেব ঈর্ষা কবাব মতো কোনো জীবনই নেই, তবু এসো, বলছি, সুখ কোথায মেলে। এই পাটাতনটাব ওপর বসো, আমি কযেকটা রাঙা আলু সেদ্ধ কবে আব এক কেটলি কড়া সবুজ চা করে আনছি, আমরা চা খাবো, রাঙা আলু খাবো, তারপব হুঁকো টানবো এই তো, এই তো সুখ।'

—'ঠিক বলেছ, মাস্টার। আমাদের তবু সুখী হতে হবে।'

মুখের ভাবে প্রসন্নতা আনতে সে ছোট্ট একটু হাসল। যদিও জোর করে হাসা, তবু তার মধ্যে তিক্ততা নেই।

—'তাতো বটেই, তাই না? এখন একটু স্থির হয়ে বসো তো, যতক্ষণ আমি রাঙা আলু আর চা পর্বে ব্যস্ত থাকি।'

—'কিছু মনে করো না, আমি রসিকতা করছি। এসব পরে অন্য সময় হবে।'

—'পরের জন্যে ফেলে রাখছ কেন? আনন্দকে কখনো আগামীকালের জন্যে মুলতুবি রাখা উচিৎ নয়। একটু বসো না। এখুনি আমি ফিরে আসছি।'

—'তা জানি। কিন্তু আমি মনে করেছিলাম, তোমাকে একটা কাজের অনুরোধ করবো।'

হঠাৎ সে গম্ভীর হয়ে গেল:

—'কি সেটা?'

—'বলতে একটু সময় লাগবে, মাস্টার।'

—'বলে ফেলো তাহলে।'

—'বেশ, বলছি, মাস্টার।'

সে বলতে শুরু করল। আস্তে আস্তে সে বলে চলল, খুঁটিনাটি একটাও বাদ দিল না। সংক্ষেপে, বুড়োর দুটো চিন্তা। প্রথম তার বাগান। বুড়ো হাক বুঝতে পেরেছে, তার বয়স হয়ে গেছে, ছেলেটা এখানে নেই। তাছাড়া ছেলেটা এমন সোজাসরল যে কেউ যদি তার বিষয়-আশয় না দেখে, তাহলে তার পক্ষে তা রাখা বড়ই কঠিন হবে। আমি জানিশুনি, আইনকানুন বুঝি ·· সে এসেছে অনুরোধ করতে, আমি যেন ছেলের হয়ে ওই তিন কাঠা জমি রেখে দিই। পাকা দলিলে সর্বস্বত্ব ত্যাগ করে বিক্রিকবলা লেখাপড়া করে দেবে। তার ছেলে যখন ফিরবে, আমি জমি আমার নামে রেখেই তাকে চাষের জন্য ফিরিয়ে দেবো দ্বিতীয় চিন্তা হচ্ছে, মরার পর তার সৎকার। সে বুঝতে পারছে খুবই কাহিল হয়ে পড়ছে, যে কোনো দিন মারা যেতে পারে। ছেলে যখন বাইরে, তখন কে তা নিয়ে মাথা ঘামাবে? সে একথা ভাবতেও পারে না যে তার সৎকারের ব্যবস্থা তার পড়শিরা করে দেবে। তার

কাছে এখনো পঁচিশ পিযস্ত্র আছে, কুকুব বেচে পাওযা আরও পাঁচ পিযস্ত্র আছে, তাতে হবে মোট তিরিশ পিয়স্ত্র, তার ইচ্ছে, তাব সৎকারেব আয়োজনের সেই টাকা আমাব কাছে রাখে। সে মাবা গেলে পডশিদেব তা দিতে হবে, আব তাদের বলতে হবে যে বাকিটা সে তাদেব কাছেই বেখে গেল

—'দূর দূব, অতো দূবের কথা ভেবে কী হবে।' আমি হেসে বললাম : 'আমাব তো মনে হয তুমি এখনো জোযান-মর্দ আছো। টাকাগুলো রেখে দাও পেট চালানোব জন্যে। পেটে যখন কিছু পডে না তখন কেউ টাকা বাঁচানোব চেষ্টা কবে, এ কেউ দেখেছে ?'

—'কিন্তু না, মাস্টাব। আমি সবই যদি খেযে ফেলি, তাহলে আমার সৎকাবেব ব্যবস্থাটা কী কবে হবে ?'

—'কেন বাগানটা ? ওটা বেচা যেতে পাবে '

—'তা ঠিক, কিন্তু জমি থেকে যা পেযেছি তাতো খরচ কবে ফেলেছি। ছেলেটা এখনো বিযে কবতে পাবে নি। তাব যদি বেশি টাকা না থাকে, সে যদি সম্পত্তি বেচাব কথা ভাবে ? তোমাব পাযে ধবছি মাস্টাব। বুড়ো মানুষকে দযা কবো, তোমার কাছে টাকাগুলো জমা বাখতে দাও।'

সে এতো পীডাপীডি করতে লাগল যে অবশেযে রাজী হলাম। তাকে এগিযে দিতে দিতে বললাম :

—'কিন্তু তুমি কী কবে বাঁচবে ?'

সে যেন সব জানে এমন ভাব দেখিযে জবাব দিল :

—'কিচ্ছু ভেবো না। সব ভেবে বেখেছি। সব ঠিক হযে যাবে।'

দেখতে পেলাম, কযেকদিন ধবে বাঙা আলু ছাডা সে আব কিছুই খেল না। শিগ্‌গিবই তাও আর সে জোটাতে পারল না। তখন যা পায তাই সে খেতে শুরু কবল। আজ কলাগাছেব থোড, কাল ডুমুব অথবা বুনো শাকসব্জি, তাব সঙ্গে সমযে অসমযে কিছু কচু-কন্দ, কিছু শামুক-গুগলি, আর কিছু ঝিনুক। আমাব স্ত্রীকে এসব বললাম, কিন্তু কিছুই শুনতে চাইলেন না :

—'মরুক, মবতে দাও। কেন এবকম হবে, অথচ সে টাকা বাঁচাবে ? এব জন্যে দাযী তো সে নিজে! তুমি টাকা কোথায পাবে ? কেউ তো আর এতো বডলোক নয·· আমাদেব ছেলেমেযেবও তো খিদে আছে ?···

হাযবে! চাবপাশে যাবা আছে, তাদেব যদি কেউ বুঝতে চেষ্টা না করে,

তাহলে তাদেব সব-সময়েই মূর্খ, নির্বোধ, পাজী, কৃপণ, ঘৃণ্য বলে মনে হয় · তারা কৃপাব যোগ্য নয় বলে আঙুল দিয়ে দেখাতে আমাদেব কত অজুহাতই না আছে। মানুষ কত করুণাব পাত্র—সেভাবে দেখা তো দূরেব কথা, আমবা তাদেবকেই জর্জরিত কবি। ··আমার স্ত্রী হৃদযহীনা নন, কিন্তু তিনি অনেক দুঃখ দেখেছেন। পাযে যার ব্যথা, সে তার পা নিয়েই মাথা ঘামায। মানুষ যখন বড বেশি বকমেব দুঃখ পায তখন অন্য কারুর কথা ভাবে না।

আমাব স্ত্রীব মনোভাবে আমি ব্যথা পেলাম। কিন্তু এ সম্পর্কে তাঁকে আর কিছু বলতে চাইলাম না। আমি গোপনে মাঝে মাঝে বুড়ো হাককে সাহায্য কবতে লাগলাম। কিন্তু মনে হল, সে আমাদেব পাবিবারিক মন কষাকষি বুঝতে পেবেছে। সে আমাব কাছ থেকে সাহায্য নিতে অস্বীকার কবল। অস্বীকাব কবাব ভঙ্গিটা প্রাব ঔদ্ধত্যেব পর্যাযেব। আমাকে সে আরও বেশি বেশি এডিযে যেতে লাগল।

মনে মনে ভাবলাম, বুড়ো হাক আমাকে ভুল বুঝছে। আমাব মনটা ভেঙে গেল। গবীবদেব প্রাযই বেশি বকমেব আত্মপ্রেম থাকে, তাবা অকারণে নিজেদের পীডিত করে। তাদের স্পর্শকাতবতাকে আঘাত না করে থাকাটা বডই কঠিন। · একদিন আমার মনের এই কথাগুলো বলে ফেললাম আমাব পডশি থু'কে। বুড়ো সেপাইটা চুবিচামারি কবে পেট চালায়, বুড়ো হাকেব সঙ্গে তার সদ্ভাব নেই। শুনে থু মুখ বেঁকাল, আমাকে খোঁচা দিযে বলল :

—'একটা ভাঁড। বাইরে ভদ্দর, ভেতরে খচ্চর। আমার কাছে এসেছিল কুকুব মাবা বিষ চাইতে ’

কথা শুনে আমাব হাতদুটো যেন ঝুলে পডল। গলা নামিযে থু আরও বলল :

—'আমাকে বলল, একটা কুকুব তার বাগানেব চাবপাশে ঘুরঘুব করে। আমি তাকে খাওযাবো। যদি কাজ হাসিল কবতে পাবি, তাহলে তুমি আমার সঙ্গে বসে এক ভাঁড মদ খাবে ।'

বেচাবী বুড়ো হাক। তাব মতো লোকও এতো নিচে নামল। কুকুরের সঙ্গে মিথ্যাচাবণ কবেছে বলে যে মানুষ কাঁদে, পডশিব ঘাডেব বোঝা না হবাব জন্য নিজের সৎকাবেব টাকা জমাতে যে নিজে না খেযে থাকে কেমন

করে সে থু'ব পর্যায়ে নেমে যেতে পাবল? জীবনে সত্যিই আশা করার কিছু নেই…

না, অবশ্যই না। আশা ছাড়া জীবন নেই, অথবা যদি থাকে তবে তা অন্য অর্থে। থুর বাড়ি থেকে সবে ফিরেছি এমন সময় শুনতে পেলাম বুড়োব বাড়িতে বিবাট হৈ চৈ। আমি ছুটে গেলাম। অন্য পড়শিরাও ততক্ষণে সেখানে এসে পৌঁছেচে। বিছানার উপর বুড়ো হাক ধড়ফড় করছে, চুল এলোমেলো, চোখ ঠিকবে বেরিয়ে আসছে, জামাকাপড় ছিঁড়ে ফালি ফালি হয়ে গেছে। খিঁচুনিতে ওলটপালট খেতে খেতে সে চিৎকার করছে, থুথু ছিটোচ্ছে। বাগে আনার জন্য দুই জোয়ানমর্দ তাব উপব চেপে বসেছে মরার আগে এই রকম যে লড়ালড়ি চলল তা পুবো দু ঘণ্টার কম হবে না। সত্যিই এক ভয়াবহ মৃত্যু যার কাবণ আমি আর থু ছাড়া অন্য সকলেব কাছেই গোপন বয়ে গেল। কিন্তু গোপন রহস্য বলে কী হবে? বুড়ো হাক, শান্তিতে বিশ্রাম কবো। তোমার বাগানেব জন্য ভেবো না। আমি তোমার জামিন রইলাম। তোমার ছেলে যখন ফিবে আসবে, আমি তাকে ফিবিয়ে দিয়ে বলবো: 'জমিটা তুমি যাতে রাখতে পারো তোমার বাবা এইটুকু করে গেছে, বরং মরবে, তবু এর এক কাঠাও বেচবে না—এই সে বেছে নিয়েছিল

ফবাসী থেকে অনুবাদ—অবন্তীকুমার সান্যাল

কুস্তি

বিজনকুমার ঘোষ

সুবল হঠাৎ বেকার হয়ে গেল। আগে সংসারের কর্ত্রী ছিলেন মা। মা গত ফাল্গুনে মারা যাওয়ায় সংসারের দায়-দায়িত্ব এখন বৌদির হাতে। তাই খববটা সে চেপে গেল। মাত্র তিন দিন বেকাব হযেছে, এব মধ্যেই নিজেব বাড়িতে সব বকম গুরুত্ব হারিয়ে ফেলুক এটা চায না। কিন্তু এখন একটা কাজ, পিওন বেযাবা যাই হোক, একান্তই দরকার। তা হলে বৌদি কিছু বুঝে উঠবার আগেই সে হাত নেড়ে বলতে পারবে, ছেড়ে দিলাম বৌদি, একেবারে ছ্যাচড়া কোম্পানি, এটা কত ভাল, কাজ দেখাতে পারলে উন্নতি, তুই মাসের বোনাস—

সুবল খুব মুসড়ে পড়ল। আগে মাস গেলে পঁয়ত্রিশ টাকা বাড়িতে দিযেছে। হাত খরচের জন্যেও কিছু থাকত। বিযে থা কবে নি। মাঝে মধ্যে এক আধটা জামা, সপ্তাহে একদিন দশ আনা লাইনেব সিনেমা ওর বাঁধা ছিল। বিড়ি খেলে কাশি হত বলে পরম সুখে সিগাবেটে টান দিয়েছে গত তু' মাস। এখন সব বববাদ হযে গেল।

কযেক জাযগায হাঁটাহাঁটি করল। খবরেব কাগজে কর্মখালির ওপর চোখ বোলাল। চেনাজানা বন্ধুদের বলল, দেখিস ভাই যে কোন একটা কাজ, দিন আব চলে না—। কিন্তু আঠার দিন হয়ে গেল কোথা থেকে একটু আশাও দেখতে পেল না। এখন সব জায়গাতেই মন্দা চলছে। অফ সিজন। স্কুল কলেজের বই বা গল্প উপন্যাস ছাপা বন্ধ। মালিকরা নতুন

করে লোক নিতে চাইছে না। আব এ চাকবীব ওপব ঘেন্না ধবে গেছে স্ববলের। পার্মানেণ্ট বলে কোন কথা নেই এখানে। সাত আট বছব কাজের পবেও যে কোন অজুহাতে দিব্যি চাকবী যেতে পাবে। তবু এখানে আড়াই বছব ছিল স্ববল। সেটাও নাকি একটা লাক। ইতিমধ্যে বৌদিও একটু আঁচ কবে ফেলেছে।—কি গো ঠাকুব পো, এমন মুখ শুকনো কবে ঘুবে বেড়াও বলি অফিসে কিছু হযেছে নাকি ?

বিপদে পড়লে মানুষেব বুদ্ধি নানান দিকে খুলে যায। ঘটনাটা ঘটেছিল মাস তিনেক আগে। হাতেব কালি সাবান দিযে ধুযে একটা সিগাবেট ধবিযে অফিস থেকে যখন বেবিযে আসছিল, হঠাৎ এক ভদ্রলোক আচমকা জিজ্ঞাসা কবেছিলেন, আপনি কি এল আই সিতে চাকবী কবেন ?

—না তো, সবলা প্রেসে।

—আবে ওই প্রেসে তো আমি প্রাযই যাই। আমাদেব হাইস্কুলেব কোশ্চেন পেপাব ছাপা হয। আপনাব কাছে-আট আনা পযসা হবে ?

—খুচবো নেই। একটা টাকা হতে পাবে।—স্ববল বলল।

—তাই দিন। আমি কালই আপনাব অফিসে দিযে আসব। বাড়ি যেতে পাবছি না, বাড়ি সেই কাঁকিনাড়া—। সবলা প্রেসে আপনি কোথায বসেন ?

—আমি কম্পোজিং-এ আছি।

—কোন ট্রেনিং নিযেছেন ? এই তো আপনাবা ভুল কবেন। ম্যাট্রিক পাশ আছেন, যাদবপুব প্রিন্টিং টেকনোলজিতে গিযে ভর্তি হোন না। এক বছবেব কোর্স।

—চাকবী করে সময পাই না—

—কেন পাবেন না ? সন্ধ্যাব পব নতুন সেসন খুলেছে ওরা। সবলা প্রেস কতই বা দিতে পাবে। আপনি লাইনোটা শিখে নিতে পাবেন তো যে কোন জাযগায ভাল গ্রেড পেযে যাবেন। আচ্ছা নমস্কাব—

এবপব ভদ্রলোক আব এক মুহূর্ত দাঁড়ান নি। অফিস ফেবৎ স্রোতেব মধ্যে মিশে গিযেছিলেন। বলা বাহুল্য অফিসে গিযে স্ববলকে তিনি টাকাটা ফেবৎ দেন নি। অবশ্য স্ববল সে জন্যে খুব বেশি বিচলিত নয। আসলে সে চিন্তিত সম্পূর্ণ অপবিচিত মানুষকে কোন বকম চিন্তা না কবে একটা টাকা

দিযে দিতে পাবল ? সবলা প্রেসে বা বন্ধুদেব মধ্যে সে কৃপণ নামে পবিচিত। কিন্তু স্থবল নিজে জানে সে কৃপণ নয। ববং বলা যায মিতব্যযী। দশ আনার ওপরে কখনো সিনেমায যায নি। ট্রামে সর্বদা সেকেণ্ড ক্লাশে চডে। এ সব ব্যাপাবে বেশি পযসা খবচ কবলেও ফল একই পাওযা যায। তা ছাডা কলকাতা শহবে এক ধবনেব হাঁসমার্কা বন্ধু থাকে, দেখা হলেই যাবা বলে, খাওযা মাইবি। তাদেব একদম পাত্তা দেয না স্থবল। কখনো বলে, পকেটে পযসা নেই, কখনো বলে, ধাবে কর্জে ফতুব হযে গেলাম—। এখন সেই বন্ধুবা যদি কৃপণ বলে তা হলে স্থবিধে বই অস্থবিধে কিছু নেই। জীবনে একটা পযসা ভিক্ষে দেয নি কাউকে। স্থবল মনে কবে এতে ভিক্ষাবৃত্তিতে প্রশ্রয দেওযা হয। ওদের উন্নতি কবতে হলে চাই সমাজব্যবস্থাব পবিবর্তন। সেটা স্থবলেব কর্ম নয। সকালে যদি কোন গতিকে দু' কাপ চা খাওযা হয তা হলে বিকেলে খায না। বেশি চা খাওযা পেটেব পক্ষে খাবাপ। আজকাল সিগাবেট ধবেছে বটে কিন্তু পবিমাণটা এমন বেখেছে যাতে বিডির চেযে বেশি পযসা খবচ না হয। যাই হোক, স্থবল এখন আত্মবিশ্লেষণ কবতে বসল। যদিও জানে এই কলকাতায কি ভাবে ফাঁকি দিযে অপবেব পকেট কাটতে পাববে এব জন্যে একদল লোক দিবাবাত্র সচেষ্ট। ভাবতে ভাবতে পবপব কতগুলি কাবণ বেবিযে পডল। প্রথমত, ভদ্রলোক স্থপুরুষ। জামাকাপড ফিটফাট। কামানো দাডি। দ্বিতীযত, চাওযাব মধ্যে কোন হীনমন্যতা নেই। দু' একটা কথাব পবেই চেযে বসলেন। লোকে যেমন দেশলাই চেযে সিগাবেট ধবায। তৃতীযত, কৃতকার্য হবাব পবে ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে একটি উপদেশ। এতে যেমন নিজেকে বিজ্ঞ দেখায তেমনি দাতাব মনে সন্দেহেব ছাযাপাত ঘটায না। কিন্তু এই ভদ্রলোকই যদি ইনিযে বিনিযে ভিক্ষেব স্থবে মাত্র দু' আনা পযসা চাইতেন তাহলে যে কেউ মুখ ফিবিযে নিত। অথচ নিপুণ ত্রিমুখী-সাঁডাশী আক্রমণে স্থবল বাবাজী কাৎ। অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব! এখন স্থবল চিন্তা কবতে বসল, অথবা যা মনেই আসে নি, কিম্বা অবচেতনেব তলায ভ্রূণেব মত ছিল, অনুকূল পবিবেশে ধীবে ধীবে উঠে এল—চিন্তা কবল, শেষকালে ভদ্রলোকের পেশাই ধববে কি না। স্থবলেব চেহাবা ভালই। বোজ দাডি কামালে, ধোপদুবস্ত জামাকাপড পবলে জামাই জামাই দেখায। স্থতবাং এ হেন স্থবল যদি মুখে একটা হঠাৎ-বিপদে-পডা ভাব ফুটিযে কিছু

বলে তা হলে লোকের বিশ্বাস হবার নব্বুই পারসেন্ট চান্স। দু' একজন হয়ত অবিশ্বাস করবে। নাক সিঁটকে বলবে, যত্তোসব—। কিন্তু তাতে দমে গেলে চলবে না। নিজের মনেই যুক্তি খাড়া করে, কলকাতা শহরের লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র কয়েকজন যদি সুবলকে খারাপ ভাবে তাতে কি আসে যায়। আর এসব কথা কেউ বেশি দিন মনেও রাখে না। যে ভদ্রলোক সেদিন একটা টাকা জক্ দিয়েছিলেন তার কথা সুবল কযবার ভেবেছে? নেহাৎ বিপদে পড়েছে বলেই না এত কথা মনে এল। যাই হোক, সেই ভদ্রলোকের ওপর সুবল পুরো কৃতজ্ঞ। তিনিই এ পথটা বাতলে দিলেন। এতে যে একটা টাকা গচ্চা গেল সেটা ফালতু নয। গুরুদক্ষিণা। তবে সুবলের হারামজাদা বিবেক বলে, এই কাজটা নাকি আত্মমর্যাদাকর নয। আত্মমর্যাদা ধুয়ে জল খাবে নাকি? শালা বিবেক একটা পযসা ধার দেবার নামে নেই, যে কোন কাজে বাগড়া দেবার গোঁসাই। একবার সবলা প্রেসের ম্যানেজার মাইনে দেবার সময় দশটা টাকা বেশি দিযে ফেলেছিল। পরে হিসেব মেলেনি। সবাইকে ধরে ধরে জিজ্ঞাসা। সুবল ব্যাপারটা তখন চেপে যায়। পরে হারামজাদা বিবেকের সে কি কামড়ানি, ছটফটানি। সুবল কিম্বা ওর এত বড় শরীরটা কেউ না, আসল মাতব্বর হল বিবেক। শেষে প্রেসের এক সহকর্মীর মেযের বিয়েতে টাকাটা দিযে সে হাফ ছাড়ে। ঠিক আছে, চিরদিনই সুবল অপরকে জক্ দিযে যাবে না। এর মধ্যে একটা কাজটাজ জুটে যেতেও পারে। কিম্বা হাতে কিছু জমলে তাই দিযে ছোটখাট দোকান দেবে। পান বিড়ি, কি তেলেভাজার।

একটু সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠল সুবল। নতুন ব্লেড দিয়ে দাড়ি কামাল। তেল মেখে কাঁধে গামছা ফেলে রাস্তায় এসে দেখল কলে বেশ ভিড়। তবু ভোলাকে দুই ধমক, হাবাণের মাকে অনুনয, শিবুদার সঙ্গে একটু পলিটিক্স আলোচনার ছলে নিজের কাজটা গুছিযে নিল। আগের দিনে ধুতিখানা আর টুইলের সার্টটা কেচে মাড় দিযে রেখেছিল। পাশের ঘর থেকে ইস্তিরিটা চেয়ে নিয়ে এল। চাযের কাপটা রাখতে রাখতে বৌদি ফোড়ন কাটল, কিগো ঠাকুর পো, অফিসের ওপর বেজায় ভক্তি দেখছি, মাইনে বাড়ল নাকি?—চমকে উঠল সুবল। মাস কাবার হতে

এখনো দিন সাতেক বাকি। এবার বৌদির খাতে পঁয়ত্রিশ টাকা গুঁজে দিতে পারবে না। বৌদি হেসে দুটো কথা কিম্বা চায়ের কাপটা পাশে নামিয়ে রাখবে না। সরলা প্রেসে ঢোকার আগে কিছু দিন বেকার ছিল। তখন হাড়ে হাড়ে প্রমাণ পেয়েছে। মনটার মধ্যে খচ্ করে কাঁটা ফুটল। সুবল বেকার হয়েছে নিজের দোষে নয়। চাকরির চেষ্টাও আপ্রাণ করছে। তবু যে কেন নিজেদের লোকেরা এমন ব্যবহার করে। পাড়ায় কিছুদিন আগে নতুন একটা হোটেল খুলেছিল। সে কি মাইকের গান ওপেনিং ডে-তে। ধুমধাম করে গণেশপুজো। যে গেছে তাকেই খাবারের প্যাকেট। ঘরের কোণায় লক্ষীর আসন পাতা। সুবল অনেকক্ষণ ধরে সেখানে প্রণাম করল। দাদা কাজে বেরিয়ে গেছে। বৌদিকে প্রণাম করতে ইচ্ছে হল না। মা থাকলে বলত, দুর্গা দুর্গা—

অফিস টাইমে বাসে বেজায় ভিড়। সুবল হাতলটা ধরে ডান পাটা পাদানীতে কোন রকমে ঠেকিয়ে এসপ্লানেডে চলে এল। এখানে প্রতি পাঁচ মিনিটে ট্রাম বাস ট্যাক্সি থেকে অন্তত দশ হাজার লোক নামে। সুতরাং কাজ হাসিল করবার পক্ষে এ জায়গাটাই প্রশস্ত। তবে এক জায়গায় বেশি দিন ব্যবসা চালানো ঠিক হবে না। শ্যামবাজার হাতিবাগান খিদিরপুর রাসবিহারী গড়িয়াহাটা—এই ভাবে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে। অফিস টাইমে যাতায়াত করাই সবচেয়ে ভাল। বাসে ভাড়া লাগে না। পয়সা দেব দেব ভাব করতে করতে ঠিক স্টপেজ চলে আসে। যারা রোজ ক্যানিং লক্ষীকান্তপুর থেকে ছোট ছোট থলিতে চাল এনে ব্ল্যাক করে তারা কখনো টিকিট কাটে না। ওদেরই একজন সুবলকে বলেছিল, টিকিট কাটলে বাবু পরতা খরচ পোষায় না—

গলা খাঁখারি দিল সুবল। একজন ভদ্রলোক আসছেন। এগিয়ে যাবে কি? প্যান্ট কোট পরা। যদি মাদ্রাজী হয়? তাহলে তো মনের কথাটা গুছিয়ে বলতে পারবে না। যাক গে, লোকের অভাব কি। আরেকজন আসছেন হন্তদন্ত হয়ে। ধুতিপাঞ্জাবি। নিশ্চয়ই বাঙালী। রেডি হতে গিয়ে সুবলের পা' দুটো কাঁপতে লাগল। এক চুলও এগোতে পারল না। শেষে হতাশ হয়ে দেখল ভদ্রলোক রাস্তা পার হয়ে গেলেন। আরেক জন আসছেন। সুবলের দিকেই। অল্প বয়সী। এবার একটুও দেরি করল না।

—শুনুন ?

—আমাকে বলছেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি ব্যাপাব বলুন।

—আজ্ঞে আমি—আমি বালিগঞ্জ যাব—

—ওই তো চব্বিশ নম্বব ট্রাম, চলে যান।

যে রকম প্রশ্ন সে বকম উত্তব। বিবক্তিতে সুবলের চুল ছিঁডতে ইচ্ছে হল। যত সহজ মনে কবেছিল আসলে কাজটা তত সহজ নয। সুবল কযেক পা' এগিযে কার্জন পার্কেব সবুজ ঘাসে এসে বসল। এই টুকুতেই মনে হল অনেক পরিশ্রম হযেছে। একটু দম নেওযা যাক। বিনা মূলধনেব ব্যবসাযে একটু বেশি পবিশ্রম হয। নিজেকে সান্ত্বনা দিল। ওই ভদ্রলোকও কি পযলা দফাতেই সুবলকে ঘাযেল কবতে পেবেছিলেন? নিশ্চযই তাকেও অনেকবাব আগুপিছু করতে হযেছে। লজ্জা সংকোচ ভয এসব কাটিযে না উঠতে পাবলে এ লাইনে উন্নতি অসম্ভব। মেযেদেব কাছে গেলে কেমন হয ? ভাবল সুবল। কিন্তু বৌদির কথা মনে পডায বেশি উৎসাহ বোধ কবল না। তাব চেযে ছেলেছোকবাদেব ওপব নজব বাখলে আয দেবে। ওদেব মন-মেজাজ ভাল থাকে। যেমন সুবলেব একদা ছিল।

—এই যে দাদা শুনুন—

—আমাকে কিছু বলছেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—সুবল তাডাতাডি উঠে কাছে গেল : আপনাব কাছে আট আনা পযসা হবে? আমাব বাডি সেই বাবাসত। পযসা ফুবিযে গেছে—

ভদ্রলোক চট কবে পকেট থেকে মাণিব্যাগটা তুললেন। খুচবো বলতে কযেকটা নযা পযসা অবশিষ্ট আছে। সেবাবের মতই অবস্থা। সুবলের বুক ধুকধুক কবছে উত্তেজনায। শেষে একটা টাকাই দিযে দিলেন।

—আপনি কোন্ অফিসে চাকবি কবেন ?

—সার্ভে অব ইণ্ডিযা।

—ওই অফিসে তো আমি প্রাযই যাই। আপনাকে কালই টাকাটা দিয়ে আসব।

—প্রাযই যান ?—ভদ্রলোকেব ভুরু কুঁচকে উঠল : কোন্ বাস্তায বলুন তো ?

সুবল প্রমাদ গুণল—ধর্মতলা ষ্ট্রীট।

—খুব চিনেছেন। এবাব বাবাসাত যান দেখি।

টুইলেব সার্টেব তলায বেখায বেখায় ঘাম নামতে লাগল। এটা ডিসেম্বব মাস। কিন্তু বউনি ভাল হওযায এ সম্পর্কে বেশি চিন্তা কবাব অবসব পেল না। ততক্ষণে আরেকজনেব কাছে এগিযে গেছে। সুবল এবাব আট আনা পযসাই পেল। ভদ্রলোকেব অফিস জেনে এবং সেখানে গিযে ফেবৎ দেবাব প্রতিশ্রুতি দিযেও সম্পূর্ণ তৃপ্তি হল না। ফস কবে জিজ্ঞাসা কবে বসল, আপনি বি. এ. পবীক্ষাটা দিযেছেন তো ?

—তাব মানে ?—ভদ্রলোক ঘুরে দাঁডালেন : কি বলতে চান আপনি ?

গলা শুকিযে গেল—মানে তাহলে আপনাব উন্নতি হত—

—পযসা তো পেযেই গেছেন, অত ফালতু কথাব দরকাব কি ?

সুবলেব চোখেব কোণ একটু ভিজে গিযে সমস্ত ব্যাপাবটাব ওপবেই ঘেন্না ধবাব উপক্রম হল। আশ্চর্য, ভাল কথা বলতে গেলেও এবা চটে যায। সেই ভদ্রলোক'ও তো সুবলেব কাছ থেকে একটা টাকা নিযে যাদবপুব প্রিন্টিং টেকনোলজিতে ভর্তি হতে উপদেশ দিযেছিলেন। কই, সুবল তো তেডে যায নি ? বড বাডিটাব ঘডিব দিকে তাকিযে দেখল প্রায তিনটে বাজে। আজ আব লোকের কাছে যেতে ইচ্ছে কবল না। পাঁচ মিনিটে দেড টাকা ইনকাম। সবলা প্রেসে পেত সত্তব টাকা। দিনে দু' টাকা তেত্রিশ পযসা। সাডে আট ঘণ্টা ডিউটি। সিসেব অক্ষব বাছতে বাছতে আঙ্গুলেব মাথাগুলি জ্বালা কবত। নোংবা আব অন্ধকাব ঘর। চব্বিশ ঘণ্টা কপালেব ওপব যাট পাওযাবেব বাল্ব জ্বলছে। শালাব ম্যানেজাব পাঁচ মিনিট লেট হলে চাকবি যাওযাব ভয দেখাত। আব এখানে কার্জন পার্কেব সবুজ ঘাসে দাঁডিযে খোলা বাতাসেব মধ্যে পাঁচ মিনিটে দেড টাকা। ওই দু'জন ভদ্রলোকের ওপব খুব বেশি দুঃখিত হতে পাবল না সুবল। গরু দুধ দিলে তাব লাথিও একটু খেতে হয। শালার ম্যানেজাব এব চাইতে ঢেব বিষ মিশিযে বচন ঝাডত।

কাঠেব পোল পেবিযে সেণ্ট্রাল রোড ধবে চেতলা পার্কেব কাছে এল

স্ববল। পার্কের গায়ে তেলেভাজার দোকান। দেখা মাত্রই খিদে লাগল। অন্তরঙ্গ হবার আশায় ডালার সামনে ফুটপাথের ওপর উবু হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করল, ব্যবসাপত্তর কেমন চলছে কর্তা?

—ব্যবসা পত্তর? এই জনমে আর ভাল হইব না কইয়া থুইলাম।—কর্তা বিবস মুখে ব্যসন ফেটাতে ব্যস্ত।

—কেন, বিক্রী হচ্ছে না?

—বিক্রী হইব না ক্যান! কিন্তুক স্বমুদ্ধির পুতেরা আমার লগে লগে কয়খান দোকান দিছে ভাখছেন?—স্ববল কর্তার চোখ বরাবর রাস্তার পাশে এবং ওপারে তাকাল। অনেকগুলি তেলেভাজার দোকান।—আগে চ্যাতলা পার্কে আমারই দোকান আছিল। আপনাগো আশীর্বাদে বেইচা ঘরে কিছু পয়সা উঠাইতাম। অখনে হগল গেছে—

স্ববল চার আনার আলুর চপ বসে বসে ধ্বংস করল। বৌদির জন্যেও কিছু কিনল।

—আমি আপনার পুরোন খদ্দেব। জিনিস ভাল হলে লোকে আপনার কাছেই আসবে।—স্ববল সান্ত্বনা দিল।

—আর আইছে! করপোরেশন থিকা ধইরা নিযা গেছিল না সেদিন। ত্যালেভাজা খাইলে নাকি কলেরা হয। পাঁচ টাকা ফাইন।—ফেটানো ব্যসন ফুটন্ত তেলেব মধ্যে ছাডতে ছাডতে কর্তা স্বগতোক্তি কবল, উপাস কইরা মবণেব দিন আইছে—

বাডিব দিকে যেতে যেতে ভাবল, কোন দিকেই শান্তি নেই। কোন্ দিকে যাবে এরপব? চুপি চুপি বিবেককে এই কথাটা জানিযে একটু স্বস্তি পেল।

•

যাই হোক, স্ববল ব্যবসাটা সডগড করে নিযেছে। লোকেব কাছে বলতে গিযে আজকাল থতমত খায না। আসল কথাটা স্পষ্ট ভাষায় বলে ফেলে। এতে যে সবাই সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ হযে মানিব্যাগে হাত দেয, তা নয। বেশীর ভাগই এডিযে যায। দু' একটা মন্তব্যও কানে আসে।—কত দিন এমনি কবে চলবে? কিম্বা, ভিক্ষে চাওয়ার বেডে ফন্দী করেছে! আগে আগে এ ধবনের কথা শুনলে মন খারাপ হযে যেত। বোকার মত তাডাতাডি

বাড়ি ফিরে আসত। এখন কিচ্ছু হয় না। সারাদিনে মাত্র ছয় সাত জন সুবলের কথায় বিশ্বাস করে। গড়েব মাঠে এক ভদ্রলোক সেদিন দারুণ মুড়ে ছিলেন।—ফুঃ, আট আনা পয়সায় কি হবে? এই নিন পাঁচ টাকা। কিন্তু আমার ঘোড়াকে ভক্তিশ্রদ্ধা করতে হবে—মাইরী বলছি। বৌদি বলে, রোজ রোজ তেলেভাজা আনছ, মাইনে বাড়ল নাকি ঠাকুরপো? 'রূপায়ণে' কিন্তু ভাল বই এসেছে। সুবল কিছু উত্তর দেয় না। মুচকি মুচকি হাসে।

ব্যবসা যখন তুঙ্গে সুবল সে সময় ভাবল, আট আনা পয়সাটা নিজের কানেই বড় একঘেঁয়ে শোনাচ্ছে। বারাসত যাবার রেট একটু বাড়িয়ে দিলে হয় না? বারো আনা, কি এক টাকা? আজকাল তো জিনিসপত্রের দাম হু-হু করে বাড়ছে। ঠিক তখনি ব্যাপারটা ঘটল। রাসবিহারীর মোড়ে সবে ডিউটিতে এসেছে। বেলা প্রায় দশটা হবে। হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে এক সুন্দরপানা ভদ্রলোককে কিছু বলতেই তিনি হঠাৎ খাপ্পা হয়ে উঠলেন।—শালা আজো তোমার বারাসত যাওয়া হয়নি, বলেই সুবলের কলারটা ধরে মুখের ওপর এক ঘুষি বসিয়ে দিলেন। সুবল হাউমাউ করে উঠল। মুহূর্তে চারপাশে ভিড় জমে গেল। ভদ্রলোক চিৎকার শুরু করলেন, মশাই এক মাস আগে এই লোকটাই শ্যামবাজারের মোড়ে বলেছিল বারাসত যেতে পারছি না, আট আনা দিন। সরল বিশ্বাসে দিয়েছিলাম। আজ আবার বলছে বারাসত যেতে পারছি না, বারো আনা দিন। দেখুন মশাই, আপনারাই বিচার করুন। এরা সমাজের শত্রু। চেহারাটি তো নধরকান্তি! বলি কাজ করে খেতে পার না? কাজ না জোটে আমার বাড়ি এসো, বুঝলে ছোকরা?—একটা জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে কলারটা ছেড়ে দিতেই সুবল বসে পড়ল।

এরপর তিন দিন রাস্তায় একদম বেরোতে পারল না সুবল। বৌদিকে বলল, ছুটি নিয়েছি। এই তিন দিন একলা পেয়ে বিবেকও প্রচণ্ড গুরু-মশায়গিরি আরম্ভ করল: ছি ছি! এই কি জীবন। এই কি মানুষের মত বাঁচা। তোমাকে আগেই বলেছি। আমার কথা শুনলে না। ঠিক আছে তেলেভাজায় কম লাভ, পানবিড়ির দোকান দাও। নাহলে কুলিগিরি

কর, রিকশাও টানতে পার। এতে লজ্জার কিছু নেই। যদি তাতেও না পোষায় তাহলে—তাহলে যাও না কেন সেই ভদ্রলোকের কাছেই। ঠিকানাটা মনে আছে তো? সতেরোর দুই ল্যান্সডাউন রোড। তোমাকে ঘুষি মেরেছিলেন। নিশ্চয়ই অনুশোচনা হচ্ছে এখন। তারা বড় মানুষ। দিয়েও দিতে পারেন একটা কাজ। ইত্যাদি।

সুবল যদিও ক্লাশ নাইন পর্যন্ত পড়েছে তাই বলে বাবু হয়ে যায়নি। দরকার হলে কুলিগিরি, রিকশাও টানতে পারে. কিন্তু বিবেক জানে না, সে পথও বন্ধ। কিছু দিন আগে শিয়ালদহে রেজিস্টার্ড কুলিদের সঙ্গে বাইরের উঠ্‌কো কুলিদের জোর মারপিট হয়ে গেছে। আর এ-ও জানে, কোন রিকশার মালিকই সুবলকে দিয়ে ভাড়া খাটাবে না। ওরা অবাঙালীই পছন্দ করে বেশী। বিবেক তো উপদেশ দিয়ে খালাস। পান বিড়ির দোকান দিতে হলেও নগদ কিছু চাই। তবে বিবেকের শেষের উপদেশটাই একটু কাজের মনে হল। তারা বড় মানুষ। যদিও এই তিন দিন ধরেই সুবল ভাবছে, ব্যাটাকে চেতলায় পেলে হয়, গদাই বিশে ষষ্ঠিকে দিয়ে এমন ধোলাই লাগাবে যেন ছটি মাস শুয়ে থাকতে হয় বাছাধনকে।

খুব ভোর বেলাতেই গায়ে একখানা চাদর ফেলে সুবল হাজির হল সতেরোর দুই ল্যান্সডাউন রোডে। মস্তবড় লাল রঙের বাড়ি। বাগান। গেটে কুকুর সম্পর্কে সাবধান-বাণী। এক ধারে চষা মাটির ওপর দুই পালোয়ান কুস্তি লড়ছে। দেখেশুনে সুবলের শীত ভয়ানক বেড়ে গেল। গেটের সামনে কি করবে বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ সেই ভদ্রলোকের সঙ্গেই চোখাচোখি। উনি সিল্কের আলখাল্লা পরে বাগানে পায়চারী করছিলেন। সুবলকে দেখে দ্রুত গেটের দিকে এলেন।

—কি চাই?

—আজ্ঞে আমাকে আসতে বলেছিলেন।

—ও সেই রাবাসত-যানেবালা। তা এত ভোরে, বাড়ি কোথায়?

—চেতলায়।

—সত্যি বলছ তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তা কত জনেব কাছ থেকে বারাসতের ভাড়া আদায কবেছ?

সুবল মাথা নিচু করে বইল।

—চেহাবা দেখে তো ভদ্রলোকেব ছেলেই মনে হচ্ছে—

সুবল তাড়াতাড়ি বলতে গেল, আজ্ঞে আমি সরলা প্রেসেব কম্পোজিটাব ছিলাম। কাজ নেই বলে মালিক বসিযে দিযেছে—

—চোপবও উল্লুক, বসিযে দিয়েছে না তবিল হাতডেছিলে?—হঠাৎ বেগে উঠতে দেখে সুবল আবাব ভয পেল,—হাওড়া লাইনে আমাব সাতখানা বাস। কণ্ডাক্টাব দবকাব। কিন্তু তোমাদেব মত লোককে আমি বিশ্বাস করি না—

উৎসাহিত হযে আবাব সেই সঙ্গে একটু দূবত্ব সৃষ্টি কবে সুবল বলল, যদি একবাব চান্স দেন স্যাব, আমি পারব—

—তা ভাডা আদায কবতে পাববে তালিম নেওযা আছে যখন। কিন্তু সে ভাড়া আমাব পকেটে আসবে না। সকাল বেলাতেই ঝামেলা, কেটে পড তো বাপু—।

ফেবাব পথে সুবলের সঙ্গে বিবেকের ফেব কুস্তি শুরু হযে গেল জোব। ও অবশ্য অনেক জাযগায প্রতিজ্ঞা করেছিল পবেব দিনই আট আনা ফেবৎ দিযে আসবে। যদিও কখনো তা কবেনি। কিন্তু এই ভদ্রলোক অগাধ সম্পত্তি, কাজ দেওযাব ক্ষমতা পেযেও লোককে আশ্বাস দিযে ডেকে এনে ফিবিযে দিলেন! তাহলে কে মিথ্যেবাদী? কে সমাজেব শত্রু? এই সময ঝেড়ে একখানা রদ্দা কষাতেই চিৎ হযে পড়ে গেল বিবেক।

শীতেব সকালে শিস দিতে দিতে সুবল ফুটপাথ ধবে হাঁটতে লাগল।

•

বাংলা ভাষায় কার্ল মার্কস

চিন্মোহন সেহানবীশ

মানতেই হবে জন্মের দেড়শ বছর পরেও কার্ল মার্কসের অতিকায় ব্যক্তিত্বের ছাপ বাংলা ভাষায় তেমন পড়েনি। তাঁর জীবদ্দশায় তো মার্কসের নাম এ দেশে একেবারেই অপরিচিত ছিল। রামমোহন বিলেতে গিয়ে সমাজতন্ত্রে ধর্মের স্থান নিয়ে আলোচনা করেছিলেন রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে। কিন্তু তার অল্পকালের মধ্যেই তিনি যখন মারা গেলেন তখন মার্কসের বয়স পনেরো বছর মাত্র—আজকাল যাঁকে নিয়ে অত হৈচৈ সেই 'তরুণ মার্কস'ও তিনি হয়ে ওঠেননি তখনো। ১৮৭০ সনে ইতিহাসে এম. এ. পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল কমিউনিজমের লক্ষ্য এবং ফুরিয়ের ও সেণ্ট সাইমনের মতবাদ সম্পর্কে। ১৮৭১ সনে হাণ্টার সাহেব ভারতীয় ওয়াহাবিদের সম্পর্কে বলেন যে তারা নাকি 'ধর্মমতের দিক থেকে এনাব্যাপ্টিস্ট্...আর রাজনীতিতে কমিউনিস্ট ও রেড্ রিপাব্লিকান্'। ১৮৭৩ সনে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের 'শেরপুর বিবরণে'র একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ঐ বইটিতে সুসং পরগণার লেঠিয়াকান্দা অঞ্চলে টিপু পাগলা প্রতিষ্ঠিত একটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ ছিল যাদের কাছে টিপু সমস্ত মানুষের সাম্যের কথা প্রচার করতেন এবং অনুবর্তীদের বলতেন জমিদারদের খাজনা না দিতে। ১৮২৪ সনে সরকার টিপু পাগলা পরিচালিত বিদ্রোহ দমন করে। 'শেরপুর বিবরণে'র সমালোচক টিপু পাগলাকে অভিহিত করেন 'পূর্ব বাংলার লুই ব্লাঙ্ক' নামে। কিন্তু এর

কোনও ক্ষেত্রেই মার্কসের কোন উল্লেখ ঘটেনি প্রসঙ্গক্রমেও। তারপব ১৮৭৯ সনে প্রকাশিত 'সাম্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'কমিউনিজম' ও 'ইণ্টাবন্যাশানালের' কথা (স্পষ্টতই 'প্রথম ইণ্টারন্যাশানাল') বললেন আর প্রসঙ্গত উল্লেখ করলেন কাল্পনিক সমাজতন্ত্রেব তিন বিখ্যাত উদ্গাতা—ওয়েন, সেণ্ট সাইমন ও ফুরিয়েবের কথা আব সেই সঙ্গে লুই ব্লাঙ্ক ও কাবেবও নাম—কিন্তু মার্কসেব নয়। ববীন্দ্রনাথও তেমনি ১৮৯২ সনে 'সাধনায়' প্রকাশিত 'সোশ্যালিজম' প্রবন্ধে সংক্ষেপে আর্নেস্ট বেলফোর্ট ব্যাক্সেব মতামত উপস্থিত কবেন—খুব সম্ভবত ১৮৮৬ সনে প্রকাশিত ব্যাক্সের 'রিলিজন অফ সোশ্যালিজম' বইখানি তাঁর হাতে পৌছেছিল ঐ সময়ে। আর নতুন শতকের গোডাব বছরেই প্যারিসে বিবেকানন্দেব সঙ্গে দেখা হযেছিল নৈরাজ্যবাদী তত্ত্ববিদ ক্রপট্‌কিনের সঙ্গে এবং ঐ সময় নাগাদই প্রকাশিত হয় বিবেকানন্দের বিখ্যাত প্রবন্ধ—'আই এম্ এ সোশ্যালিস্ট'। কিন্তু এর কোনটিতেই উল্লেখ ছিল না কার্ল মার্কসের।

বাংলা ভাষায় মার্কসেব প্রথম উল্লেখ যে ঠিক কবে, আজ তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে বাংলা দেশে ও বাঙালীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় লালা হরদয়ালেব 'কার্ল মার্কস—এ মডার্ণ ঋষি' বেরোয় ১৯১২ সনেব মার্চ মাসে। অথচ ১৯০৫ সন থেকেই রাশিযাব প্রথম বিপ্লব ও জাবেব হাতে তার নির্মম দমনপীডন সম্পর্কে 'প্রবাসী'তে পর পব অনেক লেখা ও মন্তব্য প্রকাশিত হলেও প্রসঙ্গত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বা মার্কসবাদী চিন্তার কোন উল্লেখ দেখা যায়নি তার ভিতরে।

আমাদেব চিন্তানায়কদের তবফের সেদিনকাব এই অনুল্লেখ দেশকালের পরিমাপে পাশ্চাত্ত্য দুনিযার থেকে আমাদেব বিপুল দূরত্ব দিযেই শুধু ব্যাখ্যা করা চলে না। এ কথা মনে রাখা দরকাব যে তখনো পর্যন্ত এ দেশে মার্কসবাদী চিন্তার অভিযানের পক্ষে ক্ষেত্র প্রস্তুত হযে ওঠেনি বাস্তব অবস্থার দিক থেকেও। জাতীয আন্দোলন তখন দেশের স্বাধীনতাকে আন্দোলনেব লক্ষ্য হিসাবে ধার্য করেনি—পন্থা হিসাবেও গ্রহণ কবেনি সত্যকাব গণ-আন্দোলনেব পথ। আর শ্রমিক আন্দোলনের তো তখনো শৈশবাবস্থা—তাব সর্ব ভাবতীয় ট্রেড ইউনিযন কেন্দ্র পর্যন্ত গঠিত হযে ওঠেনি তখনো। সুতরাং মার্কসের কোন উল্লেখ যদি তখন ঘটেও থাকে কোনখানে, তবে আমাদেব পক্ষে আজ তৃপ্তিদাযক হলেও মোটের উপর তাকে স্বভাবের

ব্যতিক্রম—অনুসন্ধিৎসু কোন গ্রন্থকীটের কৌতূহলের ফল হিসেবে গণ্য করাই বোধ করি সমীচীন হবে।

শেষ পর্যন্ত তাই এই সিদ্ধান্তই টানতে হয় যে খুব সম্ভবত ১৯১৭ সনের নভেম্বর মাসের সেই ঐতিহাসিক 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিনের' কিছু কাল পরেই সর্বপ্রথম আমাদের কানে মার্কসের নাম পৌঁছয়—দুনিয়ার প্রথম সার্থক শ্রমিক বিপ্লবের অদ্বিতীয় নেতা লেনিনের নামের সঙ্গে জড়িত হয়েই। যেমন, ১৯২১ সনে 'সৎসঙ্গী' নামে অখ্যাত এক ধর্মপত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে লেনিনের একটি জীবনী প্রকাশিত হয়। সেখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয় মার্কসের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ও লেনিনের উপরে মার্কসের 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের বিপুল প্রভাবের। ঐ বছরেই ফণীভূষণ ঘোষ মহাশয়ও লেনিনের একটি জীবনী প্রকাশ করেন—তাতে তিনি লেখেন "হিন্দুর নিকট গীতার যে রূপ, বোলশেভিকের নিকট জার্মান দার্শনিক মার্কসের 'মূলধন' (Capital) নামক গ্রন্থ সেইরূপ।" এক বছর পরে গয়া কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে 'আমাদের লক্ষ্য কি?' শিরোনামায় ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ভারতের জাতীয়তাবাদীদের উদ্দেশ্যে একটি খোলা চিঠিতে লেখেন: 'ভারতের কোটি কোটি লোকের কথা ভাবিয়া চলিতে হইবে। গণবৃন্দের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তিই আমাদের আদর্শ হইবে ‥ তবেই তাহারা আমাদের সহায় সম্পদ হইবে। দেশের মুক্তিকামীদের ·এখন কার্ল মার্কস ও ম্যাস মুভমেণ্টের চর্চা করিতে হইবে ('শঙ্খ', ৩০শে অক্টোবর, ১৯২২)।

শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, অমূল্য অধিকারী প্রমুখ আরো অনেক বিপ্লবীও ঐ মর্মে প্রবন্ধ লেখেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়।

অন্য নানা ধরনের লেখার পাশাপাশি যে-সব জাতীয়তাবাদী সাময়িক পত্র তখন ঐ ধরনের লেখাও মাঝে মাঝে প্রকাশ করত তার মধ্যে 'প্রবাসী', 'আত্মশক্তি', 'বিজলী', 'শঙ্খ', 'দেশের বাণী', 'বাংলার বাণী' ও 'সংহতি'র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ১৯২২ সনে নজরুল ইসলাম যখন প্রথমে 'ধূমকেতু' ও বিশেষ করে তার কিছুদিন পরে 'লাঙল' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন সে প্রচেষ্টার মধ্যে একান্তভাবে মার্কসীয় চিন্তা-প্রভাবিত রচনা প্রকাশের একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করার ঝোঁক পরিস্ফুট হল। 'লাঙলে'র পরে আরো স্পষ্টভাবেই মার্কসবাদী পত্রিকা হিসেবে একের

পর এক আবির্ভাব হল 'গণবাণী', 'চাষীমজুর', 'মার্কসবাদী', 'মার্কসপন্থী', 'গণশক্তি', 'আগে চলো' প্রভৃতি পত্রিকার।

ঐ ধরনের বিক্ষিপ্ত রচনা ছাড়াও বিশের কোঠার শেষ দিকে ও ত্রিশের কোঠার গোড়ায় পুস্তিকা আকারে মার্কসের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত জীবনীও প্রকাশিত হয়েছিল। তার লেখকদের মধ্যে ছিলেন মণিময় প্রামাণিক, দেবজ্যোতি বর্মণ, হেমন্তকুমার সরকার, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। অবশ্য বাংলা ভাষায় সত্যকার তথ্যসমৃদ্ধ ভালো মার্কস-জীবনী লিখেছিলেন শ্রীসুকুমার মিত্র অনেক বছর পরে।

তবে আমাদের ভাষায় মার্কসের স্থান পরিমাপের এর চাইতেও সঠিক মাপকাঠি হল বাংলায় তাঁর (ও অবশ্যই এঙ্গেলসেরও) রচনাবলীর তর্জমা প্রকাশ। সৌভাগ্যক্রমে এ দিকের অবস্থা কিছুটা ভালো, কারণ বাংলা ভাষায় মার্কসের তর্জমা যথেষ্ট না হলেও পরিমাণের দিক থেকে অন্তত একেবারে নগণ্য নয়। প্রত্যাশিত ভাবেই কাজটা শুরু হয় 'কমিউনিস্ট ইস্তেহার' দিয়ে। পরের পর 'ইস্তেহারের' অনুবাদ করেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আবদুল হালিম, শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী, ব্রজবিহারী বর্মণ ও সুশোভনচন্দ্র সরকার। তারপর প্রকাশিত হয় 'সোশ্যালিজম, ইউটোপিয়ান এণ্ড সায়েন্টিফিক', 'অরিজিন অফ ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি এণ্ড দি স্টেট', 'ওয়েজ-লেবার এণ্ড ক্যাপিটাল', 'ওয়েজেস, প্রাইস এণ্ড প্রফিট', 'কমিউনিজম' ও 'বৃটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়ার' অনুবাদ (অবশ্য এই সব অনুবাদ মূল জার্মান নয়, ইংরেজী সংস্করণ থেকেই)। সেই গোড়ার যুগের অনুবাদের কাজে হাত লাগিয়েছিলেন বিনয়কুমার সরকার, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, আবদুল হালিম, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রেবতী বর্মণ, শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী, মন্মথ সরকার, ফণী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধী প্রধান ও আরো পরে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুশোভনচন্দ্র সরকার।

নিয়মিত মার্কস সাহিত্য প্রকাশনের ক্ষেত্রে ব্রজবিহারী বর্মণ মহাশয় ও তাঁর 'বর্মণ পাবলিশিং হাউসে'র অগ্রণী ভূমিকার কথা প্রথমেই মনে পড়ে। তবে বাংলা ভাষায় মার্কসবাদী সাহিত্য, বিশেষ করে মার্কসের রচনার অনুবাদ প্রকাশ সত্যই দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হল প্রথমে 'ন্যাশানাল বুক এজেন্সি' ও পরে মস্কোর 'বিদেশী সাহিত্য প্রকাশন' ও 'প্রগতি সাহিত্য প্রকাশন' এই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার পরে (আর গোড়ার যুগের পুলিশী

হামলাব ঝুঁকি নিয়েও সে-সব পুস্তকবিক্রেতা প্রতিষ্ঠান মার্কসের বা মার্কসবাদী বই বা পুস্তিকা বিক্রয় করত তার মধ্যে ছিল চক্রবর্তী চ্যাটার্জি, বুক কম্পানি, নিউম্যান ও মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের একটি বইয়ের দোকান)। এদের সকলের চেষ্টায় বাঙালী পাঠক এখন বেশ কিছু মার্কসের লেখা পডবার সুযোগ পেযেছেন গত দুই দশকে। এর মধ্যে আছে ভারতবর্ষ ও ঔপনিবেশিকতা বিষয়ক তাঁব অধিকাংশ রচনা এবং চার খণ্ডে মার্কস ও এঙ্গেলসের নির্বাচিত রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের তর্জমা।

'ক্যাপিটালে'ব প্রথম খণ্ড অনুবাদেয় কাজও সম্প্রতি সম্পন্ন হযেছে—এখন ঐ পাণ্ডুলিপিটি রয়েছে মস্কো থেকে প্রকাশের অপেক্ষায় (এর অনুবাদকদেব মধ্যে আছেন শ্রীভবানী সেন ও শ্রীসোমনাথ লাহিডীর মতো প্রবীণ মার্কসবাদী)। তবে 'ক্যাপিটালের' তর্জমা প্রকাশের ব্যাপাবে আমরা পেছিয়ে রযেছি হিন্দী ও মালয়ালমের থেকে। হিন্দীতে গত বছর 'ক্যাপিটালের' প্রথম খণ্ড আব মালাযালামে এ-বছরে তিন খণ্ডই প্রকাশিত হযেছে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে তিন খণ্ডেব অনুবাদ, সম্পাদনা এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনা সমস্ত কাজ নাকি সমাধা করা হযেছে এক বছরের মধ্যে। এ ধরনের উদ্যোগ ও সংগঠনী ক্ষমতা নিশ্চযই চমকপ্রদ। তবুও আমার মনে হয় 'ক্যাপিটালে'র বাংলা অনুবাদ প্রকাশকালে আমাদের অত তাডাহুডো করা ঠিক হবে না।

এই প্রসঙ্গে অনুবাদের মানের কথা ওঠে। গোডাতেই একটা কথা মনে রাখা দবকার: এতাবৎ যা প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে তা মোটেই মার্কসের মূল জার্মান রচনার বাংলা সংস্করণ নয় (যাতে থাকবে বিশেষ করেই বাঙালী পাঠকদের উপযোগী সম্পাদকীয় টীকা ও বিশেষ ভূমিকা), ইংবেজী সংস্করণেরই বাংলা তর্জমা মাত্র। মার্কস সাহিত্যের সত্যকারি বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করতে হলে আমাদের নানা দিক দিযে গুরুতর শ্রমসাধ্য সব কাজকর্মে হাত দিতে হবে, যেমন মার্কসবাদী শব্দগুলির সঠিক বাংলা পবিভাষা নির্ধাবণ, জার্মান ও বাংলা—দুই ভাষাতেই যথেষ্ট দখল আছে এমন বেশ কয়েকজন অনুবাদক বাছাই—অন্তত বাংলা অনুবাদকে মূল জার্মানের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করে নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সম্পাদনার গুরু দাযিত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত সুপণ্ডিত নির্বাচন প্রভৃতি। বাংলা ভাষায় মার্কস রচনা অনুবাদের কাজ ৪০

বছরেরো বেশি দিন যাবৎ চলেছে। তাই এটা খুবই সমীচীন, বিশেষ করে মার্কসেব জন্ম সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এটা তাঁর স্মৃতিব প্রতি আমাদের সকলেবই দায়িত্ব—এই অনুবাদের কাজকে এখন থেকে আরো অনেক সংগঠিত ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠ করা।

তর্জমা ছাড়াও প্রায় গোড়াব থেকেই শুরু হয়েছিল মার্কসেব বহুমুখী চিন্তাকে জনসাধারণের কাছে পরিবেশনেব উদ্দেশ্যে সহজ বই বা পুস্তিকা লেখার চেষ্টা। এ ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্যদেব মধ্যে মুজফ্ফব আহ্মদ (কৃষি-সমস্যা বিষযে), রেবতী বর্মণ (অর্থনীতি প্রসঙ্গে), সরোজ আচার্য (দর্শন বিষযে), সোমনাথ লাহিড়ী (কমিউনিজমের মূল নীতি), পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী (অর্থনীতি), ধরণী গোস্বামী (শ্রমিক আন্দোলন), অমিত সেন (ইতিহাসেব ধাবা), হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায (ভাবতবর্ষ ও মার্কসবাদ), নীহাব সবকার (মার্কসবাদের বাজনীতি ও অর্থনীতি), অনিল মুখোপাধ্যায (কমিউনিজমের মূল নীতি) প্রভৃতির নাম বিশেষ কবেই মনে পড়ে।

শুধু বই বা পুস্তিকা লিখেই নয, ক্লাস নিযে বা বক্তৃতা মাবফৎ যাঁবা বিভিন্ন সময়ে মার্কসেব শিক্ষাকে জনসাধারণের কাছে পৌছবাব চেষ্টা করেছিলেন তাব মধ্যে বাধাবমণ মিত্র (দর্শন ও ইতিহাস), সুবেন্দ্রনাথ গোস্বামী (দর্শন) অমবেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র (অর্থনীতি ও বাজনীতি) প্রভৃতিব নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তেমনই আবার আন্দামানের বন্দীদের মধ্যে ডাঃ নারাযণ বায, নিবঞ্জন সেন, সুধাংশু দাশগুপ্ত, বিজযকুমার সিংহ, সুনীল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং বিভিন্ন জেলে ও বন্দীনিবাসে আবদুল হালিম, ভবানী সেন, আবদুল মোমিন, নিরাপদ মুখার্জি, রেবতী বর্মণ, সবোজ আচার্য, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, আবদুব বেজ্জাক খাঁ, কালী সেন, বিভূতি গুহ প্রমুখ মার্কসেব চিন্তার বিভিন্ন দিকেব সঙ্গে বন্দীদের পবিচিত করাব ব্যাপাবে অগ্রণী হযেছিলেন।

সহজবোধ্য বই বা পুস্তিকা লেখা ছাড়া আবো কিছুটা গুরুতব এক ধরনের চেষ্টা হযেছিল এব কিছু কাল পব থেকেই। সেটি হল ভাবতীয সমস্যা সমাধান-কল্পে মার্কসীয় পদ্ধতিব প্রযোগ। এ প্রসঙ্গে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তেব ভারতীয সমাজবিকাশেব ধারা সম্পর্কিত গোড়ার যুগের গবেষণার কথা সকলেবই মনে পড়বে। এ ছাড়া গোপাল হালদাবের সংস্কৃতির রূপান্তব বিষয়ক (বাঙালী সংস্কৃতিব বিকাশ প্রসঙ্গ সমেত) রচনা, বাংলা সাহিত্যেব ভবিষ্যৎ সম্পর্কে

বিষ্ণু দে-র লেখা, বাংলাব নবজাগরণ ও সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে অমিত সেনের প্রবন্ধাদি, নীরেন্দ্রনাথ রায, বিনয ঘোষ, অববিন্দ পোদ্দাব প্রভৃতিব বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত বই ও প্রবন্ধাদি, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যাযেব ভাবতীয বস্তুবাদবিষযক লেখা, ভারতীয কৃষি সম্পর্কে ভবানী সেনেব ও ভাবতেব শিল্পবিকাশ সম্পর্কে সুনীলকুমার সেনের রচনা, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা দেশের ভূমিকা বিষযক নরহবি কবিরাজের বই ও প্রবন্ধাদি, রুশ বিপ্লব ও বাংলাব মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে গৌতম চট্টোপাধ্যায এবং ভারতীয শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে গোপাল ঘোষের বইদুটিব কথাও মনে রাখা দবকার।

বাংলা কবিতা, কথা-সাহিত্য, নাটক ইত্যাদিব ক্ষেত্রে মার্কসীয ভাবনাব প্রভাব স্বভাবতই পবোক্ষ ও জটিল আব তাই তার স্বতন্ত্র আলোচনা প্রযোজন। প্রশ্নটিব ব্যাপকতব দিগন্তের কথা বাদ দিয়ে এখানে শুধু এই বলা চলে যে সে-প্রভাব বেশ স্পষ্টভাবেই বোঝা যায আমবা যদি শুধু নিম্নলিখিতদেব কিছু কিছু বচনাব কথা মনে রাখি: নজরুল ইসলাম, নবেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায, বিষ্ণু দে, গোপাল হালদাব, সুভাষ মুখোপাধ্যায, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, নাবাযণ গঙ্গোপাধ্যায, জ্যোতিবিন্দ্র মৈত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সোমেন চন্দ, বিমলচন্দ্র ঘোষ, ননী ভৌমিক, সাবিত্রী বায, গুণময মান্না ও সুকান্ত ভট্টাচার্য।

'ভারত-জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র মৈত্রী সমিতি'ব মার্কস স্মারকপত্রিকায প্রকাশিত ইংবেজি প্রবন্ধ অবলম্বনে বচিত। এর অনেক তথ্য অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকাবের 'বাংলা মাসিকপত্রে রুশবিপ্লবেব প্রথম দশক' [রুশবিপ্লবের ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত 'সোভিযেত বিপ্লব পবিচয়' সংকলন দ্রষ্টব্য] ও ব্রজবিহাবী বর্মণ মহাশযের 'সপ্তাহ' পত্রিকায প্রকাশিত 'বাঙলা ভাষায মার্কসবাদ' নামক প্রবন্ধ [১০ই মে, ১৯৬৮ সংখ্যা] থেকে নেওয়া।

স্মৃতিকথায় মার্কস ও এঙ্গেলস

অমল দাশগুপ্ত

বইটির নাম, মার্কস ও এঙ্গেলসের স্মৃতিকথা। মস্কো থেকে প্রকাশিত। মার্কস ও এঙ্গেলসের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদেরই কয়েকজন স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে আহরণ করে করে মণিমুক্তোর ডালি সাজিয়েছেন। বইয়ের ভূমিকা হিসেবে কার্ল মার্কস সম্পর্কে এঙ্গেলসের লেখা, মার্কস ও এঙ্গেলস সম্পর্কে লেনিনের লেখা সংযোজিত। সব মিলিয়ে মার্কস এঙ্গেলসকে পাওয়া যাচ্ছে যেমন ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রবক্তা হিসেবে, সংগঠক ও যোদ্ধা হিসেবে, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনের অজস্র খুঁটিনাটির মধ্যে পতি, পিতা ও বন্ধুরূপী হৃদয়বান ও বিবেকবান মানুষ হিসেবে।

মার্কস ও এঙ্গেলস যে আমাদের মতোই রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন, এটা আমার কাছে প্রায় একটা আবিষ্কারের মতো। মার্কসীয় সাহিত্য পাঠের গোড়ার দিকে যখন কমিউনিস্ট ইস্তাহার পড়ি, মার্কস ও এঙ্গেলস যে পৃথক দুটি মানুষের নাম তা ভাবতে পারিনি। নাম দুটিকেও ইস্তাহারের ঘোষণার সঙ্গে এক করে দেখতাম। প্রথম যৌবনের রঙীন চোখে এই পুস্তিকাটি ছিল রূঢ় কর্কশ উদ্ভাসী আলোর বিস্ফোরণের মতো। ইস্তাহারের সেই ঘোষণা: বুর্জোয়া সমাজে জীবিকার সম্মান ছিন্নভিন্ন। ডাক্তার, উকিল, ধর্মযাজক, কবি, বিজ্ঞানী—যিনি যা-ই হোন সকলেই বুর্জোয়াদের বেতনভুক মজুরে পরিণত। বুর্জোয়া সমাজে পারিবারিক সম্পর্ক টাকাপয়সার সম্পর্ক ছাড়া

কিছু নয়। এই ঘোষণা যাঁরা করেন তাঁদেরও জীবিকা ছিল, যে-জীবিকা আর যাই হোক বুর্জোয়াদের মজুরবৃত্তি কিছুতেই নয়, পারিবারিক সম্পর্ক ছিল, যে-পারিবারিক সম্পর্ক আর যাই হোক টাকা পয়সার সম্পর্ক কিছুতেই নয়—তা এখনো যেন ঠিক ভাবতে পারি না। শ্রেণী-সংগ্রামের প্রবক্তারা ব্যক্তিগত জীবনে এতখানি হৃদয়বান ও বিবেকবান হলেন কী করে। যাঁরা লিখেছিলেন—প্রতিষ্ঠিত সামাজিক অবস্থাকে বলপূর্বক উৎপাটন করেই তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছবেন, কমিউনিস্ট বিপ্লবের কথা ভেবে শাসকশ্রেণী ভয়ে কাঁপতে থাকুক, শেকল ছাড়া প্রোলিতারিয়েতের হারাবার কিছুই নেই, জয় করবার জন্যে আছে গোটা বিশ্বজগৎ—তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনটি কিন্তু ছিল মাধুর্য ও সুষমামণ্ডিত, বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে ঘৃণায় উদ্দীপ্ত জীবন বলতে অনেক সময়ে আমরা যা বুঝি ও যে দৃষ্টান্ত তুলে ধরি—তার সঙ্গে ঠিক যেন খাপ খায় না। বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার মধ্যে যতোক্ষণ আছি, প্রেম-ভালোবাসা-স্নেহ-মমতা এসব হৃদয়বৃত্তিকে পুরো দাম দিতে বা পুরোপুরি স্বীকার করে নিতে আমরা অনেক সময়েই লজ্জা পাই। স্মৃতিকথা পড়লে বোঝা যায়, পুরো দাম দিতে পারা বা পুরোপুরি স্বীকার করে নেওয়াটাও বিপ্লবী জীবনেরই পরিচয়। ময়দানের বক্তৃতায় বিপ্লবী, পারিবারিক সম্পর্কে ফিউডাল—এমন দৃষ্টান্ত তো আমাদের চোখের সামনে ভূরি ভূরি। কমিউনিস্টের জীবন যে কখনো খণ্ডিত হতে পারে না, চিন্তায় উপলব্ধিতে প্রয়াসে ও প্রয়োগে কমিউনিস্টকে হয়ে উঠতে হবে গোটা মানুষ, কি জীবিকায়, কি পারিবারিক সম্পর্কে, কি রাজনৈতিক তৎপরতায়, এমন দৃষ্টান্ত অন্তত আমাদের দেশে ক্রমেই দুর্লভ হয়ে উঠছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে না হোক, জীবিকা ও পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপসের সঙ্গে আপস করে চলতে আমরা অনেকেই আর কোনোরকম বিবেকের তাড়না বোধ করি না। এমনি অবস্থায় স্মৃতিকথার পৃষ্ঠায় এমন দুটি মানুষের জীবন আমাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছে যাঁদের রাজনীতির সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের কোনো বিরোধ নেই, বুর্জোয়া মূল্যবোধের সঙ্গে বিন্দুমাত্র আপস না করেও যাঁরা মন খুলে ও বুক ভরে ভালোবাসতে পেরেছেন, মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে গবেষণা করেছেন, সন্তানের হাত ধরে বেড়াতে বেরিয়েছেন, পানশালায় টেবিল ঘিরে বসে বীফ্‌স্টেক সহযোগে মদ্যপান করে হো-হো করে হেসেছেন।

শুধু তাই নয়, ক্যাপিটাল-এর লেখক প্রথম যৌবনে প্রিয়াকে উদ্দেশ করে কবিতাও লিখেছিলেন, এর চেয়ে আশ্চর্য ঘটনা আর কী হতে পারে। একটি-দুটি নয়, তিনটি মোটা মোটা খাতা ভর্তি। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮৩৬ সালে, কার্ল মার্কস তখন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তার আগে একবছর তিনি ছিলেন বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাবার হুকুমে অনিচ্ছার সঙ্গেই বন্ ছেড়ে এসেছিলেন বার্লিনে। তখন তাঁর বয়স আঠারো। প্রেমে পড়ার জন্যে আরেকটু অপেক্ষা করলেও পারতেন। কিন্তু সেই বয়সেই আবাল্য খেলার সঙ্গিনী, বয়সে তাঁর চেয়ে চার বছরের বড়ো, অসামান্য রূপসী যেনি ফন ভেস্টফালেনের প্রেমে পড়লেন। সহজেই অনুমান করা চলে, বাগ্‌দত্তাকে ছেড়ে বার্লিনে চলে আসাটা সেই নবীন যুবকের কাছে সুকঠিন শাস্তি স্বরূপ ছিল। বিরহ-যন্ত্রণা অবশ্যই তীব্র হবার কথা। অনুরূপ ক্ষেত্রে অন্য সমস্ত যুবক যা করে তিনিও তাই করে বসলেন। অর্থাৎ, প্রিয়াকে উদ্দেশ করে কবিতা লিখতে লাগলেন। উৎসর্গ-পত্রে লিখলেন—'আমার চিরকালের প্রিয়তমা যেনি ফন ভেস্টফালেন-কে'।

যথাসময়ে (১৮৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে) এই কবিতাগুচ্ছ প্রিয়তমার হাতেও গিয়ে পৌঁছল। প্রতিক্রিয়া জানতেও দেরি হল না। বোন সোফি চিঠি লিখলেন বার্লিনে দাদার কাছে: 'কবিতাগুলো পড়ে আনন্দে ও বিষাদে যেনি কেঁদেছে।'

যেনি ফন ভেস্টফালেন শ্রীমতী মার্কস হতে পেরেছিলেন এ-ঘটনার সাত বছর পরে। বাইশ বছর বয়সে প্রেমে পড়ে ঊনত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকাটা—যেনি যে-পরিবারের মেয়ে সেক্ষেত্রে—প্রেমের একাগ্রতা ও প্রেমের জন্যে ত্যাগস্বীকারের পরীক্ষা হিসেবে উমার তপস্যার সঙ্গে তুলনীয়। অভিজাত বংশের মেয়ে ও মন্ত্রীর বোন, উপরন্তু অসামান্য রূপসী—এমন কন্যার পাণিপ্রার্থীর অভাব ঘটবার কোনো কারণ ছিল না। অন্যদিকে, প্রচলিত মাপকাঠিতে কার্ল মার্কস খুব যে একটা সুপাত্র ছিলেন তাও নয়, কেননা তখনো পর্যন্ত তিনি বিনা তদবিরে যেটুকু অন্তত করতে পারতেন—অধ্যাপনার কাজ নিয়ে অ্যাকাডেমিক লাইনের নিশ্চিত আরামের আশ্রয় নেওয়া—তাও করেন নি। অনুমান করতে পারি, এই সাতটি বছরের প্রতিটি দিনই যেনি ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন এই প্রস্তাবিত বিয়ের বিরোধিতার সঙ্গে লড়াই করে

করে। দেখাসাক্ষাতের উপলক্ষ বড়ো একটা ঘটত না। কিন্তু সেই কবিতার খাতা তিনটি ছিল। মস্ত একটি সম্পদের মতো যেনি খাতা তিনটি আগলে রাখতেন, এমনকি বিয়ের পরেও, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, কাউকে দেখাতেন না।

মার্কস ও এঙ্গেলসের বন্ধুত্বের সঙ্গে তুলনা চলতে পারে এমন দৃষ্টান্ত গ্রীক পুরাণে আছে, অন্যত্রও পাওয়া যায়। কিন্তু মার্কস ও যেনির প্রেমের তুলনা মার্কস ও যেনিরই অতুলনীয় প্রেম। অসম্ভব দারিদ্র্যের মধ্যে বিবাহিত জীবনের একটা বড়ো অংশ কাটিয়েছিলেন, নিত্য অভাবের সংসারে তিন-তিনটি সন্তানকে বাঁচাতে পারেন নি—তবুও এই ধনীর দুলালী ভেঙে পড়েন নি বা স্বামীর অক্ষমতার কথা তুলে নিজের দুরদৃষ্টের জন্যে হা-হুতাশ করেন নি। তার চেয়েও বড়ো কথা, যতোই ভাগ্যের মার খেয়েছেন ততোই উপলব্ধি করেছেন বুর্জোয়া সমাজের ইতরতা, ততোই স্বামীর কাজের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন। স্বামীর পাণ্ডুলিপি কপি করে দেওযার কাজটি অনেক সাধ্বী স্ত্রীই করে থাকেন। কিন্তু স্বামীর জীবনসঙ্গিনী হতে হলে আরো কিছু করা দরকার, শ্রীমতী মার্কস সে-অর্থে জীবনসঙ্গিনী। এঙ্গেলসের ভাষায়, "যেনি মার্কস শুধু যে তাঁর স্বামীর ভাগ্যের সঙ্গে, কাজের সঙ্গে, সংগ্রামের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করেছিলেন তাই নয়, নিজেকে যুক্তও করেছিলেন সর্বাধিক উপলব্ধি নিয়ে, একাগ্রতম আবেগ নিয়ে।" প্রলেতারীয় আন্দোলন "তাঁর অস্তিত্বের সঙ্গে অভিন্ন হযে গিয়েছিল।" স্বয়ং এঙ্গেলস লিখছেন, প্রোলেতারীয় আন্দোলন তাঁর অস্তিত্বের সঙ্গে অভিন্ন। বন্ধুপত্নী বলেই এঙ্গেলস অহেতুক প্রশংসা করছেন, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। এঙ্গেলসের লেখার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, অন্তত 'অ্যান্টি-ড্যুরিং' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা নিঃসংশয়ে একথা মানবেন। শ্রীমতী মার্কস প্রকৃত অর্থেই প্রোলেতারীয় আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন। কতখানি ভালোবাসা থাকলে এমনটি হওয়া যায়।

মার্কসের জীবনেরও সবচেয়ে বড়ো আশ্রয় ছিল ভালোবাসা। শুধু প্রিয়া ও ভার্যাকে নয়—মানুষকে, আদর্শকে, সংগ্রামকে। কোন্‌টি যে তাঁর সবচেয়ে বড়ো ভালোবাসা তা পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করা শক্ত। কোন্‌টি নয়?

আমার তো মনে হয়, মার্কস যে অত্যধিক ধূমপান করতেন, এ-ঘটনার

মধ্যেও একটি প্রেমিক পুরুষের চরিত্রগত লক্ষণটি প্রকাশ পাচ্ছে। পল লাফার্গকে তিনি বলছেন, 'ক্যাপিটাল লিখতে গিয়ে যতো সিগার আমি পুড়িয়েছি, ক্যাপিটাল থেকে পাওয়া পয়সায় তার দাম পর্যন্ত উঠবে না।' পল লাফার্গের লেখা থেকে জানা যায়, সিগারের চেয়েও বেশি খরচ হত দেশলাইয়ের কাঠি। সিগার বা পাইপ টানতে ভুলে যেতেন বলে অনবরত নিভে যেত আর অনবরত দেশলাই জ্বালাতেন। ক্যাপিটালের লেখকের স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে পল লাফার্গ একেবারে গোড়াতেই এই অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। আমার তো মনে হয়—পিতা, বন্ধু, স্বামী, পাঠক, গবেষক ও কর্মী কার্ল মার্কসের যে অবয়বটি পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে পল লাফার্গ তুলে ধরেছেন তার প্রাথমিক আভাসটি এই ঘটনা থেকেও খানিকটা যেন পাওয়া যাচ্ছে।

পল লাফার্গ তাঁর লেখায় কার্ল মার্কসের জীবনের অনেক বড়ো বড়ো ঘটনার উল্লেখ করেছেন : প্রথম আন্তর্জাতিক, ক্যাপিটাল, ইত্যাদি ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে সমান গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন আরো কয়েকটি অনুরূপ অকিঞ্চিৎকর ঘটনা। যেমন, পড়ার ঘরের মধ্যে মার্কসের পায়চারি করা। দৃশ্যটি কল্পনা করার মতো। মার্কসের সেই ঘর—পল লাফার্গের বর্ণনা অনুসারে যার একদিকে চওড়া জানলা, অন্যদিকে ফায়ারপ্লেস, দেওয়াল বরাবর বইয়ে ঠাসা বুক-কেস ও ছাদ পর্যন্ত ঠাসা পত্রপত্রিকা ও পাণ্ডুলিপি, ঘরের মধ্যিখানে তিনফুট বাই দু-ফুট মাপের ছোট একটি ডেস্ক, একটি কাঠের আর্মচেয়ার ও একটি চামড়ার সোফা, এছাড়া যত্রতত্র ছড়ানো বই আর বই—আর এই ঘরটির মধ্যেই কোণাকুণিভাবে পায়চারি করে চলেছেন কার্ল মার্কস। যেমন-তেমন পায়চারি নয়, ঠিক যে কি-রকমটি তা কোনো একটি বিশেষণের সাহায্যে বোঝানো যাবে না। পায়চারি করতে করতে পায়চারি করতে করতে দরজা থেকে জানলা বরাবর মেঝের ওপরে পায়ের ছাপ ফুটে উঠেছিল, যেমন ফুটে ওঠে মাঠের ওপরে পায়ে-চলা রাস্তা। এ-অভ্যেস মার্কসের একার নয়, এঙ্গেলসেরও। মার্কসের ছোট মেয়ে টুসি অল্প কথায় দুই বন্ধুর পায়চারির সুন্দর একটি বর্ণনা দিয়েছেন :

" ··এঙ্গেলস রোজই আসতেন আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে। কখনো কখনো ওঁরা দুজনে একসঙ্গে বেড়াতে বেরোতেন। প্রায়ই আবার বাবার

ঘরের মধ্যেই কাটাতেন সাবাক্ষণ। ঘরের মধ্যে থাকলে চলত পাযচারি, ঘবের এ-মাথা থেকে ও-মাথা, যে-যার নিজের দিকে। ঘবের কোণায পৌঁছে যখন ঘুরে দাঁডাতে হত, গোডালির চাপে গর্ত হয়ে যেত মেঝের ওপরে। এই ঘবটিব মধ্যে তুজনে যে-সব আলোচনা করতেন, অধিকাংশ মানুষের দর্শন-চিন্তা স্বপ্নেও ততোদূর পৌঁছতে পারত না। প্রাযই এমন হত যে তুজনে নিঃশব্দে পাশাপাশি পাযচারি করে চলেছেন। কিংবা হযতো আপন মনে বলে চলেছেন যা সেই মুহূর্তে তাঁর প্রধান চিন্তাব বিষয। তারপরে হঠাৎ একসমযে মুখোমুখি দাঁডিযে পডে হো-হো কবে হেসে উঠতেন, কেননা তখন তাঁবা বুঝতে পেরেছেন আধঘণ্টা ধরে তুজনে তুটি বিপবীত বিষয নিযে চুলচেরা বিশ্লেষণ চালাচ্ছিলেন।”

এ-বিববণ ১৮৭০ সালের পববর্তী দশ বছবেব। তাব আগে তুই বন্ধুর দৈনন্দিন সাক্ষাৎকাবেব কোনো স্থযোগই ছিল না। এঙ্গেলস পাকাপাকি ভাবে লণ্ডনে বাসা নিযেছিলেন ১৮৭০ সালে। তার আগে কুডি বছব এঙ্গেলস ছিলেন মানচেস্টারে। দেখা রোজ হত না, অথচ দেখা হওযাটা জরুরি, কাজেই চিঠি। বলাই বাহুল্য, কুশল-বার্তা বিনিমযের জন্যে সে-চিঠি নয়, মনেব চিন্তা ভাগ কবে দেবার জন্যে। কুডি বছর ধবে প্রতিটি দিন তুই বন্ধু একে অপবকে চিঠি লিখে গিযেছেন।

যে-চিঠি নির্ভুল নিযমে রোজই একটি করে আসত, তাব আসাটাও ছিল মস্ত একটি ঘটনা। টুসিব ছেলেবেলাব প্রথম স্মৃতি এই মানচেস্টারের চিঠি। মার্কস চিঠি পডতেন এমনভাবে যেন পত্রলেখক সামনেই উপস্থিত। পডছেন আব মন্তব্য কবে চলেছেন, ‘না, না, ব্যাপাবটা ঠিক তা নয’ কিংবা ‘একথাটা ঠিকই বলেছ’ ইত্যাদি। চিঠি পডতে পডতে এমনভাবে হাসতে শুরু করতেন যে চোখে জল এসে যেত।

ভাবতে অবাক লাগে কুডি বছর ধরে তুই বন্ধুর একজন ছিলেন লণ্ডনে, অপরজন মানচেস্টাবে। কুড়ি বছব পবে এঙ্গেলস যেদিন সত্যি সত্যিই মানচেস্টাব ছাডতে পাবলেন ও লণ্ডনের স্থাযী বাসিন্দা হলেন—সেটি এক স্মরণীয দিন। স্মৃতিকথা থেকে এই দিনটিব কিছু বিবরণ উদ্ধার কবতে চাই।

মানচেস্টাবে এঙ্গেলসের জীবন একেবারে নিঃসঙ্গ ছিল তা নয। তু-একজন বন্ধু অবশ্যই ছিল। টুসি গোণাগুণতি তিনজনের নাম কবেছেন। ভোল্‌ফ

(ক্যাপিটাল-এর প্রথম খণ্ড যাঁর নামে উৎসর্গীকৃত), স্যাম মুর (ক্যাপিটাল-এর অন্যতম ইংরেজি অনুবাদক) ও অধ্যাপক শোরলেমার (প্রখ্যাত রসায়নবিদ)। শেষোক্ত দুজন অনেক পরে এসেছিলেন। বাস, আর কেউ নয়। এঙ্গেলসের মতো বৈঠকী ও আমুদে মানুষের পক্ষে এ-ধরনের জীবন প্রায় একটা নির্বাসনের মতো মনে হতে পারে। কিন্তু এঙ্গেলস কক্ষনো অভিযোগ করতেন না। হৈ-হুল্লোড় তুলে আপিসে যেতেন, শপিং করতেন, ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াতেন, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে মদের আসর জমাতেন। তাঁকে দেখে মনে হতে পারত জীবনটাকে তিনি চুটিয়ে উপভোগ করছেন, জীবনের কাছে তাঁর আর কিছু চাইবার নেই। টুসি লিখছেন, অবশেষে এই দাস-জীবন থেকে এঙ্গেলসের মুক্তির দিনটি যেদিন এল, শুধু সেদিন-ই বোঝা গেল এই কুড়িটি বছর ধরে এঙ্গেলস কী সহ্য করেছেন। সেদিন আপিসে যাবার আগে এঙ্গেলস বলেছিলেন, 'আঃ। আজই শেষ বার।' এমনভাবে বলেছিলেন যে টুসির মতো অল্পবয়সী মেয়েরও মনে হয়েছিল, বহুকালের এক বন্দী যেন মুক্তির উল্লাস প্রকাশ করছে।

টুসি লিখছেন, "কয়েক ঘণ্টা পরে আমরা সবাই গেটের সামনে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। তাঁর বাসাবাড়ির উল্টো দিকের ছোট মাঠ পেরিয়ে আমরা তাঁকে আসতে দেখলাম। শূন্যে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে, গান গাইতে গাইতে, উদ্ভাসিত মুখে তিনি আসছেন। তারপরে আমরা উৎসবের জন্যে টেবিল সাজালাম, শ্যাম্পেন পান করলাম, কী খুশি যে লাগছিল। আমার বয়স তখন ছিল খুবই কম, এসব ঘটনা ভালো বুঝতাম না, কিন্তু এখন ভাবতে বসলে আমার চোখে জল আসে।"

ওদিকে লণ্ডনের মেইটল্যাণ্ড পার্কের একটি বাড়িতেও সেদিন প্রচণ্ড অস্থিরতা। মার্কস অপেক্ষা করছেন কখন এঙ্গেলস এসে পৌঁছবেন। পৃথিবী না উল্টোলে যিনি কাজ বন্ধ করেন না এমন মানুষও কাজে মন বসাতে পারছেন না। কেন? না, প্রিয়বন্ধু কুড়ি বছর পরে ঘরে ফিরছে। ঘর বৈকি। মাত্র দশ মিনিটের হাঁটাপথ পেরোলেই যেখানে একের সঙ্গে অপরের দেখা হতে পারে—এর চেয়ে বড়ো আশ্রয় বড়ো নির্ভর আর কী হতে পারে। কুড়ি বছর পরে এঙ্গেলস ঘরেই ফিরছিলেন।

সারারাত্তির দুই বন্ধু ঘুমোন নি। পানীয় সামনে নিয়ে মন উজাড় করে

গল্প করেছিলেন। এ-ঘটনা ১৮৭০ সালের সেপটেম্বর মাসের। তিন বছর আগে এই সেপটেম্বর মাসেই প্রকাশিত হয়েছে ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ড। অনেকগুলো পত্রপত্রিকায় ক্যাপিটালের সমালোচনাও লিখেছেন এঙ্গেলস। দুই বন্ধু কি সেদিন রাত্রে ক্যাপিটাল নিয়েই আলোচনা করেছিলেন? বাইশ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার। মাঝখানের উনিশটি বছর জুড়ে রয়েছে ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীর দুর্ধর্ষ সংগ্রাম, দুঃসাহসিক সংগঠনের পত্তন। রয়েছে আরো অনেকগুলো যুগান্তকারী রচনার ইতিহাস। সারা রাত্তির ধরে দুই বন্ধুর আলোচনায় এসব ঘটনার প্রত্যেকটিই কি রেখাপাত করেনি?

আমার তো মনে হয় দুই বন্ধু সেদিন রাত্তিরে, হয়তো বা নিজেদের অজান্তেই, বিজয়োৎসব পালন করেছিলেন। শেকল ছাড়া যাদের হারাবার কিছুই ছিল না তারা সেই ইস্তাহারটিকেই হাতিয়ার বানিয়ে ইতিমধ্যে বিশ্বজয়ে বেরিয়ে পড়েছে। অনেক রক্তপাত, অনেক মৃত্যু পেরিয়ে দুই বন্ধু আবার মিলিত হয়েছেন আসন্ন-শীত লণ্ডনের নিভৃত একটি কক্ষে। দুই বন্ধু নিশ্চয়ই ইতিহাসের ধাবমান রথচক্রের গতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার থেকে ক্যাপিটাল—মাত্র উনিশ বছরের ব্যবধানে যুগ থেকে যুগান্তরে পা দিয়ে দুই বন্ধু সেদিন ইতিহাসেরই অংশ হয়ে উঠেছিলেন যেন।

আজো তাই মনে হয়, মার্কস ও এঙ্গেলস দুটি মাত্র নাম কিছুতেই নয়, দুটির নামের উচ্চারণে অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য এক ইতিহাস।

ডোরাকাটার অভিসারে

শের জঙ্গ

[আগেব সংখ্যাব পব]

আমাব ডান হাতেব দিকে একটু পেছনে একটা মযূব খুব কাছ থেকে হঠাৎ আচমকা চিল চিৎকাব কবে উঠল। সাঁঝ রাত্তিবেব নিটোল স্তব্ধতা আমাব কানেব কাছে খান খান হযে ভেঙে পডল। আমাব বুকেব ভেতবটা ধডাস্ ক'বে উঠল। দেখতে দেখতে বনে যত মযূব ছিল সবাই সে ডাকের ধুযো ধ'রে কিছুক্ষণেব মত সাবা বন চিল চিৎকারে কাঁপিযে তুলল। কাছাকাছি ঝোপঝাড থেকে একটা শম্বব সেই সঙ্গে গুরুগম্ভীব গলায 'টাঁক-টাঁক' আওযাজ জুড়ল আব সঙ্গে সঙ্গে গলা সপ্তমে তুলে চিতলের দল কাঁপা কাঁপা স্বরের মূর্ছনাব শম্ববেব আওযাজ ডুবিযে দিল।

প্রায মিনিট পনেবো ধ'বে চলল সেই স্বব বিচিত্রা—প্রথমে জলদতালে শুরু হযে তারপব ঢিমে তাল, শেষটায অন্তরায উঠে নৈসগিক সঙ্গীতেব নৈঃশব্দ্যে মিলিযে যাওযা।

নিশি-উন্মথিত স্বপ্নের মত সাঁঝরাত্তিব থিতিযে বসল গুরুগম্ভীব স্তব্ধতা নিযে—সাবা বন জুড়ে আবাব তেমনি বিবাজ কবতে থাকল কীটপতঙ্গেব স্বাভাবিক গুঞ্জন আর থেকে থেকে পশুপাখিব চিৎকার।

বসে আছি টান টান হযে। সমস্তক্ষণ একটা কী-হয কী-হয ভাব। আপাদ-মস্তক টনটন করছে। এমন সময শেযালেব পাল ভযার্ত গলায থেকে থেকে

ডাকতে শুরু ক'রে দিল—'ফে ‥উ', 'ফে‥ উ'। বুঝতে পারলাম বাঘ ধারে কাছেই আছে। কিন্তু কোথায় ?

ঠিক তারপরই আমাব ডান হাতের দিকে মাড়ানো ঘাসেব মধ্যে অত্যন্ত কাছে খুব আস্তে সব্ সব্ আওযাজ পেলাম। ঘাড সোজা রেখে চোখের তাবা দুটো ডানপাশেব বগেব দিকে ঠেলে দিলাম। দিতেই আমাব চোখদুটো কোটব থেকে যেন বেবিযে আসতে চাইল। চোখে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার মাথা ঘুবে যাবাব যোগাড হল। একটা মুহূর্ত। তাব ভেতব আমাব মনের মধ্যে যেন ঝড বযে গেল।

স্বপ্ন, না মাযা, না এ আমাব মতিভ্রম ? সন্ধ্যাব ঘনাযমান আবছাযা অন্ধকারে দৈত্যকায এক বাঘ সামনেব থাবা দুটো মুড়ে তার অবিশ্বাস্য রকমেব প্রকাণ্ড মাথাটা নুইযে নিজের গা চাটছে। তাব ধডটা ঘাসেব ওপর ছড়ানো। যেন কোন আল্‌সে কুকুব পেছনেব পাযেব ওপর ভর দিযে সাষ্টাঙ্গে শুযে আছে। ঘাড সোজা ক'বে তাকাবাব দরুন তার ল্যাজেব সবটা আমাব নজবে পডছিল না।

বাঘটা এল কেমন কবে ? এলই বা কখন ? এসব কিছুই আমাব মাথায ঢুকছিল না। একটা পাতাও নডল না, একটা ডালও ভাঙল না, ঘাসের একটা ডগা ছেঁডাবও শব্দ হল না। বাঘটা এসেছিল একেবারে ছাযাব মতন—ঘুণাক্ষবেও কাউকে কিছু সে জানতে দেয নি।

আমি একেবাবে দাঁতে দাঁত দিযে নিশ্বাস চেপে নিথব নিঃস্পন্দ হযে ব'সে বইলাম। দৃষ্টি খাড়া। চোখেব পলক পর্যন্ত ফেলছি না।

ঐ অবস্থায ব'সে থেকে আমাব পক্ষে কিচ্ছু কবা সম্ভব নয। যেদিকটায আমাব অসুবিধে বাঘ ঠিক সেই দিকটাতেই ব'সে. আমার বন্দুকেব নলটাও ভুল দিকে ঘোবানো। তাব চেযেও খাবাপ, বন্দুকটা আমাব কোলের ওপর শোযানো—কাঁধে বসিযে টিপ ক'রে মারা তো দূর অস্ত্।

বন্দুকটা বাগিযে ধ'বে আমাব মুঠোটা এত এঁটে বসেছে যে, আঙুলেব বডাগুলো টাটিযে উঠেছে। একগাদা চোখ ধাঁধানো রং হুস্ ক'বে বিরাট ভাবে ঝিলিক দিযে উঠে কোন বকম শব্দ না ক'বে রংচঙে ছাযাব মতন যখন সামনে পা বাডাল, মনে হল উত্তেজনায এক্ষুণি আমাব স্নাযুগুলো ছিঁডে যাবে।

বাঘ সামনের দিকে হাঁটছিল। যেদিকে আমার বন্দুকের নল তার ডান দিক দিয়ে। আমি তার ফুস্‌ফুসের জায়গায় স্বচ্ছন্দে গুলি বেঁধাতে পারি।

আস্তে আস্তে, খুব আস্তে আস্তে আমি বন্দুকটা ওঠাতে থাকলাম। যখন আরেকটু হলেই বন্দুকটা আমি কাঁধের ওপর বসাতে পারি। সেই সময় একটি মাত্র উলুঘাসের ডগায় বন্দুকের নলের ঘষা লেগে গেল। তাতে যদি আওয়াজ হয়েও থাকে, কোন মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয়ের এ সাধ্য নেই যে সে আওয়াজ ধরে। যেখানে আমি ব'সে আছি বাঘ তার আট গজ দূরে। শব্দটা তার ঠিক কানে গেছে। মুখে একটা বীভৎস ভাব এনে অমনি সাঁ ক'রে সে ঘুরে দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার জবাবে আমার হা'তেও বন্দুকের একমাত্র সচল ঘোড়াটি নড়ে উঠল।

আমার বন্দুকের বজ্রনির্ঘোষে বনের নৈঃশব্দ্যই যেন আরও প্রকট হল এবং বাঘ আর আমার মাঝখানে খাড়া ক'রে তুলল পুরু ধোঁয়ার একটি যবনিকা।

ঘাব্‌ড়ে গিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে আমি জোরজার ক'রে পেছন দিকটা খুলবার চেষ্টা করলাম—যাতে চেম্বারটা খালি ক'রে তাজা কার্তুজ ভরতে পারি। মাথায় যেন আমার বজ্রাঘাত হল, যখন দেখলাম বিকেলে হাত থেকে প'ড়ে গিয়েও বন্দুকের নষ্ট হওয়ার যেটুকু বাকি ছিল এখন গুলির ধাক্কায় এবং সেইসঙ্গে উদ্‌ভ্রান্তের মত আমার ঝাঁকানির চোটে তার দফা একেবারে রফা হয়ে গেছে। কুঁদোটা খসে বেরিয়ে এসেছে এবং সম্পূর্ণ দুখানা হওয়া বন্দুকটা এখন আমি হাতের মধ্যে ধ'রে আছি।

তখনও আমার সামনে ঘন ধোঁয়ার আড়াল। বাঘ আমাকে বা আমি বাঘকে—কেউই কাউকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আমি আওয়াজ শুনে বুঝতে পারছিলাম মাটির ওপর সে আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে পড়ছে। আর তার ক্রুদ্ধ গর্জনে বনের নৈশ নৈঃশব্দ্য ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে।

আর ঠিক তারপরই তার কণ্ঠনালী থেকে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘায়িত আর্তস্বর 'আ-উ-উ-উ'—শব্দটা ক্ষীণ হতে হতে গলাটা বুঁজে এল—তারপর আর কোথাও কোন শব্দ নেই।

ধোঁয়া কেটে গেল। দশাসই চ্যাঙ্গা আমার ঠিক সামনেই টান টান হয়ে শুয়ে। চিরনিদ্রার মধ্যেও রাজার মত তাকে কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে।

আমার ঘড়িতে তখন ছ'টা বেজে চল্লিশ। আরও মিনিট দশেক অপেক্ষা

ক'বে তবে আমি জাযগা ছেড়ে নামলাম। বাঘেব গাযের কাছে গিযে তাব ল্যাজে হাত দিলাম। দিযে মনটা বিশ্রী বকমেব খাবাপ হযে গেল। সেইসঙ্গে আবাব মনে মনে একটু গুমবও হল। বাঘের মাথার কাছে বসলাম।

এবপব বনেব সেই ঘনাযমান ছাযার পর্দাব আডাল থেকে দেখা দিলেন ভুবা চাচা। গ্রামে তিনি আদৌ যান নি। কেননা আমাকে তিনি একা জঙ্গলে ফেলে যাবেন এটা ভাবা তাঁব পক্ষে অসম্ভব ছিল। কাছাকাছি একটা গাছে উঠে ডালপালাব আডালে তিনি ঘাপ্‌টি মেবে ব'সে ছিলেন। তিনি সব কিছু স্বচক্ষে দেখেছেন এবং স্বকর্ণে শুনেছেন। হুড়মুড় ক'বে গাছ থেকে নেমে এসেই আমাব কপালে তিনি চুমো খেলেন। তাবপব আমাকে একা বেখে বনেব একপাশে চ'লে গিযে কী একটা গাছ থেকে একমুঠো পাতা ছিঁড়ে নিযে এলেন। তারপব সেই পাতা দুহাতে ধ'বে বনরাজাব মৃতদেহে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলেন।

দুজনেই তাবপব ফিবে গেলাম গ্রামে—এক বুড়ো গর্বে আর আনন্দে ডগমগ হযে আর তাব চেলা এক নওজোযান ছোকবা গর্বে আব আনন্দে বুক ফুলিযে।

আমাব বাঘ মারবাব খবব শুনে গোটা গ্রাম এসে আমাকে ছেঁকে ধবল, হরিণনযনা মেযেটিও ছিল সেই দলে। উত্তেজনায ঘন ঘন তাব নিশ্বাস পডছিল এবং এও ঠিক যে, বোম সাম্রাজ্যেব পতনে উত্থানে আমাব হৃদয যত না আন্দোলিত হত, তাব চেযে ঢের বেশি আন্দোলিত হযেছিল তাব সূচ্যগ্র বক্ষাববণেব পতনে উত্থানে।

•

আমাব দিনলিপিতে চ্যাঙ্গা প্রসঙ্গে আমি লিখেছিলাম :

> ২৮।১০।২৪—শেষ অবধি চ্যাঙ্গাকে কাল সন্ধ্যেবেলায আমার গুলিব মুখে প্রাণ দিতে হল। একগোছা লোহাব গুলি তাব ঘাড়ে লেগে ঘাডটাকে ভেঙে দেয়। খোলেব ভেতব ঠাসা হাবিজাবি জিনিসগুলোও তাব ক্ষতস্থানে পাওযা গেছে।
>
> নাকেব ডগা থেকে ল্যাজের ডগা পর্যন্ত মেপে দেখা গেল ১০ ফুট ১১ ইঞ্চি লম্বা। বাবাব মতে, অসাধাবণ বকমেব বড়

বাঘ। এব ঘাডেব চাবপাশে প্রায সিংহেব কেশরেব মত অস্বাভাবিক বকমের বড ঘন চুল।

সামনেব বাঁ পা-টা ছিল খোঁড়া, পাযের দ্বিতীয আঙুলেব কাছে একটা বাক্‌শট গুলি বিঁধে আঙুলটা দু ভাগ ক'বে দিযেছিল। মনে হয চোটটা বহুদিন আগেকার—দড়কচডা মেবে জাযগাটাতে কালশিটে দাগ পড়ে গেছে।

এই লেখাব নিচে বাবাব স্বহস্তে লেখা একটা নোট রযেছে

শিকাব একটা মহৎ খেলা। এই খেলার কোন নিযমকানুনই তুমি মানো নি। তোমাব বরাত ভালো যে, তুমি আস্ত ফিবতে পেবেছ। লাখে একজন মিলবে যে তোমাব মত নিযতিকে এমনভাবে প্রলুব্ধ কবাব পবও প্রাণ নিযে ফিবে এসেছে এবং পবে সে গল্প করেছে। ভাগ্যক্রমে তবে গিযেছ ব'লে যেন আঙুল ফুলে কলাগাছ না হয। এটাকে বলতে পাবো, কাঁচাহাতের পয, কিন্তু, হায, এ জিনিস বেশিদিন চলেও না, বাব বার ঘটেও না।

শিকারেব সমস্ত আদবকাযদা সব সময মেনে চলবে, তা কবতে গেলে তোমাব দরকার প্রথমত যাকে শিকাব করছ তার প্রতি এবং দ্বিতীযত অস্ত্রেব প্রতি মনোযোগ।

সব সময মনে বাখবে, শিকার মানে শুধু জানোযাব মারা নয, হত্যাব চেযে ঢেব বড জিনিস হল শিকাব। শিকাবে হত্যাব ব্যাপাবটা নেহাৎই গৌণ।

অনুবাদ সুভাষ মুখোপাধ্যায

•

[পবেব সংখ্যায় 'আগে জখম পবে খুন']

•

পুস্তক-পরিচয়

কলিযুগের গল্প : সোমনাথ লাহিড়ী ॥ মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা-১২ ॥ ছয় টাকা ॥

১৩২৯ সালে—আমার চার বছর বয়েসের সময়—হেয়ার স্কুলের ছাত্র সোমনাথ লাহিড়ী 'ভগবানের চেয়ে বড়ো' নামে যে গল্পটি লিখেছিলেন তাতে একজন ছোটগল্প লেখকের চমকপ্রদ সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ সাহিত্যিক হওয়া সোমনাথ লাহিড়ীর পক্ষে সম্ভব হল না—উত্তর-জীবন তাঁকে সক্রিয় রাজনীতির উত্তাল তরঙ্গে টেনে নিয়ে গেল। তারপরের ইতিহাস বাংলাদেশের জানা।

কিন্তু খরধার রাজনীতিক সোমনাথ লাহিড়ী নিজের সাহিত্যিক-সত্তাকে সম্পূর্ণ ভুলতে পারেন নি। তাঁর রাজনৈতিক রচনার ফাঁকে ফাঁকে একটি-দুটি ছোটগল্প অনিয়মিতভাবে তিনি লিখেছেন। কখনো তাতে কালের কঠিন যন্ত্রণা, কখনো ভণ্ডামি আর মূঢ়তার বিরুদ্ধে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গের শাণিত আক্রমণ, কখনো জীবন-মমতার অকৃত্রিম উদ্ভাস। পনেরো-ষোল বছর আগে এই গল্পগুলো প্রথম সংকলিত হয়ে যখন 'কলিযুগের গল্প' নামে আত্মপ্রকাশ করে—তখন সাহিত্য-পাঠকদের তা চঞ্চল করেছিল। কোনো কোনো গল্পের নিষ্ঠুরতম বাস্তবতা তখন প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে আনতে চেয়েছিল· '১৯৪৩'-ই তার উদাহরণ।

এতদিন পরে অনেকটা বর্ধিত এবং অল্প মার্জিতরূপে 'কলিযুগের গল্প' আবার ছাপা হয়েছে। এর প্রয়োজন ছিল—এ বই হারিয়ে যেতে দেওয়া যায় না। রাজনৈতিক নেতা সোমনাথ লাহিড়ীর রচনা বলে নয়, সাহিত্য-বিচারে সে চিন্তা গৌণ : বস্তুত এই বই সাহিত্যিকেরই লেখা এবং একটি স্মরণীয় গল্প-সংকলন। জীবনবাদী, বস্তুতান্ত্রিক এবং সিদ্ধলেখনী গল্পলেখক এতে যুদ্ধ ও মন্বন্তরের সেই বীভৎস দিনগুলির নির্ভুল দলিল রেখেছেন ('১৯৪৩', 'উনিশ শো-চুয়াল্লিশ'), দেখিয়েছেন আইনের রসিকতা ('আইনের তালিম'), পূর্ববাংলার কারাগারে একটি রাজনৈতিক কর্মী মেয়ের দানবিক অত্যাচারের মধ্যেও মৃত্যুঞ্জয় সংগ্রাম ('কামরু আর জোহরা')

—যা আলজিরিয়ার জামিলা বেইকুদকে মনে পড়িয়ে দেয়— : 'তার' গল্পের মধ্য দিয়ে ফুটেছে মরণান্তিক আহত জওয়ান আর জেনারেল-গিন্নীর হারানো বেড়ালের প্রসঙ্গে মূল্যবোধের অফিশিয়াল তারতম্য। 'চর্ম' এইরকম আর-একটি তিক্ত ব্যঙ্গের চূড়ান্ত—সনাতন হিন্দু জওলাপ্রসাদ ফুটবলের চামড়াকে অস্পৃশ্য মনে করেন, বাড়ির ঝি ক্যুসুমি জল তুলতে গিয়ে ইঁদারায় পড়ে মরলেও জল অপবিত্র হওয়ার ভয়ে অচ্ছুৎ নামিয়ে তাকে উদ্ধার করা যায় না, কিন্তু ক্যুসুমির 'উত্তপ্ত ও মসৃণ গাত্রচর্ম' জওলাপ্রসাদকে অশুচি করে না। ধর্মবোধের কী অপূর্ব উদাহরণ।

নিছক রসসৃষ্টির জন্য গল্পগুলো লেখা হয় নি—বলাই বাহুল্য। বিশুদ্ধ প্রচার সাহিত্য হয়না, তাও ঠিক। কিন্তু জীবন যেখানে এগিয়ে এসে নিজের বক্তব্য সত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে—তখন অন্তত আবার সাহিত্য-বুদ্ধি তাকে প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা বলে না। 'কলিযুগের গল্প'-এর বক্তব্যধর্মিতা জীবনাতিরেক নয়—জীবন-সংস্থিত। সাহিত্যেই তা সত্য হয়ে উঠেছে। 'তর-তম' থাকতে পারে—তবু অসংকোচে বলা যায়, নীরক্ত কৃত্রিম গল্পের ভিড়ে বহুদিনের পর এই বই আবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাদ আনল। 'All propaganda is not literature, but all literature is propaganda' চীনের গোর্কী লু স্যুন বলেছিলেন। এই মত আমি মানি। তাই সোমনাথ লাহিড়ীর গল্পগুলোকে অভিনন্দন জানাতে আমার দ্বিধা নেই।

অন্য পাঠকেরা কী বলবেন জানি না, কিন্তু আমার সব চাইতে ভালো লেগেছে 'সম্পত্তি' গল্পটি। 'ফাউ' রচনাটি ইতিপূর্বে পড়েই চমৎকার লেগেছিল, আর-একবার পরম আনন্দে ওটা পড়া গেল।

—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বিবিধ প্রসঙ্গ

এঁদের ভুলবেন না

আজ অনেকেই ভুলে গেছেন। অপেক্ষাকৃত তরুণেরাও জানেনই না। অথচ এককালে মৈমনসিংহের হাজং কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কথা লোকের মুখে মুখে ফিরত।

১৯৪৩ সাল। গারো পাহাড়ের সন্নিকটবর্তী নালিতাবাড়িতে সেবার বাঙলার প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন। তখনও বাঙলাদেশ ভাগ হয় নি। সারা বাঙলা জুড়ে কৃষক আন্দোলনের জোয়ার তখন।

নালিতাবাড়িতে সম্মেলনে সমবেত হয়েছেন বাঙলার সমস্ত জেলার কৃষক প্রতিনিধিরা। প্রকাশ্য সম্মেলনের দিন সমস্ত প্রতিনিধি চকিত হয়ে শুনলেন, পাহাড়ের দিক থেকে বন্যার কলরোলের মতো শব্দতরঙ্গ ভেসে আসছে। সভাপতিমণ্ডলীর উচ্চ মঞ্চ থেকে দেখা গেল—পাহাড়ের ঢাল বেয়ে লাল নিশান উড়িয়ে হাজার হাজার হাজং কৃষক সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর মতো নেমে আসছে সম্মেলনে যোগ দিতে।

তখন সোভিয়েত লালফৌজের দেশরক্ষার সংগ্রামের অপূর্ব বীরত্ব-কাহিনীতে সবাই উদ্দীপ্ত। লালটুপি পরা ঐ কৃষক বাহিনীকে দেখে সেদিন অনেকেরই মনে হয়েছিল হয়তো ওরাই ভবিষ্যতে বাঙলার লালফৌজ হিসেবে গড়ে উঠবে।

কৃষক নেতাদের সে-আশা ও বিশ্বাস অন্তত আংশিকভাবে পূর্ণ হয়েছিল। কৃষকদের তেভাগা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল গারো পাহাড়ের পাদদেশে সমগ্র হাজং অঞ্চলে। বিপুল উদ্দীপনা তাদের মধ্যে। কিছুতেই তারা পরাজয় মানবে না, মাথা নোয়াবে না। তখন সারা বাঙলায় মুসলিম লীগের শাসন। সরকার বিপুল এক সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী পাঠালেন। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে গুলিতে মারা গেলেন ৮০জনের মতো। রাণীপুর ময়দানের সংঘর্ষে নিহত হলেন হাজং কৃষক নেতা অনন্ত, তুবরাজ, ক্ষীরোদ প্রভৃতি নয় জন। লেঙ্গুরা সংঘর্ষে মারা গেলেন রেবতী, শঙ্খমণি, সারথি (কাঙালের স্ত্রী) প্রভৃতি ১৯ জন। বাহেড়াতলী সংঘর্ষে নিহত হলেন রাসমণি ও সুরেন।

পূর্ব বাঙলার জেলে পুলিশী নির্যাতনে প্রায় ২৫জন প্রাণ হারান।

অপূর্ব এঁদের বীরত্ব-কাহিনী। সে কাহিনীর সবটুকু কখনো প্রকাশিত হয় নি।

তারপর পাকিস্তান হলো। তখনও এঁদের উপর নির্যাতন পুরোমাত্রায় চলছিল। আসাম ও পাকিস্তানী পুলিশ-বেষ্টনীর মধ্যে দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ থেকে অল্পদিনের মধ্যে অনাহারে অচিকিৎসায় প্রায় পাঁচ শতাধিক প্রাণ হারালেন।

অবশেষে এঁরা ধীরে ধীরে আশ্রয়ের সন্ধানে ছড়িয়ে পড়লেন আসামের অনেকগুলি জেলায়। সেখানে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় প্রাণ হারিয়েছেন গজেন্দ্র রায়, বিশ্বেশ্বর সরকার, নয়ন সরকার, ললিত সরকার (২ নং), রজনী সরকার প্রভৃতি।

সম্প্রতি মারা গেছেন কাঙালদাস সরকার। বিপন্ন কাঙালদাসের চিকিৎসার জন্য সাহায্যের আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু সাহায্য পৌঁছবার আগেই তিনি চলে গেছেন।

আমাদের যতটুকু জানা আছে—ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে আমাদের পরিচিত প্রায় ৫।৬ জন এখন বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্যের আশায় কোনোক্রমে টিঁকে আছেন। যে কোনো মুহূর্তে তাঁদের জীবনাবসান হতে পারে।

এঁদের অনেকেই কৃষক-সংগ্রামের সুপরিচিত বীর। এঁরা সকলেই ছিলেন পূর্বপাকিস্তানে বীর যোদ্ধা মণি সিংয়ের সহকারী।

মণি সিং এখন পাকিস্থান সরকারের কারাগারে। অসহায়ভাবে তিনি তাঁর সহযোদ্ধাদের মৃত্যুর খবর শুনছেন।

এই বীর কৃষক-যোদ্ধাদের প্রতি আমরা আমাদের কর্তব্যপালন করি নি। যারা তাদের বীরদের সম্মান করে না, অনাহারে মরতে দেয়—সেই কৃতঘ্নদের উন্নতি বা অগ্রগতি অসম্ভব।

সম্প্রতি মৈমনসিংয়ের বন্ধুরা এই বীর যোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য একটা কমিটি গঠন করেছেন। আমরা সংবেদনশীল সকলের কাছেই আবেদন করছি, এই কমিটির সঙ্গে সহযোগিতায় এদের বাঁচাবার চেষ্টায় অগ্রসর হোন।

প্রমথ ভৌমিক

জাতীয় সংহতি ও বৃহৎ সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়া

গত জুন মাসে ১৯ থেকে ২২শে পর্যন্ত শ্রীনগরে নবগঠিত জাতীয় সংহতি পরিষদের অধিবেশন হয়ে গেল। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে পাঁচ জন মন্ত্রী, প্রত্যেকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, সংসদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিভিন্ন শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত পাঁচজন সভ্য সহ ৫৫ জন প্রতিনিধির এই অধিবেশনে যোগদান করার কথা ছিল। দলগুলির মধ্যে স্বতন্ত্র ও সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল যোগদান করে নি। স্বতন্ত্রের প্রশ্ন ছিল অধিবেশনের চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে। আর সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল এই জাতীয় অধিবেশনে যে কোনো ফল লাভ হবে, তা বিশ্বাস করে না। জনসংঘ দল এই অধিবেশন ভালোভাবে গ্রহণ করতে না পারলেও, যাতে "দুষ্ট লোকেরা কোনো দুষ্কৃতিকর কিছু না করতে পারে" সেই কারণে শেষপর্যন্ত নেতা শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ীকে যোগদানের নির্দেশ দেয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও এই অধিবেশনে শতাধিক বিষয়ের আলোচনার মধ্যে শেষপর্যন্ত কোনো বিষয়েই সিদ্ধান্ত হবে না সন্দেহ প্রকাশ ক'রে এই অধিবেশন বর্জন করার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। তাঁরা দাবি করেছিলেন যে আলোচনায় সাম্প্রদায়িকতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সেই দাবি পূরণ করার আশ্বাস পেয়েই কমিউনিস্ট নেতা শ্রীভূপেশ গুপ্ত অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। অধিবেশনের প্রাক্কালে অন্যান্য অংশগ্রহণকারী সভ্যদের সঙ্গে আমারও যথেষ্ট সন্দেহ ছিল—শ্রীনগরে কি হবে। বাংলাদেশের প্রায় সবগুলি বৃহৎ সংবাদপত্র প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটাকেই একটা তামাশা বলে মনে করেছিল। কিন্তু অধিবেশনের যৎকিঞ্চিৎ সাফল্যে এদের হতাশা কেটে গিয়ে তা চাপা ক্রোধে পরিণত হয়েছে। ঠিক তেমনি ক্রোধে ফেটে পড়ছে জনসংঘ ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের দুটো কাগজ—'পাঞ্চজন্য' ও 'অর্গানাইজার'। তাদের সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়েছে সম্মেলনের দুইজন দুঃসাহসী বক্তার উপর। এঁরা হচ্ছেন শ্রীভূপেশ গুপ্ত ও শ্রীমতী সুভদ্রা যোশী, যদিও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভি পি. নায়েক ও অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডী সাম্প্রদায়িকতা-সম্পর্কিত কমিশনে বেশ আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি

ডঃ গজেন্দ্রগদকাব মৃত্যুদণ্ডেব বিবোধী হওযা সত্ত্বেও, দাঙ্গাকাবীদেব প্রতি মৃত্যুদণ্ড ও বেত্রাঘাতেব শাস্তিব প্রস্তাব কবাতে পরিষদেব সভ্যদেব মনে গভীব বেখাপাত কবে। কাযেমী স্বার্থেব সেবক বৃহৎ সংবাদপত্রেব ক্ষোভ হওযা স্বাভাবিক। কাবণ দিনেব পব দিন তাঁবা যেভাবে সাম্প্রদাযিকতাব শস্তা ব্যবহাব ক'বে কাগজেব বিক্রিব হাব বাড়িয়েছেন—তা বাংলাদেশেব জনসাধাবণেব অগোচব নয। পবিষদ অনেককিছু কবতে পাবে নি, কিন্তু স্বল্পমেযাদী (আইন ও শৃঙ্খলা) ও দীর্ঘমেযাদী (শিক্ষা ও সাহিত্যকলা) যে-সব প্রস্তাবকে কার্যে পবিণত কবাব জন্য জনসাধাবণেব মধ্যে এক বিবাট আন্দোলনেব পথ প্রশস্ত ক'বে দিযেছে—সেই সম্ভাবনায প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি যে নতুন ষড়যন্ত্রেব জাল বুনছে—তার আভাস সাম্প্রতিক সোভিযেত-বিবোধী জিগিবেব মধ্যেই সুস্পষ্ট।

শান্তিময বায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কস-চর্চা

কার্ল মার্কসেব জন্মেব অর্ধশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে মার্কস-পাঠ এবং ব্যাপকতর মার্কস-চর্চাব সূত্রপাত ঘটবে—এটাই প্রত্যাশিত। দুঃখেব বিষয, এখানে-ওখানে কিছু বিচ্ছিন্ন প্রযাস ছাড়া স্থাযী কোনো ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। তবু এই বিচ্ছিন্ন প্রযাসগুলির মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-সংসদ আযোজিত কার্ল মার্কস সংক্রান্ত পাঁচদিনব্যাপী সেমিনাবটি (২৪-২৮শে জুন) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে-পবিমাণ ছাত্রছাত্রী প্রতিদিন আলোচনাগুলি শুনেছিলেন, এবং যে-সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হযেছিল, তাতে আজকেব তরুণ সমাজেব মার্কস-জিজ্ঞাসা সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসাহিত হওযার কাবণ আছে।

বিশ্ববিদ্যালযেব আশুতোষ হলে আলোচনাচক্রেব উদ্‌বোধন কবেন উপাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন। বিশ্বমানবেব উপব মার্কসেব চিন্তাধাবাব শাশ্বত প্রভাবেব কথা উল্লেখ ক'বে তিনি আলোচনাব সূত্রপাত কবেন। অধ্যাপক বরুণ দে জার্মানিতে শিল্পবিপ্লবেব অভ্যুদয, তরুণ মার্কসেব উপব তাব প্রভাব, নতুন উৎপাদনী-শক্তিব সঙ্গে পুবনো উৎপাদন-সম্পর্কের

সংঘাত এবং তরুণ মার্কসেব চিন্তায সর্বহারাশ্রেণীব বিপ্লবী ভূমিকাব কথা নিযে আলোচনা কবেন। ১৮৪৪ সাল পর্যন্তই ছিল তাঁব আলোচনাব সীমারেখা।

অধ্যাপক হেমন্তকুমাব গঙ্গোপাধ্যায মার্কসীয দর্শন সম্পর্কে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বক্তব্য রাখেন। "প্রথানুসারী দার্শনিকেবা চিবকাল একটি সমস্যা নিযে মাথা ঘামিযেছেন: জগৎ আছে, না নেই। মার্কস শুধু জগতের অস্তিত্বকেই স্বীকার ক'রে নিলেন তা নয, এই জগৎ পরিবর্তনকেই দার্শনিকেব কাজ বলে চিহ্নিত করলেন।" একদিকে হেরাক্লিটাস, এপিকিউবাস এবং রাসেল, অন্যদিকে সাংখ্য, চার্বাক ও বৌদ্ধ দর্শনের নানা প্রতিতুলনা দিয়ে তিনি দর্শনের ইতিহাসে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে একটি গুণগত বিকাশ বলে আখ্যা দেন, এবং দর্শন-জিজ্ঞাসা মূলে যে বাঁচার প্রেরণা, 'জার্মান ইডিওলজি' থেকে উদ্ধৃতি সহ তা আলোচনা করেন।

'মার্কসবাদ ও আধুনিক জগৎ' শীর্ষক আলোচনায অধ্যাপক পরিমলচন্দ্র ঘোষ নয়া-উপনিবেশবাদের বিপদ, তার বিরুদ্ধে নতুন পর্যাযের সংগ্রাম (যার আদর্শ দৃষ্টান্ত ভিযেতনাম) নিযেই মূলত আলোচনা করেন। মার্কসবাদের বিভিন্ন ধরনের বিকৃতি সম্পর্কে তিনি সাবধানবাণী উচ্চাবণ করেন। ফ্রান্সেব ঘটনাবলীব মূল্যাযন প্রসঙ্গে তিনি বলেন: ছাত্রবা কোনো শ্রেণী নয এবং বিপ্লবের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীই অপবিহার্য উপাদান। হিংসা বা অহিংসা—এর কোনোটাই মার্কসবাদেব সমার্থক নয। মার্কসবাদ বিপ্লবেব দর্শন, সঠিক সমযে বিপ্লবী অভ্যুত্থানেই মার্কসবাদেব প্রাযোগিক সার্থকতা।

সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তবণেব বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অধ্যাপক কল্যাণ দত্ত অত্যন্ত মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। ভাবতবর্ষেব পটভূমিতে ধনতন্ত্র বিকাশেব বাধা, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চাপ এবং মহাজনী প্রথাব বিস্তাব সম্পর্কে তিনি বহু তথ্যাদি পেশ কবেন।

অধ্যাপক অমল মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক নির্মল বসুবায চৌধুবী 'মার্কসবাদ ও মানবতাবাদ' সম্পর্কে আলোচনা কবেন। মার্কসবাদেব আর্থনীতিক, সামাজিক সকল দিকই যে মানব-কল্যাণেব জন্যই উদ্দিষ্ট—অধ্যাপক মুখোপাধ্যাযের এই ছিল মূল বক্তব্য। বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য সমালোচকদেব মত খণ্ডন ক'বে তিনি বলেন, পূর্ববর্তী চিন্তাবিদ্‌বা স্ব স্ব কালীন

রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে চেয়েছেন, প্রকৃত মানবকল্যাণ থেকে তাঁদের চিন্তা অনেক দূরে। অধ্যাপক নির্মল বসুরায় চৌধুরী এপিকিউরাস ও হেগেলের মানবতাবাদে মার্কসীয় মানবতাবাদের উৎস নির্ণয় করেন এবং মার্কসের রচনাবলীর কিছু অলিখিত বিষয়—যেমন, সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানবিক মূল্যবোধ—সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মার্কসবাদ যে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে সান্ত্বনা, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়েরও আকর্ষণ—কথা প্রসঙ্গে একথাও তিনি উল্লেখ করেন।

আলোচনাচক্রের উপসংহারে অধ্যাপক পরিমলচন্দ্র ঘোষ বলেন, মানুষ মার্কসকে দিয়ে মানবতাবাদ বিচার করা যথেষ্ট নয়, মার্কসবাদের মধ্যে যে মানবতাবাদী উপাদানসমূহ রয়েছে—তাই আসলে আলোচ্য বিষয়।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মার্কস ক্লাব

সম্প্রতি অধ্যাপক সুশোভন সরকারকে সভাপতি ক'রে মার্কসবাদ আলোচনা করার জন্য একটি সংস্থা গড়ে উঠেছে, নাম মার্কস ক্লাব। নানা সমস্যা মার্কসবাদ-সম্মতভাবে অধ্যয়নতো বটেই, তাত্ত্বিক অর্থেও মার্কস অধ্যয়নের বিষয় এই ক্লাবের কর্মসূচীতে আছে। পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট মার্কসবাদীদের অনেকেই ইতিমধ্যে এই ক্লাবের সদস্য হয়েছেন।

মার্কস-স্মারক-আলোচনা

কার্ল মার্কসের জন্মের দেড়শতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে যেসব উদ্‌যাপনকারী কমিটি গ'ড়ে ওঠে, মার্কস মেমোরিয়াল কমিটি ও হোমেজ টু মার্কস কমিটি তাদের মধ্যে বিশিষ্টতার দাবি রাখে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে হোমেজ টু মার্কস কমিটি গঠিত হয়। ইউনিভার্সিটি ইন্সটিট্যুটে গত ৫ই মে মার্কসের দেড়শততম জন্মদিনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে মার্কসের স্মৃতি উদ্‌যাপনের জন্য একটি সভা ডাকা হয়। শ্রীগঙ্গাধর অধিকারী, শ্রীভবানী সেন ও শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী ঐ সভায় মার্কস ও তাঁর যুগান্তকারী ভূমিকাকে স্মরণ ক'রে বক্তৃতা দেন। তা ছাড়া হোমেজ টু মার্কস কমিটি নানা স্থানে বক্তৃতামালা ও আলোচনা সভার ব্যবস্থা করে।

ভাবত-সোভিযেত মৈত্রী সমিতি, ভাবত-গণতান্ত্রিক জর্মান প্রজাতন্ত্র মৈত্রী সমিতি, শান্তি সংসদ ও কযেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিব উদ্যোগে মার্কস মেমোবিযাল কমিটি গঠিত হয। এঁবাও বিভিন্ন অঞ্চলে মার্কসেব যুগান্তকাবী প্রতিভাব স্মবণে সভা কবেন। বহুক্ষেত্রে এই দুটি কমিটি একযোগে সভাসমিতিগুলিতে আলোচনাব জন্য বক্তাব ব্যবস্থা কবেছিলেন। খিদিবপুবেব শ্রমিক অঞ্চলে মার্কস-স্মবণ সভাব সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এঁবা ছাডাও পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু কিছু সংস্থা, ব্যক্তি ও বাজনৈতিক পার্টিব উদ্যোগে মার্কস-স্মারক-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয। ভাবত-জর্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র মৈত্রী সমিতিব পক্ষ থেকে হোমেজ টু মার্কস নামে একটি উল্লেখযোগ্য স্মাবক সঙ্কলনও প্রকাশিত হযেছে।

শুভব্রত রায়

যুব উৎসব থেকে ফিরে

গঙ্গার পাড থেকে বাঁক নিযে, মযদানেব গা ঘেঁষে একটু এগোতেই পথটা হৈচৈ ক'বে উঠল। স্পুটনিকেব গতি বুকে নিযে সাদা বং-এব গেটটা সগর্বে দাঁডিযে। ঠিক মাঝখানে শক্ত ক'বে লেখা 'যুব উৎসব।' বিকেল থেকেই সহস্র কণ্ঠেব কলবব। ন-দিন ধ'বে। পথ পেবোলেই অন্ধকাব। মযদানেব আবছা আলো। আব, এপাবে আলোয আলোয একাকাব। গানে-কথায-হাসিতে-ঘৃণায-তারুণ্যে চঞ্চল বর্ণজি স্টেডিযাম। ন-দিন ধ'বে।

প্রথম দিকে সংশয ছিল। সংস্কৃতি-জগতের মানুষেব মধ্যে ছিল প্রশ্ন। সস্নেহ প্রশ্ন। '৬৫ সালে হযেছে যুব উৎসব। তাবপব কত কাণ্ড ঘটে গেছে বাঙলাদেশে। ভাবতবর্ষে। যুব উৎসব প্রাঙ্গণেব ঠিক পাশে অ্যাসেম্বলি হৌসেব ভেতবে-বাইরে। তিন বছব পবে আবাব যুব উৎসব। সংশয ছিল, কাবণ উৎসবেব কতো পুবনো মুখ ম্লান হযে গেছে। মবিযা হযে গেছেন কতজন· কেউ হতাশায মবিযা, কেউ গোঁডামিতে। কিন্তু সংশয কাটিযে ওঠাব জেদও ছিল। নতুন মুখগুলো চোযাল শক্ত ক'বে পোস্টাব এঁকেছে। করতেই হবে। হতেই হবে। জেদেব কাবণটা তাঁদেব তারুণ্য। আব একটা কাবণ, তাঁবা সবে মিছিল সেবে ফিবেছেন। কেউ কেউ জেল থেকে।

মেদিনীপুব, মালদা, বাঁকুড়া, ২৪ পবগণা কিংবা হাওড়া, মেটেবুরুজেব বন্ধুদেব সঙ্গে তাঁদেব মিছিলে দেখা হয়েছে। দেখা হয়েছে জেলে, দেখা হয়েছে পুলিশেব গুলিব মুখে। তাই জেদ তাঁদেব সীমাহীন। নেমে পড়েছেন তাঁবা চোযাল শক্ত ক'বে। কবতেই হবে। আব তাঁদেব জেদ অনুভব ক'বে সংস্কৃতি জগত অথবা খেলাধূলাব মাঠের মানুষবাও তাঁদেব প্রশ্ন পাব হয়ে এগিয়ে এসেছেন। নাঃ, যেতেই হয়। ছোকরাগুলো দেখছি -। ইত্যাদি।

আর উৎসব শুরু হতেই···। প্রথম দিনই বোঝা গেল জেদটাব জোর কোথায। কলকাতাব চাবদিক থেকে যৌবনে উত্তপ্ত মিছিল এসে মিলিত হল ময়দানে। সেই ময়দান। মিছিলেব ময়দান। সংগ্রামেব ময়দান। ববি ঠাকুবেব ময়দান। এবারেব ময়দান—ভিয়েতনামেব ময়দান। স্লোগানে, পোস্টাবে, ঘৃণায়, উত্তাপে আব আবেগে অস্থিব বিশাল তারুণ্যেব মিছিল। ইউসিসেব সামনে গিয়ে ফেটে ফেটে পড়ল ঘৃণা আব ক্রোধ। ভিয়েতনামেব লড়াকু মানুষগুলোব জন্যে আপনতাবোধ। শ্রীভি. কে. কৃষ্ণ মেনন সে মিছিলেব পুবোভাগে। তাঁব পাশে ছিলেন বনগাঁব তরুণবা, তাঁদেব পাশে মেদিনীপুবেব যুবকবা। তারুণ্যেব উত্তাল ঢেউ মফঃস্বলেব সমস্ত জেলা থেকে। কলকাতাব সমস্ত পাড়া থেকে। ধারে-কাছেব অসংখ্য কল-কাবখানা থেকে। ভিয়েতনাম যে আব শুধু একটা বাজনৈতিক সংগ্রাম নেই, একটা নৈতিক সংগ্রামেব প্রতীকে পবিণত হয়েছে, তাব প্রমাণ—উদ্যোক্তাবা ডাক্তার, মেডিক্যাল বিপ্রেজেণ্টেটিভ, ছোট-মাঝারি ওষুধেব প্রতিষ্ঠানেব সহযোগিতায বিপুল পবিমাণ ওষুধ সংগ্রহ কবেছেন আন্তর্জাতিক উৎসব কমিটিব আহ্বানে। টাকাও তুলেছেন ভিয়েতনামেব জন্যে। অথচ একদল তখনো সমানে চেঁচাচ্ছে: উৎসব বয়কট কবো। শোধনবাদী, বুর্জোয়া সংস্কৃতিব প্রচাবকেন্দ্র যুব উৎসব ধ্বংস করো—ইত্যাদি। তবু, এবারের উৎসবে যত লোক এল, এবাবেব মিছিলে যত লোক হাঁটল, এবারেব উৎসব যেমন ক'রে একটা আন্দোলনে পবিণত হল—তেমনটি আব কখনো হয় নি। হয়েছে, কিন্তু ঠিক এমন ক'বে হতে দেখিনি। প্রথম দিনেব পব দ্বিতীয় দিনেও ভিয়েতনামই বড় হয়ে বইল। শ্রীমেননেব বক্তৃতা থেকে শুরু ক'বে থিয়েটব ওঅর্কশপেব নাটক পর্যন্ত সব কিছু নিয়ে। প্যাভিলিয়নেব মাথাব ওপরে হো চি মিনেব বিশাল

ছবি, তার পাশেই রাইফ্‌ল হাতে ভিয়েতনামের নাম-না-জানা মুক্তিযোদ্ধার ছবি। সারা পরিবেশে একটি নাম, ভিয়েতনাম।

সারা মাঠ জুড়ে যৌবনের রঙে রঙে অস্থির পতাকাগুলো গঙ্গার বাতাসে উত্তাল। উৎসবের আলো চারদিকে। বড় গেটটা দিয়ে ঢুকেই 'মনীষা'র বই। পাশ ঘেঁষে পর পর নানা দেশের স্টল। তারপরেই উৎসব-মঞ্চ। মাঝখানে ষোলো মিলিমিটার চলচ্চিত্র-মঞ্চ। গোল মাঠে, তার ঠিক উল্টো দিকে, পঁয়ত্রিশ মিলিমিটার চলচ্চিত্র-মঞ্চ। সার বেঁধে চায়ের স্টল, নিশানা প্রতিযোগিতার কেন্দ্র, কত কি। (শুধু রাণাঘাটের পান্তোয়াই অনুপস্থিত।) এর পরেই উৎসবের প্রধান মুক্ত-মঞ্চ, স্টেডিয়ামের ঠিক সামনে। স্কোর বোর্ডের পেছনে যথারীতি ইনডোর।

প্রতিটি মঞ্চেই দেখার মতো অনুষ্ঠান। তার ওপর তিন মাসের সিনেমা না দেখার তেষ্টা। দু-দুটো সিনেমার ব্যবস্থা। ফলে সকলেরই অসুবিধা হয়েছে। কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখি। প্রতিবারই হয়। অনুষ্ঠানের মধ্যে চোখে না প'ড়ে পারে না গ্রামীণ সংস্কৃতি, বাঙলাদেশের নিজস্ব জিনিস প্রযোজনার প্রচেষ্টা। প্রতিবার শ্লথ হয়, এবারে গ্রামীণ-যুব-দিবসে উদ্দীপনার শেষ ছিল না। ছৌ, বোলান, গাজন, রণ-পা—এত সব একই দিনে একই মঞ্চে দেখে ফেলা বড় একটা হয়ে ওঠে না। আর-একটা জিনিস খুবই চোখে পড়েছে। প্রতিদিনই কিছু কিছু ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং আবৃত্তির ব্যবস্থা। নতুন বৈশিষ্ট্য না হলেও উল্লেখ করার মতো আর-একটি দিক হল খ্যাত শিল্পীর পাশাপাশি নবীনদের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শতকরা সত্তর জনই নবীন। নতুনদের মধ্যে অনেকেই রীতিমতো দাগ কেটেছেন। যেমন, নান্দীকার-এর পাশে নাটক করলেন অ্যামেচার ইউনিট। প্রতিটি দর্শককে তাঁরা তাঁদের জমির লড়াইয়ের নাটকে শেষ পর্যন্ত ধ'রে রেখেছেন। চলাচল-এর সঙ্গে একই দিনে থিয়েটার ওঅর্কশপ মঞ্চস্থ করলেন তাঁদের ছোট্ট কিন্তু মনে দাগ ফেলা নাটক, ''ভিয়েতনাম'। নবীনে-প্রবীণে মিলিয়ে সমগ্র অনুষ্ঠান খুবই আকর্ষণীয় হয়েছে, সন্দেহ নেই।

প্রতিবারই উৎসবে ব্যাপক আলোচনার ব্যবস্থা থাকে। এবারেও ছিল। আকর্ষণীয় বিষয় আর ভালো ভালো বক্তার সমাবেশ ঘটিয়েছেন উদ্যোক্তারা। কিন্তু এমন সময়ে এবং মঞ্চে আলোচনার ব্যবস্থা যে কিছুতেই কোনো

আলোচনা সভাই স্থবিচাব পায নি। বক্তাদের যে সময দেওযা হযেছে, তা-ও অপ্রতুল। শ্রোতাও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্বল্প সংখ্যক, সময আব মঞ্চ বাছাইযেব কার্যকাবণে। বিষয নির্বাচনেব ক্ষেত্রেও চিবাচবিত দৃষ্টিভঙ্গি বড বেদনাদাযক। বিশেষত যুব উৎসব ব'লেই। আজকেব তাকুণ্যেব নিদাকুণ ক্রোধ বিশ্বময যে কাণ্ডটা ঘটাচ্ছে ক্রমাগত (বাঙলাদেশও ব্যতিক্রম নয)— সে-সম্পর্কে উৎসবের তরুণরা কোনো আলোচনাব ব্যবস্থা কবেন নি। সমসামযিক সমস্যা নিযে মেলাই আলোচনা হযেছে, একই বক্তাকে পরপব তুদিন তুঘণ্টা একক বক্তৃতা করতেও শুনেছি, কিন্তু আজকের তরুণেব মনে মূল্যবোধ তথা মতাদর্শ নিযে যে প্রশ্ন, সে সম্পর্কে কোনো আলোচনা হয় নি। আর, বিতর্ক-অনুষ্ঠান কি বাঙলাদেশ থেকে উঠে গেছে ? আর একটি কথা। প্রমথ চৌধুরী শতবার্ষিকীর বছর এটি। তাঁর সম্পর্কে কি একটি আলোচনার ব্যবস্থা করা যেত না ?

এবারের উৎসবেব আরেকটি সফল অনুষ্ঠান কবি-সম্মেলন। কবি-সম্মেলন ব্যাপাবটা যে কি পবিমাণ জনপ্রিয হয়ে উঠেছে, তা বোঝা গেল সিনেমার টান এডিযে কবি-সম্মেলনে হাজিব বিপুল জনসমাগম দেখে।

কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পাওযা গেল না এবাবেব প্রদর্শনী। বিশেষ ক'বে যাঁরা অ্যাসেম্বলির গেট দিযে ঢুকেছেন, তাঁবা পডেছেন বিপাকে। আধা-স্টেডিযামেব তলায ব্যস্ত-যাতাযাতেব একপাশে প্রদর্শনীব জাযগাটা খুঁজে বার ক'বে দেখা গেল বড্ড বেচাবী বেচাবী লাগছে। অথচ তরুণ শিল্পীরা অমানুষিক পবিশ্রমে অসাধাবণ একটি প্রদর্শনী তৈবি কবেছেন। একমাত্র যুব উৎসবেই প্রতিবাব নানান নতুন বিষযেব ওপর নতুন ক'বে প্রদর্শনী তৈবি কবা হয। ভিযেতনাম, গণতন্ত্র, অটোমেশন প্রভৃতি নানা বিষযের ওপর আঁকা ছবিতে, ফটোতে প্রদর্শনীটি বীতিমতো ভালো হযেছে।

যুব উৎসবেব সমাবেশ বৃহত্তম সমাবেশে পবিণত হযেছে। সুস্থ পবিবেশে স্বাস্থ্যবান সংস্কৃতিব পবিবেশনা সফল হযেছে। তরুণের দল বিপুল উৎসাহ নিযে এসেছেন এবং গেছেন। কোনো সন্দেহ নেই, তিবিশ হাজাব দর্শককে 'দেবীগর্জন' দেখানোব পব সাবাবাত ধ'বে সামাজিক যাত্রা 'একটি পযসা' দেখানোটা একটা অ্যাচিভ্মেণ্ট। কিন্তু, কযেকটি প্রশ্ন তবু থেকেই যায। বিশেষত আগামী উৎসবেব কথা ভেবে।

একথা ঠিক, তরুণী-দিবসে সমস্ত মঞ্চে শুধু মেয়েদের ও শিশুদের অনুষ্ঠানই হয়েছে। কিন্তু ও-দিনের আলোচনায় যোগ দেওয়ার মতো একজন মহিলাকেও কি খুঁজে পাওয়া গেল না? গ্রামীণ-যুব-দিবসে গ্রামীণ সংস্কৃতি খুব সুন্দরভাবে হাজির হয়েছে। কিন্তু আজকের গ্রামাঞ্চলের বিপজ্জনক খাদ্য পরিস্থিতির ওপর একটা প্রস্তাব নিলে কি আরো ভালো হত না? প্রতিটি দিবসকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, কিন্তু সেই চিহ্নের সঙ্গে আরো একটু সামঞ্জস্য রেখে অনুষ্ঠান প্রয়োজনার ব্যবস্থা করলে হয়তো আরো ভালো হত। শ্রমজীবী-যুব-দিবসে 'দেবী গর্জন' কিংবা গণতন্ত্র বাঁচাও দিবসে 'যখন একা' অথবা গ্রামীণ-যুব-দিবসে নাটকের ওপর (বস্তাপচা একটি বিষয় সম্পর্কে) আলোচনা কি নিতান্তই অবান্তর নয়? যুব সঙ্ঘের তো ট্র্যাডিশন আছেই রক্ত দেওয়ার। উৎসব-প্রাঙ্গণে ভিয়েতনামের জন্যে রক্তদানের একটি কেন্দ্র খুললে কেমন হত? তবু, সব কিছু সত্ত্বেও, একথা বলতেই হবে যে, ইয়াংকি সংস্কৃতির অহরহ তাড়নার বিরুদ্ধে যুব উৎসব একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। প্রগতির নামে গোঁড়ামির বিরুদ্ধে এবারের উৎসব একটি সফল প্রতিরোধ। কারণ, বোধহয় এবারের উৎসবের মেজাজকে আগাগোড়া পরিচালনা করেছে একটি নাম: ভিয়েতনাম।

প্রকাশ উপাধ্যায়

দেহো আলো

মানুষ যখন জ্ঞানবিজ্ঞানের সদাপ্রসারিত দিগন্তে পৃথিবীকে নিত্যনতুন অনাবিষ্কৃত জগতের সঙ্গে পরিচিত করছে, ঠিক তখনই বিশ্বে অক্ষরজ্ঞান থেকে বঞ্চিত জনসাধারণের সংখ্যা হবে প্রায় একশো কোটি। অথচ কুড়ি বছর আগে জাতিসঙ্ঘে গৃহীত মানবাধিকার সংক্রান্ত সনদে বলা হয়েছিল "প্রতিটি মানুষেরই শিক্ষালাভের অধিকার আছে, শিক্ষা হবে অবৈতনিক, তার পরিধি অন্তত ন্যূনতমভাবে প্রাথমিক ও কার্যকরী দিকগুলি পূরণ করবে।" অথচ আজও সেই নিরক্ষরতার সমস্যা যৎকিঞ্চিতও সমাধান হয় নি। প্রতি বছর দু থেকে আড়াই কোটি অক্ষরজ্ঞানহীনের সংখ্যা বাড়ছে। এই সমস্যার কথা তরুণরাও ভাবছেন। আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক

যুব ফেডারেশনের উদ্যোগে উলান-বাতোরে এই সমস্যা নিয়ে একটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলান-বাতোর ছোট হলেও, ছবির মতো সুন্দর সাজানো শহর। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যুব-প্রতিনিধিরা ১৫-১৬ই মে সেখানে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রে মিলিত হন। বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের সহ-সভাপতি শ্রীদিলীপ চক্রবর্তী এতে সভাপতিত্ব করেন। সেমিনারের বিষয় ছিল 'নিরক্ষরতা দূরীকরণে যুব-সমাজের ভূমিকা'।

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার ১৯টি দেশের প্রতিনিধি এতে উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া চারটি আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। উত্তর ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, আফগানিস্থান ও জাপান প্রতিনিধি না পাঠালেও সম্মেলনের সাফল্য কামনা ক'রে বাণী পাঠিয়েছিলেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামের বীর যুবকদের সংস্থা তাঁদের দেশের সঙ্কটময় পরিস্থিতির কথা বিশ্লেষণ ক'রে তাঁদের অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ ক'রে তারবার্তা পাঠান এবং সম্মেলনের বিপুল সাফল্য কামনা করেন ও শুভেচ্ছা জানান। ইউনেস্কো এবং ফ্যাও অনুপস্থিতির জন্য ত্রুটি স্বীকার ক'রে সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণ পাঠাতে অনুরোধ জানান।

সম্মেলনে একটা মূল সুর বাজছিল, তা হল যদি সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ একযোগে কাজ না করে, তবে এই সমস্যা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। আর একটি কথা প্রায় সকলের বক্তৃতায় ধ্বনিত হচ্ছিল যে সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদের স্থায়িত্বের জন্য নিরক্ষরতা অন্যতম মূল কারণ।

সুতরাং স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রগতির জন্য সংগ্রাম ও সাক্ষরতার জন্য অভিযান উভয়ই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ, নয়া ঔপনিবেশিকতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাক্ষরতার অভিযানও অন্যতম শক্তিশালী অস্ত্র। পূর্ণ স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করার জন্য অথবা দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন পরিবর্তনের আন্দোলনে সক্রিয় যোগ দিতে হলে প্রথমেই দরকার নিরক্ষরতার বিলোপ। উদাহরণস্বরূপ মঙ্গোলিয়া ও অন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কথা বলা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্মকালে যে দেশ ছিল অনুন্নত, আর যার জনসংখ্যার সত্তর শতাংশই ছিল নিরক্ষর, আজ সেই

দেশ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আত্মিক সম্পদে পৃথিবীব সবচেযে সমৃদ্ধ দেশ হযে বিশ্বেব দববাবে পযলা স্থান ক'রে নিযেছে। ১৯৩৭ সালেব মধ্যেই সে দেশ নিরক্ষবতাব অভিশাপমুক্ত হয। বলা বাহুল্য, সমাজতান্ত্রিক আদর্শ চোখে আঙুল দিযে দেখিযে দিচ্ছে যে একমাত্র এই ব্যবস্থাতেই আর্থনীতিক, শিক্ষাগত ও আত্মিক উৎকর্ষ সর্বাপেক্ষা দ্রুত আযত্তে আনা সম্ভবপব।

এ সম্মেলন বিশ্বের যুবকদেব নিকটে নিবক্ষবতাব বিরুদ্ধে সংগ্রামেব জন্য আহ্বান জানিযেছে। সম্মেলন ইউনেস্কো, ফ্যাও প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংস্থাব কাছে প্রযোজনীয সামগ্রী ও উপকবণ দিযে সহাযতা কবার জন্য আবেদন জানায। প্রতিনিধিবা বিভিন্ন দেশেব সবকাবেব কাছে প্রতিবক্ষা ব্যযববাদ্দ থেকে মাত্র একদিনেব খবচ জনসাধাবণেব উপযুক্ত শিক্ষা ও নিবক্ষবতা দূব কবাব জন্য ব্যয কবতে অনুবোধ জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভিযেতনাম যুদ্ধে একদিনে যা ব্যয হয, তা দিযে জাতিসঙ্ঘেব তিনশো পঁযষট্টি বছবেব ব্যযনির্বাহ সম্ভব।

এ সম্মেলন যদিও বিশ্বগণতান্ত্রিক যুব সংঘেব উদ্যোগে আহূত হয, কিন্তু আলোচনা-চক্রেব সাফল্যেব কৃতিত্বেব অধিকাংশই মঙ্গোলিযা সবকাব ও সেই দেশেব বিপ্লবী যুব-সংস্থাব প্রাপ্য। নিবক্ষরতাব বিরুদ্ধে অভিযানে এই সম্মেলন একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ব'লে চিহ্নিত হযে থাকবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে তরুণ সমাজকর্মী পার্থ সেনগুপ্ত এই সম্মেলনে যোগ দিযেছিলেন।

সৌমেন নাগ

ফরাসী দেশে 'বিপ্লব' এবং ইতালি

দৃশ্য দুটি অদ্ভুত। শ-পাঁচেক তরুণ প্রবল চিৎকাবে আকাশ মাথায কবছে ইলেকশন ইজ ট্রিজন—নির্বাচন হল বিশ্বাসঘাতকতা। তাবপব ব্যারিকেড। আগুন। পুলিশের সঙ্গে "মোকাবিলা"। সবকিছু মিলে একটা ত্রাসের আবহাওযা। অন্য দৃশ্যটিতে একজন কমিউনিস্ট তরুণ বেডিও-টেলিভিশন-সংবাদপত্রেব মুহুর্মুহু ধমক ও ভয-দেখানো অগ্রাহ্য ক'বে দেওযালে পোস্টাব আঁটছে। নির্বাচনের পোস্টার। নযা-ফ্যাসিবাদী ছদ্ম-গলপন্থীরা তাকে টিপ

ক'বে গুলি ছুঁড়ছে। একবাব। দু-বার। তরুণটি লুটিযে পড়ছে মাটিতে। হাতে তাব তখনো নির্বাচন-সংগ্রামেব হাতিযাব—লাল কালিতে আঁকা পোস্টাব। তাব বক্তেব মতো লাল।

কোযেন বেনডিট, সববোন বিশ্ববিদ্যালযেব ছাত্র-বিক্ষোভেব গুরু, "লাল ড্যানি" নামে খ্যাত হযেছেন সম্প্রতি। বি. বি. সি. তাঁকে সমগ্র ইওবোপেব তরুণ বীবে পরিণত করেছে। আব এ-কাজে সহাযতা কবেছে গোটা ইওবোপেব বুর্জোযা প্রচাবযন্ত্র। তাঁব ছবি, তাঁব পোশাক ও প্রেযসী, তাঁব বাণী, তাঁব চলা-বলা সবকিছু নিযে গল্প-কাহিনী। বিপ্লবেব "পুবাতন ও অচল" মার্কসবাদী তত্ত্বকে কোণঠাসা ক'বে তিনি নাকি এক নতুন বিপ্লবী শক্তিকে মুক্তি দিযেছেন ইওবোপে, সমগ্র বিশ্বে। এমনি ধবনেব বার্তা অত্যন্ত গদগদ হযে প্রচাব কবছেন তাঁবা, যাঁবা বিপ্লবেব নামে শিউবে ওঠেন, সাবাবাত ঘুমোতে পাবেন না। আসলে ব্যাপাবটা কি?

"লাল ড্যানি"ব দলকে নতুন-ভাবেব-বাহক ব'লে যাঁবা ঘোষণা কবছেন, তাঁবা অতি সন্তর্পণে ইতিহাসকে ভুলে যাচ্ছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীব শেষভাগে এঁদেব প্রভাব রুশদেশে অনেক নাটক সৃষ্টি কবেছে। লেনিনেব লেখনীব তীব্র কষাঘাত অবিবত এঁদেব দাযিত্বজ্ঞানহীন, সুবিধাবাদী ও শোষকশ্রেণীব তাঁবেদাবী চবিত্র উদ্‌ঘাটন কবেছে। খোদ ব্রিটেনেও এঁবা আবির্ভূত হযেছেন মাঝেমাঝেই। এঁদেব যে তাত্ত্বিক ভিত্তি, তা-ও আদৌ অভিনব নয। অ্যানার্কিজম ইওবোপেব বেশ পুবনো বোগ। আপাতদৃষ্টিতে এদেব বিপ্লবীযানাব অবধি নেই। কিন্তু আসলে এদেব সমগ্র কর্মকৌশল পুবোদস্তুর ও গভীবভাবে সর্বহাবাব স্বার্থবিবোধী এবং প্রতিক্রিযাশীল। এ-সত্য বহুবাব প্রমাণিত হযেছে ইতিহাসে। আবেকবাব হল ফ্রান্সে।

কিন্তু ফ্রান্সেব হাজাব ছাত্র ও তরুণ হঠাৎ অ্যানার্কিস্ট হযে গেল কেন? নাকি এবা সবাই অ্যানার্কিস্ট নয? তাহলে ব্যাপাবটা কি? যতদূব জানা গেছে, সববোন বিশ্ববিদ্যালযেব ছাত্র-বিক্ষোভেব পেছনে তিনটি "বিপ্লবী" মতধাবাব প্রভাব আছে। ট্রটস্কিপন্থীদেব পাশে গিযে দাঁড়িযেছে অ্যানার্কিস্টবা, তাদেব সঙ্গে যোগ দিযেছে সম্প্রতিসৃষ্ট মাওবাদীব দল। রাজনীতিব ছাত্রমাত্রেই বোঝেন, এই ত্রিমূর্তি একত্রিত হওযাব ফল কি ফলতে পাবে। এবং ঠিক তাই ফলেছে ফ্রান্সে। কিন্তু ছাত্রদেব গণ-

বিক্ষোভেব সবটুকুই কি এই ত্রিমূর্তিব কর্ম ? যে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-তরুণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধনবাদী ব্যবস্থাব অচলাযতন ভেঙে ফেলাব জন্যে নিদারুণ সংগ্রামে লিপ্ত হলেন, তাঁদেব সংগ্রামী, প্রগতিশীল ভূমিকা কি এইভাবে ব্যাখ্যা ক'বে উডিযে দেওযাব মতোই লঘু ? নিশ্চযই না।

গোটা ইওবোপেব অবস্থাকে যদি বলা যায জটিল, ফ্রান্সেব অবস্থাটা তাহলে খুবই করুণ। বিশেষত বুর্জোযাদেব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। উপনিবেশগুলি হাতছাডা। বৃটিশ-মাকিন কুবেবদেব সঙ্গে পাল্লা দিযে বিশ্বেব বাজাব দখল কবাব মতো কোমবের জোব নেই। একচেটিযা অর্থনীতিতে মুনাফাব হাব ক্রমশ কমছে। জিনিসপত্রেব দাম বাডছে তো বাডছেই। কমন মার্কেট নিযে হবেকবকম টানাপোডেন। ব্রিটেনেব সঙ্গে গোলমাল। ইওবোপেব অভিভাবক আমেবিকাব সঙ্গে মন-কষাকষি। আব কমন মার্কেটেব অন্যান্য শবিকদেব সঙ্গে নানা ধবনেব অসমতা। সাধাবণভাবে সে-সব দেশের মজুবিব হাব ফ্রান্সেব চেযে বেশ চডা। অন্তত পাঁচ লক্ষ মানুষ বেকাবীব পোশাক পবে কাজ কাজ ক'বে হন্যে হযে ঘুবছে। এব সঙ্গে যদি যোগ কবা যায শিক্ষাব্যবস্থাব হালচাল, সামাজিক সম্পর্কগুলিব জটিল অবক্ষয ও মূল্যবোধেব সঙ্কট, কিংবা যন্ত্র ও মানুষেব মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, নৈতিকতাব নিদারুণ বিপর্যযেব কাহিনীগুলি, তাহলে হযতো বা মবিযা ফ্রান্সেব আসল চেহাবাব খানিকটা ধবা পডলেও পডতে পাবে।

সমস্যাগুলির ভাব পাষাণেব মতো। বক্তৃতা ক'বে সে-ভাব সবানো দায। ফ্রান্সেব যাঁবা মালিক, তাঁবা দ্য গলকে দিযে অনেকদিন ধ'বে বক্তৃতা করিযে করিযে পবিস্থিতিটা সামলে বেখেছেন ব'লে ভাবছিলেন। কিন্তু সে-ম্যাজিকটা যখন ফাঁস হযে যায ব'লে সন্দেহ হল, তখন তাঁবা পর্দা সবিযে মঞ্চে নেমে পডলেন। হিটলাবেব ছবিটা বুকেব ওপব এঁকে নিযে সমস্যাব জঞ্জাল সবাবাব কাজে নেমে পডলেন তাঁবা। আশ্বাস দিলেন, বেকাব-সমস্যাব সমাধান হযে যাবে—কিন্তু তাব জন্যে বিদেশী শ্রমিকদেব সরিযে দিতে হবে ফ্রান্স থেকে। যেন বিদেশী শ্রমিকবা লুটেপুটে খাচ্ছে দেশটাকে। আব তাঁবা হলেন জাতিব ত্রাতা—একটু লক্ষ্য কবলেই "মাইন্ কাম্ফে"ব ভাষা আব হিটলাবেব কণ্ঠস্বব খুঁজে পাওযা যায আজকেব ফ্রান্সে। অর্থনীতিব সংকট ? তা-ও মিটে যাবে শ্রম-আইন মেনে চললেই।

"বিদেশী চবে" ছেযে গেছে দেশটা। কাজেই, মানুষের ঘোরাফেবার ওপর বাধা-নিষেধ, শোভাযাত্রা-সংগঠনেব ওপব নিষেধেব বেড়া এবং এমনি কত কি! ওবা ভাবছে এমনি ফাসিবাদী কাযদায দেশটাকে চালাতে চালাতে, কোলোন পেবিযে, জার্মানিব পথে যেতে যেতে ··। এবা হল সেই দোকানেব দোকানদাব, যাব সাইনবোর্ডটাকে যতই ঘষা যাক, যতই মাজা যাক, যতই বং কবা যাক, হিটলাবেব ছবিটা কিছুতেই মোছে না।

শহর আব শহরাঞ্চলেব মধ্যবিত্ত, তাদেব ঘবেব তরুণ ছেলেবা দল বেঁধে ছাত্র হয, তাবা দেনার দাযে মাথা পর্যন্ত বাঁধা দিযে বসে আছে। বেতন যত বাড়ে, জিনিসের দাম বাড়ে ততোধিক। কাজেই কর্পোবেশনেব কাছ থেকে নেওযা ঋণ শোধ হয না কোনোদিনই। ভাবতবর্ষেব গবীব চাষীব মতোই দেনা মাথায নিযে এবা জন্মায। দেনাব ভারে কুঁজো হয়ে কোনোমতে বেঁচে থেকে, উত্তবাধিকারীকে দেনার দায উপহার দিযে মৃত্যুতে এদেব ঋণমুক্তি। দুটি পথ তাই এদের সামনে খোলা। হয সমস্ত কিছু ভেঙে চুবমাব ক'বে দেওযাব প্রতিজ্ঞা নিযে পথে বেবিয়ে পড়া, আব নযতো আত্মসমর্পণেব সহজ, অন্ধকাব, পিচ্ছিল অবমাননাব পথ বেছে নেওযা।

সবকিছু মিলিযে তাহলে চেহাবাটা কেমন দাঁড়িযেছে? ফ্রান্স তথা সাবা ইওবোপেব ধনবাদী সমাজটাতে পচন ধবেছে ভেতব থেকে। পালটে নেওযাব সামর্থ্য নেই। শিক্ষা-ব্যবস্থাব গা থেকে মান্ধাতাব আমলেব গন্ধ বেবোতে শুরু হযেছে। অর্থনীতিতে সঙ্কট প্রতিমুহূর্তে গভীবতব হচ্ছে। যান্ত্রিক সভ্যতাব মাহাত্ম্যে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিব নাড়িব টান আলগা হযে যাচ্ছে। অটোমেশন-মার্কা ব্যবস্থার দৌলতে মানুষ নিজেকে অসহাযেব মতো আবিষ্কাব কবছে নেহাতই একজন আউটসাইডাব হিসেবে। তারুণ্যেব আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন পূবণেব সমস্ত আশ্বাস যন্ত্র-পাথব-ইলেকট্রনিক-কাঠ-অ্যাটমিক-ষ্ট্যাটা-নাইট ক্লাব-কমিটি-সেক্স্-কমপিটিশনেব অদ্ভুত জালে হিংটিংছট হযে যাচ্ছে। মানবিক সম্পর্কগুলো হিম হযে উঠছে ক্রমশ। এই জটিল ব্যাপাবটাকে সহজ কবা মালিকের ক্ষমতাব বাইবে। তাবা তাই ফ্যাসিবাদী পথেব দিকে এগোচ্ছে পাযে পাযে। মানুষ তাব যোগ্য মর্যাদা পাচ্ছে না। তরুণ খুঁজে পাচ্ছে না আত্মবিকাশেব পথ। কেমনভাবে

যেন তাদের জীবনটা একটা কালো বঙেব দম-বন্ধ-হযে-যাওযা জালেব গাযে নাক গুঁজে ঝুলে ঝুলে চলেছে। কে যে চালাচ্ছে সমাজটাকে বোঝাই যায না। যৌবন এমন একটা দম-বন্ধ পবিবেশ বেশিদিন সহ্য কবতে পাবে না। সে ফেটে পডবেই। ফেটে পডছেও দিকে দিকে। ইতালিতে, ফ্রান্সে, জার্মানিতে, আমেবিকায—সর্বত্র।

এই ঐতিহাসিক ফেটে পডাব মুহূর্তগুলি আশ্চর্য সুযোগ উপহাব দিযেছে অ্যানার্কিস্ট-ট্রটস্কিপন্থী-মাওবাদী গোষ্ঠীকে। আব এই সুযোগ গ্রহণ ক'বে লাল ড্যানিব মতো গ্রেগবী পেক-মার্কা ছাত্র-নেতাবা হিবো হযে যাচ্ছে। অর্থাৎ, বিক্ষোভেব কাবণ নিঃসন্দেহে বর্তমান। তরুণ সমাজ অনেক নিপীডনেব সামনে দাঁডিযে কঠিন প্রতিজ্ঞা নিযে যে-সংগ্রাম কবেছেন, তাব বীরত্বও অপবিসীম। তাঁদেব এই দুঃসাহসী প্রতিবাদেব ফল যে সুদূবপ্রসাবী, সে-বিষযেও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই পঞ্চাশ হাজাবেব অচলাযতন ভাঙাব ধ্বনিকে বিভ্রান্ত ক'বে, তাঁদেব সংগ্রামেব বিপ্লবী চবিত্রকে পতিত ক'বে পাঁচশ কণ্ঠ চিৎকাব কবে উঠেছে· ইলেকশন ইজ ট্রিজন্। যদিও ভগবানের চেযে শক্তিশালী ফ্রান্সেব বীব শ্রমিকশ্রেণীব ঐক্য দিনেব পব দিন ফ্রান্সেব জীবনস্পন্দনকে "তিষ্ঠ" ব'লে দাঁড় কবিযে বেখে, অর্থনৈতিক সংগ্রামে জযলাভ ক'বে, সংগ্রামকে তখন বাজনৈতিক স্তবে উন্নীত কবেছেন। কাবখানাব ধর্মঘটকে জাতীয স্তবে নিযে গিযে গোটা দেশকে প্রগতিব পক্ষে দাঁড কবাতে সচেষ্ট তাঁবা, কমিউনিস্ট ও বামপন্থী শক্তিব নেতৃত্বে। কিন্তু "লাল ড্যানি"ব দল তখন কিছু বিযারেব বোতল আব পটকা হাতে ক'বে নিবিখবিহীন তাদেব বিপ্লবকে তখুনি সমাধা কবতে চায। বিপ্লবেব শর্তগুলি উপস্থিত থাক বা না-থাক, হঠকাবিতাব সুযোগ নিযে প্রতিবিপ্লব আসে আসুক, তাবা আব অপেক্ষা কবতে বাজি নয। অতএব, বিপ্লবেব একটা বিশেষ স্তবে, বিশেষ একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তে নির্বাচনটা রাজনৈতিক সংগ্রামেব বদলে হযে দাঁডাল বিশ্বাসঘাতকতা। কি ভীষণ মিল আমাদের দেশেব পোস্টাবে বন্দুক-আঁকা অতিবিপ্লবী গোষ্ঠীব সঙ্গে।

একশ বছবেবও আগে মার্কস-এঙ্গেলস ঘোষণা কবেছিলেন, ইওবোপকে তাডা কবে বেডাচ্ছে একটা ভূত—কমিউনিজমেব ভূত। কথাটা সেদিন যত সত্য ছিল, আজ তাব চেযে অনেক বেশি বাস্তবে পবিণত হযেছে।

আর অনেক যত্নে গড়া অচলায়তন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে দেখতে পেয়ে ইওরোপের বুর্জোয়াশ্রেণী মরিয়া। তাদের হাতে প্রধান অস্ত্র তাই এখন কমিউনিজমের জুজু। না। সোভিয়েত তথা পূর্ব ইওরোপীয় দেশগুলির বিপুল অগ্রগতির বাস্তব রূপ চোখে দেখার পর এবং সেসব দেশে ক্রমশ গণতন্ত্রীকরণের যে-পালা চলছে বিগত একযুগ ধ'রে, তা জানার পর—কমিউনিজমকে আর ভয়ানক একটা প্রেত বলে মানতে রাজি নয় ইওরোপের মানুষ। তার প্রমাণ ফ্রান্স-ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির বিপুল শক্তিবৃদ্ধি। তাহলে? দ্য-গলদের শেষ হাতিয়ারটি তারা উপহার পেল লাল ড্যানিদের কাছ থেকে। তাদের বেওয়ারিশ হল্লা, অরাজকতা, বিশৃংখল প্রোগ্রামবিহীন বিপ্লবের শস্তা ঢক্কানিনাদ, প্রায় অহেতুক আগুনে ঝলসানো পারীর লাতিন কোয়ার্টার, কমিউনিস্ট পার্টির সাবধানবাণী অগ্রাহ্য ক'রে অবিরাম প্ররোচনাদান ও পাণ্টা সরকারী অত্যাচার ·সবকিছু মিলিয়ে যে-ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি হল, তাকেই হাতিয়ার করল দ্য-গলের দল। তারা তাদের সমস্ত প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে সুকৌশলে প্রমাণ করতে লাগল—দিস ইজ কমিউনিজম—এই হল সাম্যবাদ। এই সাম্যবাদ কি চাও তোমরা? সাম্যবাদ ও বামপন্থা মানেই এই অরাজকতা। এই আগুন। এই বিনাশ। আমরা তো সংস্কারের পক্ষে। আমরা জানি, সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সংস্কার হয় নি নেপোলিয়নের আমল থেকে। আমরা করব সংস্কার। আমরা সংস্কার, পরিবর্তন, শৃংখলা আর সততার পক্ষে। আর ওরা? নিজের চোখেই দেখে নাও কমিউনিজম আর বামপন্থার অর্থ কি। এ-ব্যাখ্যা শুধু কমিউনিস্টদের সম্পর্কেই নয়। প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যাঁরা, তাঁদের সকলের সম্পর্কে। অ-কমিউনিস্ট জননেতা, লেফট ফেডারেশনের (F G D S) শ্রীমিতের্ঁা বলছেন "President De Gaulle and premier Pompidou played Political and Psychological trickery with the people. In practice, they invited Frenchmen to choose between the terrorists we would be and the honest men they would be."

এ-কথা ঠিক, ফ্রান্সের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া ও নয়া-ফ্যাসিবাদী শক্তিকে কোণঠাসা ক'রে ফেলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু

তাব জন্যে প্রযোজন ছিল একদিকে সমস্ত গণতান্ত্রিক বামপন্থী ও প্রগতিশীল শক্তিব সুদৃঢ ঐক্য, অন্যদিকে, শত্রু-শিবিবে দ্বন্দ্বেব পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার ক'বে সেখানে ভাঙন আনা। এই কাজদুটি কবাব ব্যাপাবে ফবাসী কমিউনিস্টদেব প্রচেষ্টা সফল হয নি, এমন সন্দেহ কবাব কারণ আছে। বরং উল্টোদিকে সালান প্রমুখ ফ্যাসিবাদী নেতাকে মুক্তি দিযে এবং ফ্রান্সেব সভ্যতা ঐতিহ্য সবকিছু বিপন্ন, 'কমি'ব দল ক্ষমতা দখল কবল ব'লে—এই জেহাদেব ভিত্তিতে দ্য-গল প্রতিক্রিযাব বাহিনীকে একত্রিত ক'রে ফেলতে পেবেছেন। প্রগতিব পক্ষেব শক্তিগুলিব মধ্যেকাব বিবোধও মেটানো যায নি পুবোপুবি। আব এই বকম একটা বিপজ্জনক পবিস্থিতিতে লাল ড্যানিব দল প্রাণপণে হাতিযার জোগান দিযেছে দ্য-গলকে। জনতার ওপরে শাবীবিক আক্রমণ ও প্রগতিব বিরুদ্ধে বাজনৈতিক আক্রমণেব হাতিযাব, বাজনৈতিক চেতনাব দিক থেকে পশ্চাৎপদ, মধ্যবিত্ত-চিন্তার অধিকারী এবং বক্ষণশীল মানুষকে ভয-দেখানোব হাতিযাব। এবং লাল ড্যানিব দলকে কমিউনিস্ট ব'লে চালাতে কষ্ট হয নি ফবাসী বুর্জোযাদেব বিপুল প্রচারযন্ত্রেব। কোযেন বেণ্ডিট বি বি. সি-তে ইণ্টাবভ্যু দিতে গিযে কার্ল মার্কসেব সমাধিতে ফুল-বেলপাতা দিচ্ছেন, বি. বি. সি.-ব ভাডায লণ্ডন পর্যন্ত উডে এসে উডোজাহাজ থেকে নেমেই দল বেঁধে ইণ্টাবন্যাশন্যাল গাইছেন, বুর্জোযা সমাজব্যবস্থা ভেঙে ফেলাব জন্যে প্রতিমুহূর্তে মুঠো পাকিযেই আছেন এবং ইত্যাদি। এমন আদর্শ চবিত্র পাওযা যাবে কোথায? এ-সুযোগ কি ছাডতে পাবেন বুদ্ধিমান দ্য-গল। তাঁব পুতুলকে তিনি ব্যবহার কবেছেন পুবোপুবিই। এবং এ-যাত্রা অন্তত পুতুল তাঁব সেবাও কবেছে চমৎকাব। মোদ্দা ফললাভটা কি হযেছে? এক কথায বলেছেন ফবাসী কমিউনিস্ট নেতা শ্রীওযালদেক বশে: "The fact that one Party, the Gaullists, was going to have a monopoly control constituted a great peril for democratic liberties and a big step towards the fascist development of the regime."

যে কমিউনিস্ট তরুণটি ফ্যাসিবাদেব গুলিতে প্রাণ দিযেছে, তাব মৃত্যু একটা লক্ষণ প্রকাশ কবে। সেই লক্ষণটুকু এবারে হাড-মাংস নিযে যে দানবের

চেহাবা নিতে পাবে, তাব হাত থেকে মাওবাদী কিংবা ট্রটস্কিপন্থী অথবা অ্যানার্কিস্টরাই কি রেহাই পাবেন? কিন্তু সেটা অন্য প্রসঙ্গ। কমিউনিস্টদেব সম্পর্কে তাঁদেব অভিযোগ, বিপ্লব শুরু হযে গিযেছিল, তোমরা শ্রমিকশ্রেণীকে শোধনবাদী শেকলে বেঁধে বাখলে ব'লেই বিপ্লবটা ঘটে উঠতে পাবল না। এখন নির্বাচনে নেমে ন্যাশনাল আসেম্বলিতে কিছু আসন বাডিযে নিতে চাইছ। এ হল নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা। রশে আগেই জবাব দিযেছেন এ অভিযোগেব। একটি একটি ক'বে বিপ্লবেব শর্তগুলিব অনুপস্থিতিব দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'বে দেখিযেছেন তিনি। তাবপব বলেছেন, বিক্ষোভ কিংবা বিদ্রোহ মাত্রেই সমাজতন্ত্র আনে না। ভুল সময, ভুল পথ বেছে নিলে দেশে সোভিযেত আসার বদলে ইন্দোনেশিযাব প্রেতটাও এসে পডতে পাবে। দ্বিমুখী আক্রমণেব সামনে দাঁডিযে ফবাসী কমিউনিস্টবা প্রতিবিপ্লবকে প্রতিবোধ কবেছেন বীবেব মতো। নির্বাচনে দ্যগলপন্থীদেব বিপুল জয এবং কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদেব বিবাট ক্ষতিব পটভূমিকায তাঁদেব এই ঐতিহাসিক বীবত্ব অনুভব কবা কঠিন। কিন্তু, ইতিহাস কিছুই ভোলে না। তাঁবাও এই ত্যাগ ও বীরত্বেব যোগ্য মূল্য পাবেন নিশ্চযই।

অথচ ওই ইওবোপেই আবেকটি দেশ আছে, যেখানকাব ছাত্র-বিক্ষোভ ও তারুণ্যেব আন্দোলন ফ্রান্সের মতো প্রতিক্রিযাব সহাযক হযে ওঠাব বদলে প্রগতিব হাতকেই শক্তিশালী কবেছে। দেশটি হল ইতালি। এবং মার্কিন অচলাযতনে মহাপঞ্চকদেব বিরুদ্ধে যে অদম্য অভিযান শুরু কবেছেন সে-দেশের পঞ্চকবা, ভিযেতনাম যাঁদেব মহামন্ত্র, সে-অভিযানেব ঢেউ ইওবোপে প্রথম এসে পৌঁছয ইতালিব উপকূলেই। এথেন্সে শত শত হিপিব দল হাতে ফুল নিযে, বুকে "যুদ্ধ কবো না, ভালোবাস্সো" ব্যাজ এঁটে, অভিযান কবে ভিযেতনামে মার্কিন হস্তক্ষেপেব বিরুদ্ধে, যুদ্ধ বন্ধ কবাব দাবিতে। ছাত্রবাও পথে নামে। সাম্রাজ্যবাদেব বিরুদ্ধে, নিজেদের দাবিদাওযা নিযে, শিক্ষা-সংস্কাবেব জন্যে ছাত্র-বিক্ষোভ ক্রমশ তুমুল হযে ওঠে। অ-ছাত্র তরুণবাও এসে যোগ দেয। সঙ্গে সঙ্গেই আসে পুলিশ, প্যাবা-মিলিটাবি, টিযাব-গ্যাস, চাবুক, গ্রেপ্তাব··· যাবতীয নিপীডন। ইতালিতেও "লাল ড্যানি"ব অভাব নেই। বীবেব মতো তাবা এসে শুরু কবল পুলিশেব "মোকাবিলা"। "দাঁতের বদলে দাঁত" নিযে নেওযাব আহ্বান জানাতে আবম্ভ কবল তাবা ছাত্রদেব কাছে। প্রবোচনা

সৃষ্টি ক'রে, আন্দোলনেব মূল ধাবাকে ভিনপথে পবিচালিত ক'বে, আন্দোলনেব ওপব আঘাত হানাব জন্যে সবকাবেব হাতে নতুন নতুন হেতু-উপলক্ষ আব সুযোগ জুগিযে দেওযাব দাযিত্ব পালন কবতে আরম্ভ কবল তাবা পরম উৎসাহে, মহাবিপ্লবী উদ্যমে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি তাদেব বিপ্লবী কাবাবে হাড হযে উঠল দেখতে দেখতে। পার্লামেণ্টেব ভেতবে-বাইবে কমিউনিস্টবা প্রথম সাবিব সেনা হযে লডাই শুরু কবল ছাত্রদেব দাবিদাওযা নিযে। কমিউনিস্ট-পার্টিব নেতৃত্বে পবিচালিত যুব-ছাত্র সংগঠন পূর্ণ দাযিত্ব সহকাবে পবিচালনা কবতে আবম্ভ কবল তারুণ্যেব বিক্ষোভ। অচিবেই তরুণ সমাজেব কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হযে পডল হঠকাবীব দল। ড্যানিদের লাল বং যে কতটা গোলাপী তা প্রকাশ পেল অবিলম্বেই। সেই আন্দোলন সংহত, ঐক্যবদ্ধ কবল তরুণদেব। প্রগতিশীল, বামপন্থী বাজনৈতিক ধাবাব পাশে এনে দাঁড কবাল তাদেব। এবং এব ঠিক এক বছব পবেই, ইতালিব জীবনে সবচেযে গুরুত্বপূর্ণ বাজনৈতিক আন্দোলন—সাধাবণ নির্বাচন—শুরু হল। এবং তখুনি বোঝা গেল প্রতিক্রিযাব বিরুদ্ধে সংগ্রাম পবিচালনাব সঙ্গে সঙ্গে হঠকারীদেব প্রতিবোধ কবাব দ্বিমুখী নীতিব তাৎপর্য।

ইতালিব মাটিতে ফ্যাসিবাদ নতুন ক'বে রূপ নিচ্ছে। তাদেব রাজনৈতিক সংগঠন ইতিমধ্যে বেশ কিছুটা শক্তিও সংগ্রহ কবেছে। বৃহৎ ধনিকদের বিরুদ্ধে তাদেব তুমুল সবব হুঙ্কাব আব জাতীযতাবাদী মোহ সৃষ্টিব প্রযাস—এই দুযেব দোলতে অভিজ্ঞতায় ও বুদ্ধিতে অপবিপক্ক, বাজনৈতিক দিগদর্শনে অপটু, বযসে যাবা তরুণ তাদেব কাছে এদেব আকর্ষণ বড কম নয। বিভিন্ন সমযে, এমন কি গত বাবেব (১৯৬৩) সাধাবণ নির্বাচনেও তাই দেখা গেছে, দক্ষিণেব তো বটেই, এমন কি উত্তব ইতালিবও বিপুল সংখ্যক তরুণ ইতালিব নযা ফ্যাসিস্ত দল সোশ্যাল মুভমেণ্টেব পাশে গিযে দাঁডিযেছে। কিন্তু এবারের সাধাবণ নির্বাচনে চেহাবাটায বদল ঘটল দারুণ ভাবে। ওই বযসেব তরুণবা তাদেব সংগ্রামেব অভিজ্ঞতায এবারে তাদেব নেতাকে চিনে নিতে ভুল কবে নি, পথ বেছে নিতে অসুবিধা হয নি তাদেব। সর্বত্রই কমিউনিস্ট ও বামপন্থী শক্তিব ভোট বেডেছে (২৫.৩% থেকে ২৬.৯%), এমনকি সাধারণভাবে বক্ষণশীল, কৃষিপ্রধান ও কমিউনিস্ট-বিবোধী দক্ষিণ ইতালিতেও প্রতিক্রিযাশীল শাসকগোষ্ঠীব পেছন থেকে জনসমর্থন বিপুল পবিমাণে সবিযে এনে প্রগতির

পক্ষে দাঁড করিযে দেওযাব ব্যাপাবে সে-দেশেব তারুণ্যেব সুশৃংখল আন্দোলন ও সচেতন অভিযানই অনেকাংশে দাযী।

ফ্রান্স ফ্রান্স, ইতালিও ইতালিই। কিন্তু ভাবতবর্ষেব সামনে শত-বঞ্চনায ক্ষুব্ধ তারুণ্যেব দৃষ্টিতে একটি বিস্মযেব চিহ্ন, অন্যটি জিজ্ঞাসাব। আমাদেব সংগ্রাম প্রতিক্রিযাব বিরুদ্ধে, জীবনেব জন্যে। খাদ্য, জমি, চাকবি, শিক্ষা, স্টেডিযাম কিংবা গণতান্ত্রিক অধিকাবেব প্রশ্ন থেকে শুরু ক'বে ভিযেতনামেব জন্যে সংহতি আন্দোলন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতিক্রিযাব সঙ্গে আমাদেব মোকাবিলা। কিন্তু কাবা যেন দেওযালে প্রবোচনাব পোস্টার এঁটে দিচ্ছে। কোযেন বেণ্ডিটেব দলেব মতোই তাবস্বরে চেঁচাচ্ছে: নির্বাচন হল বিশ্বাসঘাতকতা। নিজেদেব হতাশা ঢাকা দিতে আত্মতৃপ্তিব স্বার্থে অসম্ভব বিপ্লবীযানাব পোষাক গাযে চাপিযে তাবা প্রতিক্রিযাব হাতে গুঁজে দিচ্ছে, আক্রমণের সুযোগ, একটিব পব একটি জুজু যা দেখিযে এদেশের দ্য-গলরা মানুষকে ভয পাওযাতে পাবে। কাজেই, প্রসঙ্গতই প্রশ্নটা উঠে পডে। এদেশেব গোলাপী ড্যানিদেব সম্পর্কে আমবা সচেতন তো? আমাদেব পথটা পারী কিংবা বোম, কোনদিকে বাঁক নিচ্ছে?

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

বিয়োগপঞ্জী

বড়ে গোলাম আলি ও পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ

গত দুবছবে উত্তব ভাবতীয (হিন্দুস্থানী) সঙ্গীতেব দুই ইন্দ্রপাত ঘটে গেল।

এমনিতেই হিন্দুস্থানী কণ্ঠসঙ্গীতে আবদুল কবিম, ফৈযাজ খাঁ, জাফরুদ্দিন, নাসিরুদ্দীন ডাগব প্রভৃতিব মৃত্যুতে একটা বেশ বড়ো ফাঁক দেখা গিয়েছিল, এবাব পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুব ও বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবেব মৃত্যুতে যে ক্ষতি হল, শীঘ্র সেটা পূবণ হবাব কোনো আশা দেখি না।

দুজনেব গাযকী ও মেজাজ ভিন্ন প্রকাবেব—দুজনেই অবশ্য খেযাল-গাযক, তা হলেও পণ্ডিত ওঙ্কাবনাথের খেযাল ছিল প্রধানত ধ্রুপদাঙ্গেব, বড়ে গোলামেব গাযকী একেবাবে জাত-খেযালী। ধ্রুপদী আলাপচাবী ইদানীং ছেড়ে দিলেও, পণ্ডিত ওঙ্কাবনাথেব স্ফূর্তি ছিল ধীব শান্ত বাগবিস্তাবে, স্বব থেকে স্ববান্তবে আবোহণে, তাবপব শুরু হতো বাঁটেব কাজ ও লযকাবী। স্বভাবতই তান-অঙ্গে জোব পড়ত কম।

পণ্ডিত ওঙ্কাবনাথ ছিলেন উভচব। যেমন বড়ো গাযক ছিলেন তিনি, তেমনি শাস্ত্রীয সঙ্গীতেব ঔপপত্তিক বিচাবেও তাঁব অবদান যথেষ্ট। একাধিক সঙ্গীত-গ্রন্থেব বচয়িতা তিনি। তাছাড়া আবাব বিশ্বশান্তি আন্দোলনেব সঙ্গে সক্রিযভাবে যুক্ত থেকে তিনি কযেকবাব সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আমাদেব সঙ্গীত প্রচাব কবেন।

বড়ে গোলাম এব প্রায ঠিক উল্টো। নানাবকমের বিভিন্ন তানই ছিল তাঁব গানেব প্রধান অঙ্গ, আর কি সে তান—মোটা দানাব মুক্তোব মতো, আবাব কখনও সমুদ্রেব ঢেউযেব মতো আছড়ে পড়ছে প্রায তিন সপ্তক ধ'বে, কখনও সাধাবণ বোলতান নিটোল স্বব নিযে বেবোচ্ছে।

বলা বাহুল্য, ওঙ্কাবনাথ বড়ে গোলামেব কোনো তুলনামূলক সমালোচনা আমবা কবতে বসি নি—এককথায ওঙ্কাবনাথ যদি সঙ্গীতেব দার্শনিক, বড়ে গোলাম কবি।

এই প্রভেদ আরো বোঝা যেত, তাঁদেব আসবেব দ্বিতীয বা তৃতীয

গানে—ওঙ্কারনাথ তখন খেযাল ছেড়ে গাইবেন ভজন, ঠুংরি তাঁর গলায শুনেছি ব'লে মনে পড়ে না। গলাটি মন্দ্রমধুর, জোযারীতে ভবা, তেমনি যে-ভাব বিনা ভজন জমতে পাবে না, সেই ভাবে একেবাবে ভবপুব। তাঁব "যোগী মত্ যা", তাঁব "বন্দেমাতবম"—এতো ইতিহাস হযে বইল।

তেমনি বড়ে গোলামেব ঠুংবি-ভজন বিশেষ শুনেছি বলতে পাবব না, তবে তাঁব "হবি ওম্" বিখ্যাত ও বিশেষ জনপ্রিয। একাধিক আসবে দেখেছি, "হবি ওম্" দিযে শেষ না কবলে বড়ে গোলামেব নিস্তার নেই শ্রোতাদেব কাছে।

বড়ে গোলামেব ঠুংবি ছিল অবশ্যই পাঞ্জাবী, কিন্তু মজা এই যে, বেনাবসী-ঘব থেকে স্থবে কম যায না। তাঁব "আযে না বালম" তো সবাই জানে, কিন্তু বড়ে গোলাম যে নিজে ঠুংবিতে গান বাঁধতেন সেটা হযতো স্থবিদিত নয।

বিশেষ ক'বে গত কযেক বছবে পক্ষাঘাতে যখন তাঁব বাম অঙ্গ প'ড়ে গেছে (ভাগ্যেব কথা যে, আমাদেব স্ববযন্ত্র শবীবেব দক্ষিণদিকে অবস্থিত ব'লে তাঁব গলাব শব্দেব কোনো তারতম্য হয নি), তখন তাঁব ব্যাবামকে নিযেও তিনি গান বচনা কবেছেন।

দুজনেব গানেব এই আপাত-বিবোধী মেজাজেব জন্যই হযতো ওঙ্কাবনাথ সাধাবণত গাইতেন ভোববাত্রিব শেষ আসরে। তাঁব প্রিয বাগ ছিল বিভিন্ন প্রকাবেব তোড়ী, ভৈঁবো-বাহাব্, যোগিযা-কালেঙ্গবা প্রভৃতি, আব বড়ে গোলামেব সমধিক স্ফূর্তি ভূপালীতে, আর মালকোশে তো তিনি ছিলেন সিদ্ধ।

এই প্রসঙ্গে অনেক বড়ো বড়ো আসবেব স্মৃতি মনেব মধ্যে ভিড ক'বে আসছে, স্থানাভাবে কেবল একটি ঘটনাব উল্লেখ ক'বে শেষ কবি।

১৯৬৪ সালেব জানুযাবিতে কলকাতায যেদিন সাম্প্রদাযিক দাঙ্গা বেশ ছড়িযে পড়েছে, সে-বাত্রেই বড়ে গোলাম ডোভাবলেন সঙ্গীত কনফাবেন্সে শ্রোতৃমণ্ডলীব কাছে পেলেন অভূতপূর্ব সাড়া। গানও তাঁব যেন সেদিন চ্যালেঞ্জ হিসাবেই বিশেষভাবে খুলেছিল। শুরু কবলেন ভূপালীতে শিবস্তোত্র দিযে, পবে মালকোশ—আমরা যখন স্থবেব গভীবে মগ্ন, তখন হঠাৎ গান করতে করতে ভাবাবেগে তিনি ব'লে উঠলেন : "আচ্ছা, যে মূর্খবা দাঙ্গা

কবছে—তাদেব ধ'বে একটু গান শোনাতে পাবলে হতো না? সঙ্গীতে তাদেব মন ভিজে নবম হতো।"

আমাদেব গভীব শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কবি এই তুই অমব শিল্পীব স্মৃতিতে, সঙ্গে সঙ্গে আশা কবব, যে-কঠিন সাধনাব দ্বাবা এই তুই শিল্পীর সৃষ্টি সার্থক, সেই কঠিন সাধনা-মার্গ যেন আমাদেব সঙ্গীত-শিক্ষার্থী ছেলেমেযেবা জীবনেব ব্রত -ব'লে গ্রহণ কবেন।

দিলীপ বসু

হার্বার্ট রীড

এদেশে আমবা হার্বার্ট বীডকে প্রধানত কলা-সমালোচক—এবং মডার্ন আর্টেব একজন বিশিষ্ট প্রবক্তা—হিসেবে জানি। কিন্তু কবি দার্শনিক কাব্য-সমালোচক আব অন্যান্য নানা বিষযেব প্রবন্ধকাব হিসেবেও তিনি স্বদেশে-বিদেশে সুপবিচিত ছিলেন। মনীষাব গভীবতায আব জ্ঞানেব প্রসাবতায তাঁব এসব বচনাব অধিকাংশই বিশেষভাবে স্মবণীয।

হার্বার্ট বীডেব প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নেকেড ওযাবিযর্স' (১৯১৯) থেকে মৃত্যুব অল্প আগে এই সেদিন পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁব বইযেব সংখ্যা চল্লিশেবও বেশি। বিশেষভাবে উপভোগ্য ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত তাঁব আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধ সংগ্রহ 'দি কনট্র্যাবি এক্সপিবিযেন্স।' সাধাবণত বীডেব গদ্যবচনাব ভঙ্গিটা অলঙ্কাব বর্জিত, চলনটা একটু ভাবি, বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাধাবাকে সেটা খুব ঘনিষ্ঠভাবে অনুসবণ ক'বে চলে ব'লে তা মোটামুটি একমুখী। কিন্তু এই বইটিতে দেখা যাচ্ছে তিনি বীতিমতো বোম্যান্টিক, ভাষাটা তবতবিযে বযে চলেছে ঝর্ণাব স্রোতেব মতো, আব কল্পনাটা অত্যন্ত সজীব—বিশেষত ইযর্কশাযাবে নিজেব ছেলেবেলাব বর্ণনায।

বীডেব আত্মকাহিনীব এই নামটাই তাঁব ব্যক্তিমানসটিকে প্রকাশ কবছে। জীবনে নানাবকম পবস্পববিবোধী অভিজ্ঞতাব মধ্যে দিযে গেছেন তিনি: যুদ্ধবিবোধী প্যাসিফিস্ট তরুণ বীড প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিযেছেন, ট্রেঞ্চে বসে ক্রিশ্চিনা বসেটিব কবিতা পড়েছেন, 'মিলিটাবি ক্রস' সম্মান পেযে যুদ্ধ থেকে ফেবাব পব সোভিযেত বিপ্লব আব সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে আগ্রহী হযে

উঠছেন, কিন্তু একদিকে ফেবিযান সোসাইটি আব অন্য দিকে লণ্ডন অ্যানার্কিস্ট গ্রুপ—এই দুইযের টানে দোল খেতে খেতে তিনি শেষ পর্যন্ত তলস্তযবাদেব দিকে ঝুঁকেছেন। ১৯৫৩ সালে তিনি 'সাব' উপাধিতে ভূষিত হবাব পবেই আবাব যুদ্ধবিবোধী আন্দোলনে সক্রিয ভূমিকা নিযেছেন, 'ব্যান দি বম্ব' আন্দোলনেব সামিল হযে ট্রাফালগাব স্কোযাবে শত শত মানুষেব সঙ্গে বাস্তা আটকে বসে থেকেছেন।

সেই সঙ্গে বীড আবাব অটল অনড ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। এমন কি, তাঁব মতে আজকেব এই আত্মঘাতী সমাজে প্রতিবাদ ঘোষণাব "বোধহয" একমাত্র উপায হল নিজেব স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠিত কবা। 'দি কনট্র্যাবি এক্সপিবিযেন্স'এর মুখবন্ধে তিনি বলছেন, "The death wish that was once an intellectual fashion has now become a hideous reality and mankind drifts indifferently to self-destruction. To arrest that drift is beyond our individual capacities . to establish one's individuality is perhaps the only possible protest"—আজকেব পুঁজিবাদী সমাজে উদাবনীতিক বুদ্ধিজীবী-মানসেব বৈপবীত্যটুকু বীডেব এই উক্তিব মধ্যে খুব স্পষ্ট।

চারুকলাব ক্ষেত্রে হার্বার্ট বীড ছিলেন বোধহয বজাব ফ্রাইযেব পবেই সবচেযে প্রভাবশালী সমালোচক-ভাষ্যকার। এই দুজনেব মানসিক পার্থক্যটুকু কালানুক্রমজনিত। ফ্রাই নিজে ছিলেন চিত্রকব, পোস্ট-ইম্প্রেশনিজম পর্যন্ত এসে থেমেছিলেন তিনি। বীড চিত্রকব ছিলেন না, তাই বিশেষ কোনো একটি নন্দনতত্ত্বগত আব বচনাকৌশলগত অবস্থান গ্রহণ কবাব দিকে তাঁব প্রবণতা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। জ্ঞানেব ব্যাপকতা আব চিন্তাব গভীবতাব দিক থেকে—এবং আন্তর্জাতিক শিল্পেব আসবে একেবাবে সামনেব সাবিব আসনেব অধিকাবী হিসেবে—হযতো বীড ফ্রাইযেব চেযেও বেশি প্রভাব বিস্তাব কবেছেন।

ত্রিশেব দশকেব গোডাব দিকে বীড ছিলেন হেনরি মুব, বেন নিকলসন, বাববাবা হেপওযর্থ, পল ন্যাশ প্রভৃতিব মতো খ্যাতিমান ভাস্কব-চিত্রকবেব ঘনিষ্ঠ বন্ধু—যাঁদেব তিনি বলেছেন "a nest of gentle artists" কিন্তু তাব আগেই সুববিযালিজমেব আলোডন জেগেছে—শিল্পেব জগতে সেই প্রশান্তিভবা

দিনগুলির অবসান ঘনিযে এসেছে—আর রীডও হযে উঠেছেন মডার্ন আর্টের ক্ষেত্রে সবচেযে চরমপন্থী আর বিতর্কমূলক আন্দোলনগুলির প্রবক্তা আর তাদের আইডিযলজির ভাষ্যকার। তাঁর কাছে মডার্নিটির মাপকাঠিটা ছিল, পল ক্লী-র ভাষায়, "the intention not to reflect the visible, but to make visible." পশ্চিমের প্রায প্রত্যেকটি—এমনকি, পরস্পর-বিরোধী—শিল্পান্দোলনের ভাষ্যকার ও প্রবক্তা হিসেবে তিনি রীতিমতো কূটনৈতিক দক্ষতার পরিচয দিযে একদিকে সুররিযালিস্টদের আর অন্যদিকে পিওর-অ্যাবসট্র্যাক্‌শনবাদীদের সঙ্গে বেশ মানিযে চলেছিলেন—যার জন্যে শেষের দিকে রীড প্রাযই শিল্পীমহলে 'the elder statesman of art' নামে অভিহিত হযেছেন। এটাকেও বোধহয তাঁর ওই কনট্র্যারি এক্সপিরিযেন্স-এরই নানা অভিব্যক্তি হিসেবে ধ'রে নেওযাই ভালো।

'দি মিনিং অফ আর্ট', 'আর্ট নাউ' ইত্যাদি বইযে তিনি আধুনিক শিল্পান্দোলনের তাৎপর্যগুলির দিকে আমাদের মতো পুরো একটি জেনারেশনের চোখ খুলে দিযেছেন। তাঁর মর্মগ্রহণের গভীরতা আমাদের সমকালীন পশ্চিমী চিত্রকলার নানা অস্থিরতাকে আর বিচিত্র—অনেক ক্ষেত্রে প্রায দিশেহারা—অনুসন্ধানকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে। avant garde-দের চ্যাম্পিযন হিসেবে দাঁড়ানোটাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না ; ব্যাপকতর অর্থে তিনি চেযেছিলেন—বিশেষ ক'রে সামাজিক জীবনে, গোষ্ঠীগত ভাবে—শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। শিল্পের ঐতিহাসিক বিবর্তনকে আর সামাজিক ফাংশনকে নিষ্ঠা আর সততার সঙ্গে গভীরভাবে অনুসরণ করতে গিযে তিনি এই অনিবার্য সিদ্ধান্তেই পৌছেছিলেন যে, যে-সমাজে অন্যান্য জিনিসের মতোই চিত্র-ভাস্কর্যও 'কালচারাল গুডস'—সাংস্কৃতিক পণ্য মাত্র , সে সমাজে শিল্পী তাঁর গোষ্ঠীভূমিকাচ্যুত হতে বাধ্য। এর সমাধান, রীডের মতে, একদিকে জনসাধারণের মধ্যে শিল্প-শিক্ষার প্রসার ঘটানো, অন্যদিকে শিল্পীর দিক থেকে ব্যাপকতর সামাজিক আইডেন্টিটি প্রতিষ্ঠার প্রযাস। প্রথম কাজটি তিনি অনন্যসাধারণ মনীষা আর দক্ষতার সঙ্গে করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় কর্তব্যটি সম্বন্ধে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন ওঠে : সামাজিক কাঠামো যা আছে তাই থাকবে, অথচ শিল্পীর সমাজ-সত্তায রূপান্তর ঘ'টে যাবে কি ভাবে ? এটাকেও বোধহয তাঁর ওই কনট্র্যারি এক্সপিরিযেন্সগুলির অন্যতম ব'লে ধ'রে নেওযা যেতে পারে।

গত ১২ই জুন তাবিখে ৭৪ বছব বযেসে তাঁব জন্মস্থান ইযর্কশাযারে হার্বার্ট বীডেব মৃত্যু হযেছে।

রবীন্দ্র মজুমদার

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

পবিণত বযসে জঙ্গীপুবেব অধিবাসী, সুপবিচিত ব্যঙ্গশিল্পী, দাদাঠাকুব শ্রীশবৎচন্দ্র পণ্ডিতেব জীবনদীপ নির্বাপিত হযেছে। তাঁব লোকান্তবেব সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশেব মাটি-জল-হাওযায পুষ্ট ঐতিহ্যবাহী এক বিশেষ ধবনেব শিল্পকর্মও শেষ হল। একদা শবৎচন্দ্র পণ্ডিত বাঙালী রসিক মহলে তাঁব স্বাধীনতাপ্রেমী ব্যক্তিত্বেব জন্য সুপবিচিত ছিলেন। দাবিদ্র্যকে তিনি হাসিমুখে সহ্য কবেছিলেন। মফঃস্বল বাঙলাব বলিষ্ঠ সাংবাদিকতাব একটি বিশিষ্ট ধাবাবও তিনি স্রষ্টা।

অবিনাশ বসু

কবি পরভেজ শাহীদী

কবি এক্রাম হোসেন পবভেজ শাহীদীব অকাল মৃত্যুতে আমবা মস্ত শক্তিধব এক কবিকে হাবালাম। আমাদেব মাতৃভাষা উর্দু নয, তবু আমাদেব মধ্যে যাঁদেব সৌভাগ্য হযেছিল পবভেজেব মুখে তাঁব কবিতাব আশ্চর্য আবৃত্তি ও সঙ্গে সঙ্গে ইংবেজিতে তাব সাবলীল তর্জমা শোনাব— তাবাও পবম ভালোবাসায কবিকে গ্রহণ কবেছেন তাঁদেব অন্তবে। উর্দু কবিতাব মুশাযবা তো বটেই, এমনকি একদিন বাঙলা-হিন্দী বা উর্দুভাষী নির্বিশেষে প্রেসিডেন্সি জেল বা বক্সা বন্দীশিবিরেব আটক বাজবন্দীদেবও মাতিযে তুলত আমাদেব সহযোদ্ধা পবভেজেব জ্বলন্ত কবিতা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায, সবোজ দত্ত, জ্যোতিভূষণ চাকী প্রমুখেব দৌলতে তাঁর কবিতাব কিছুটা স্বাদ পেযেছিলেন 'পবিচয'-এব পাঠকবর্গও।

লক্ষণ দেখে বোধ হচ্ছিল তাঁব কবিতা, সম্ভবত নতুন এক বাঁকেব মুখে এসে দাঁডিযেছে। তাঁব কবিকৃতি ও উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনাব ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে 'পবিচয'-এ সম্ভব হবে আশা কবি।

ব্যক্তিগতভাবে সবকিছু ছাপিযে মনে পডছে পবভেজেব বন্ধুত্ব কবাব দুর্লভ ক্ষমতাব কথা। আমবা যাবা একদা তাঁব সেই দু-হাতে বিলনো ধনে ধনী হযেছিলাম, তাবা বিশেষ ক'বেই আজ নিঃস্ব বোধ কবছি তাঁব অকাল প্রযাণে।

প্রসঙ্গত 'পবিচয'-এব বন্ধুবা এ-খববে আনন্দিত হবেন যে পবভেজের উর্দু ও বাঙালী অনুবাগীবৃন্দ একটি 'পবভেজ স্মৃতি সমিতি' গঠন ক'বে তাঁব স্মৃতিরক্ষাব আযোজন কবছেন। তাঁবা ঐ সমিতি থেকে পবভেজেব কযেকটি কবিতা এবং কবি সম্পর্কে তাঁব বন্ধুবর্গেব স্মৃতিচিত্র বা কাব্য আলোচনাব একটি সঙ্কলন প্রকাশ কববেন। অনুসন্ধিৎসুবা ২৬ লোযাব বেঞ্জ, কলকাতা-১৭ ঠিকানায সমিতিব দপ্তবেব সঙ্গে যোগাযোগ কববেন আশা কবি।

চিন্মোহন সেহানবীশ

রেভারেণ্ড মার্টিন লুথার কিং ও রবার্ট কেনেডি

"আমি স্বপ্ন দেখছি, এমন একদিন আসবে যেদিন দাস আব দাসপ্রভুব সন্ততিবা এক হযে বসবে সৌভ্রাতৃত্বেব মঞ্চে। আমি স্বপ্ন দেখি, মিসিসিপি একদিন হযে উঠবে ন্যাযনীতিব মরুদ্যান। আমাব চাবটি সন্তান এমন সমাজে বাস কববে একদিন, যে-সমাজে চামডাব বঙে নয ব্যক্তিত্বেব সৌন্দর্যে তাবা পবিচিত হবে।" স্বপ্ন দেখেছিলেন মার্টিন লুথাব কিং, আমেবিকাব কৃষ্ণাঙ্গ ধর্মযাজক, যিনি শান্তিপূর্ণ ও অহিংস পথে শাদা-কালোব বৈষম্য ঘুচিযে দেবাব আন্দোলনে বাস্তায নেমেছিলেন। গত ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৬৮ মেমফিসেব এক হোটেলেব অলিন্দে তাঁকে কোনো এক অদৃশ্য আততাযী গুলি ক'বে খুন কবেছে। কিং দাবি কবেছিলেন শাদা-কালোব বৈষম্যেব নিবাকবণ, দাবি কবেছিলেন ভিযেতনাম থেকে মার্কিন শক্তিব অপসাবণ। তাঁকে মবতে হল!

আবো একজন; ববার্ট কেনেডি, মার্কিন দেশেব বর্তমান শাসক পার্টি ডেমোক্রাট দলেব তরুণ বাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থী—যিনি তাঁব ভাইযেব বাষ্ট্রপতি থাকাকালীন সে-দেশেব এ্যাটর্নি জেনাবেল ছিলেন, ব্যবস্থাপনা কবেছিলেন ভিযেতনামে মার্কিন শক্তিব প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপেব—তিনিও আততাযীব গুলিতে

নিহত হযেছেন জুন মাসেব গোডায লস এঞ্জেলসে। কেনেডিও দাবি কবছিলেন অনেক ঠেকে, অনেক অভিজ্ঞতাব পব, ভিযেতনামে বাজনৈতিক সমাধান।

এ-তুজনকে হত্যা কবল কাবা ?

একসময শস্তা মজুবেব জন্য, বিশাল ফলবতী মার্কিন ভূমি চাষ কবতে, কলে মজুব খাটতে জাহাজ ভর্তি ক'বে আনা হত আফ্রিকা থেকে কালো চামডাব দাসেব দল। গ্রামকে গ্রাম জনশূন্য কবতে এসেছে লোহাব হাতকডি নিযে, নখ যাদেব তীক্ষ্ণ নেকডেব চেযে সেই মানুষ ধবাব দল। কোটি মানুষকে নিযে গেছে আফ্রিকাব বুক থেকে। ডঃ দু বোযা বলেছেন, এব ফলে অন্তত আফ্রিকাকে ছ কোটি কৃষ্ণাঙ্গ সন্তান হাবাতে হযেছে। একজন দাসকে পশ্চিম গোলার্ধে নিযে যেতে হলে, অন্ততপক্ষে আবো পাঁচজনেব মৃত্যু অবধাবিত ছিল (দু বোযা : ব্ল্যাক ফোক : দেন এ্যাণ্ড নাউ, পৃষ্ঠা ১৪২)। আব এই দাস-ব্যবসাযে বৃটিশ ব্যবসাযীবা ফেঁপে উঠেছিল, মার্কস বলছেন "Liverpool waxed fat on the slave trade. This was its method of primitive accumulation". (Capital, London, 1954 Edition, Vol I, p 751). মুনাফাব পবিমাণ বাডাবাব জন্য এই দাস-ব্যবসায ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। দাসেব সমস্ত শ্রমেব অধিকারী ছিল মালিক।

সময বদলেছে, দিন বদলেছে, দাসপ্রথা এখন আইনী নয। তবুও আমেবিকায শস্তা মজুব হল কালো চামডাব মানুষ, বেকাব শ্রমিকেব বিজার্ভ বাহিনী গডে বাখা হয কালো মজুব দিযে। কালো মজুবকে কম মজুবি দিতে হলে চাই তাদেব সামাজিক এমন অমর্যাদা, যাতে শাদা চামডাব সমকক্ষ তারা নিজেদেব কখনোই না মনে করতে পাবে। শাদা চামডাব শ্রমিকেব মনেও ঢুকিযে দেওযা হযেছে এই সংশয। কিন্তু আমেবিকাব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, কি শাদা কি কালো, এক হযে এখন লডতে চলেছেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমানাধিকাবেব দাবিতে। এ-দাবিব কি ফল হবে ? যদি এ-আন্দোলন জিতে যায, ঘবেই তাহলে মার্কিন একচেটিযা মূলধনপতিব মুনাফাব হার আবও কমতে থাকবে। কে না জানে মূলধনতন্ত্র "dripping from head to foot, from every pore, with blood and

"dirt" (Capital, Vol I, p 760). সুতবাং মার্কিন মূলধনপতির দল এই সমানাধিকাবেব আন্দোলন বক্তেব বন্যায ডুবিযে দিতে চায। পরাজযেব মুখে সন্ত্রাস চালিযে ত্রস্ত কবে দিতে চায আন্দোলনেব নেতৃত্বকে।

ঠিক এই একই চিন্তাব পবিপূবক ব্যবস্থা চলেছে ভিযেতনামে। নযা ঔপনিবেশিকতাবাদী মার্কিন মূলধনতন্ত্র স্বদেশে মুনাফাব হাব হ্রাসেব ঠেকা দিতে বিদেশে মূলধন বপ্তানি কবতে চায। ভিযেতনামেব শস্তা কাঁচামাল, খনিজ সম্পদ ও শস্তা মজুব ব্যবহাব ক'রে মুনাফাব হাবেব হ্রাস তাবা রোধ কবতে চায। সেজন্য সেখানে পুষছে দালাল সবকার, আর্থনীতিক ও বাজনৈতিক স্বার্থ বাঁচিযে রাখতে নামিযেছে সৈন্যবাহিনী। কিন্তু সেখানে সে মাব খাচ্ছে। মূলধন বপ্তানিব দরুন ও ভিযেতনাম যুদ্ধেব খবচ চালাবাব জন্য মার্কিন স্বর্ণভাণ্ডাবে প্রবল চাপ পড়েছে। ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকাবীবা—যাবা অসম বাণিজ্যহাবেব ভিত্তিতে অপব দেশেব সম্পদ বাণিজ্যেব নামে লুঠ ক'বে আনে, তাবা—এ-অবস্থায মাব খাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী একচেটিযা বণদানবদেব সঙ্গে তাবাও চাপ দিচ্ছে বিভিন্ন দেশে ডিভ্যালুযেশনেব জন্য। আব ঘবে চাপ দিচ্ছে, ভিযেতনামেব যুদ্ধেব চাপ কমাতে। এতে তো আব যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনকাবী শিল্পপতিদেব আনন্দ পাবাব কথা নয। তাবা চাইছে, অস্ত্র নষ্ট হোক ভিযেতনামে, কিন্তু মার্কিন কবদাতাদেব টাকায জনসন সবকাব তো বসদ কেনা অব্যাহতই বেখে যাবে। মুনাফাব গ্যাবাণ্টি অব্যাহতই থাকবে। তাই কবদাতাদেব দাবি যখন কব কমাও, ভোগকারীদেব দাবি যখন দাম কমাও, ব্যবসাযী মূলধনপতিদের দাবি যখন বৈদেশিক মুদ্রাব দাম স্থিব বাখো, তখন একচেটিযা যুদ্ধাস্ত্র ব্যবসাযীদেব একটাই লক্ষ্য—এদেব কণ্ঠ বোধ কবো, হত্যা কবো। ববার্ট কেনেডি তাব শিকাব। যে-বন্দুক মার্টিন লুথাব কিং-এব দিকে উদ্যত হযেছিল, সেই একই আগ্নেযাস্ত্র গর্জে উঠেছে কেনেডিকে লক্ষ্য ক'বে। সেই বন্দুকেব ঘোড়ায আঙুল বেখেছে সেই পাশব হাত, যে-হাত ভিযেতনামে সভ্যতামেধী, মানবতাবিবোধী লড়াই চালিযে যাচ্ছে। সে-হাত মার্কিন মূলধনতন্ত্রেব—একচেটিযা ব্যবসাযী। কিং-এব মৃত্যু স্বাভাবিক। কেনেডিব কিছুটা অস্বাভাবিক। কিং-দেব মবতেই হয। কিন্তু কেনেডিদেব শিখতে হয়, এমন প্রভুব তাঁবা সেবক, যাদেব স্বার্থেব সামান্য বিবোধিতায বন্দুক গর্জে ওঠে।

তরুণ সান্যাল

পাঠকগোষ্ঠী

আপনাদের নাট্যসমালোচক 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড'-এর সমালোচনা করেছেন ('পরিচয়'—ফাল্গুন-চৈত্র)। সমালোচনাটা আগাগোড়া ভালো করে পড়লে মনে হয়, সমালোচক যা প্রথম দিকে বলেছেন শেষের দিকে তা থেকে পিছিয়ে গিয়ে সমালোচনা করেছেন। প্রথমেই সামাজিক চেহারা ও সে-ক্ষেত্রে বাঙলা থিয়েটারের দায়িত্ব (যে-প্রশ্নটা সমালোচক সর্বাগ্রে তুলেছেন) কতটা, এই কথা বলতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন "বাঙলাদেশের জনমজুর চাষাভুষো আর কেউ নেই" এটাই তাঁর মনে হয় বাংলা নাটক দেখতে গিয়ে। কিন্তু 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড'-এ যদি বাবু-বিবিদের সমাগমে নাটকের বিষয়বস্তুটির যথার্থতা প্রমাণ করে থাকে তবে আপত্তি কি। অন্যদের টেনে আনাটার মধ্যে কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্যদের টেনে আনার চেয়ে বোধহয় অন্যদের স্বেচ্ছায় আসা অনেক বেশি ভালো, সমালোচক বলেছেন নাটকটি পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও কল্পনাসমৃদ্ধ। কিন্তু শেষে নাটকটির বিভিন্ন জায়গায় ভাঁড়ামো করা হয়েছে বলে তিনি সমালোচনা শেষ করেছেন। একটা সিরিয়াস নাটকে ভাঁড়ামো করলে নাটকটা পরিচ্ছন্ন হয় কিভাবে সেটাই সমালোচনার বিষয়। বাবু-বিবিদের প্রসঙ্গে ফিরে এসে বলা যেতে পারে, বাঙলাদেশের তথাকথিত শিক্ষিত-সমাজ যদি বিংশ শতাব্দীতে এতটা অন্ধ কুশাসনে আচ্ছন্ন থাকেন, তবে চাষাভুষো জনমজুরেরা না জানি আরো কত বেশি আচ্ছন্ন। সেক্ষেত্রে নাট্যকার বাবু-বিবিদের সমাগম ঘটিয়ে সমাজের আভ্যন্তরীণ চেহারারই দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন এবং যার ব্যবহার সম্যক হয়েছে বলা চলে। প্রেতের ভূমিকায় মানস মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বর এত অতিরিক্ত পরিমাণে গম্ভীর যে অধিকাংশ সংলাপই অস্পষ্ট। তার কণ্ঠস্বরকে বলা যেতে পারে কাব্যময়, কিন্তু বাচনভঙ্গিকে নয়। শ্রীশ্যামল ঘোষের অভিনয় এক কথায় অপূর্ব। তাঁর দর্পিত পদক্ষেপে গুজ স্টেপের আভাস কিছুটা ভাঁড়ামো ঠিকই, কিন্তু অত বেশি চোখে পড়ার মতো নয়। সীমার চরিত্রে কৃষ্ণা দাসের দাঁত চেপে ইংরেজি বলানো হয়তো পরিচালকের ইচ্ছাকৃত। তার কারণ ছেলে-মেয়েদের সাহেব করে গড়ে তোলা

তো আমাদের স্বল্পশিক্ষিত মা-বাবারা গর্বের বিষয় বলে মনে করেন। পরিচালক হয়তো সেদিক দিয়েই দেখাতে চেয়েছেন।

নাট্য সমালোচক যদি বলতেন সবকটি চরিত্রেরই ইংরেজি উচ্চারণ খুব খারাপ, তাহলে তিনি সত্যিই একটা কিছু করতেন।

সমালোচক বোধহয় কাউকে আঘাত করতে রাজি নন। কিন্তু সমালোচনা হওয়া উচিত স্ট্রেট ফরোয়ার্ড, খোলাখুলি। নাটকটিকে যদি সমালোচক বলতেন 'সিরিওকমেডি' হিসেবে ভালো তবে তাঁর সমালোচনার সঙ্গতি থাকত। চরিত্রাঙ্কণে যে কোনো ত্রুটিই বিরাট ত্রুটি, ছোটখাট নয়। মারব বললে "মারুন-না" "মারতাম কিন্তু লাগবে বলে মারলাম না," এটা তো ঠিক নয়।

পুনপুন মুখোপাধ্যায়

পরিচয় পাঠক সমীপে—

কেন মাসে মাসে নিয়মিত পরিচয় বার করা যায় নি, তার চুলচেরা বিচারে যাব না। কারো পক্ষেই সেটা প্রীতিকর হবে না। মোট কথা, অবস্থাচক্রে বাধ্য হয়ে আমাকে হাল ছাড়তে হয়েছে।

যে দুজন তরুণ পরিচয়-এর ভার কাঁধে নিয়ে জর্জরিত অবস্থা থেকে আমাকে ত্রাণ করলেন, তাঁদের সর্বান্তঃকরণে সাধুবাদ জানাই।

নতুন পরিকল্পনায় পরিচয়কে ঢেলে সাজাতে গিয়ে যদি কারো মূল্যবোধে ঘা দিয়ে থাকি, তাহলে সেটাকে সম্পাদকের ব্যক্তিগত ত্রুটি মনে ক'রে পরিচয়কে যেন তাঁরা যথারীতি আনুকূল্য করেন।

কবি তরুণ সান্যাল এবং কথাসাহিত্যিক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—স্ব স্ব ক্ষেত্রে দুজনেই দিক্‌পাল। তাঁদের যোগ্য এবং যুগ্ম নায়কতায় এটা হবে পরিচয়ের দিনবদলের পালা।

এ সংখ্যায় সম্পাদক হিসেবে আমার নাম থাকলেও, সম্পাদনার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তাঁদেরই।

পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েও তাঁদের কাছ থেকে এ যাবৎ সম্পাদক হিসেবে যে প্রশ্রয় পেয়েছি, তার জন্যে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। পত্রিকার স্বার্থে লেখকদেরও কম বিরক্ত করি নি। তাঁদের কাছেও ক্ষমাপ্রার্থী। অন্য যাঁরা আমাকে নানা কাজে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সবাইকে শেষবারের মত ধন্যবাদ জানাই।

বিদায়ী সম্পাদক

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

১৭।৭।৬৮

EXPORT QUALITY
Sulekha
BLACK EXECUTIVE INK
Sulekha
এখন আপনাদের জন্যও পাওয়া যাচ্ছে!
সুলেখা
একসিকিউটিভ কালি
এতে সলভেন্ট এস-১০০ আছে
EXECUTIVE INK
সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক
কলিকাতা-৩২
Progressive/SW-35 HIN

শারদীয়
প্রীতি
সম্ভাষণ
উৎসবের দিনগুলি
গানে গন্ধে রূপে
রসে ভরে উঠুক—
সার্থক হোক্ মাতৃপূজা।
এনামেলের বাসন
খাস জনতা
(টাওসহ)
খাস জনতা
দীপ্তি লণ্ঠন
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৬৭, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ : ফোন : ৩৪-৫৪১১-৩
KALPANA O.M.46

'মনীষা'র কয়েকটি নতুন বই

শব্দের খাঁচায়—অসীম রায় ৬·০০

বাঙলাদেশের সাম্প্রতিককালের জীবনযন্ত্রণা ও প্রয়াস ধরা পড়েছে শক্তিশালী তরুণ লেখকের এই নতুন উপন্যাসে।

হিরোসিমা ২·০০

পারমাণবিক যুগের সূচনা যে মর্মান্তিকতায়, তারই স্পর্শ পাওয়া যাবে এই কবিতাগুলিতে। মূল জাপানী থেকে তর্জমা করেছেন জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় ও ভূমিকা লিখেছেন বিষ্ণু দে।

মরা চাঁদ—বিজন ভট্টাচার্য ৩·০০

'নবান্ন'-নাট্যকারের নতুন বলিষ্ঠ নাটক।

কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা—ভি-রিড্‌নিক ৬·০০

নব্য পদার্থবিজ্ঞানের এক মূল তত্ত্বের সঙ্গে বাঙালী পাঠককে পরিচিত করার দুঃসাহসী প্রচেষ্টা।

আগামী প্রকাশনা

David Hare—his life and work—Radha Raman Mitra.

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২